ফলের বাগান

(৫৭)

ক্বষিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ, 'সব্জীর কথা, 'গোলাপ বাগ'
প্রভৃতি বিবিধ ক্বষিগ্রন্থ প্রণেতা,
ন্যাশনাল নর্শরীর স্বত্বাধিকারী
শ্রীহরিমোহন মান্না
প্রণীত

ন্যাশনাল নর্শরী
মান্না এণ্ড কোং
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ১৷০ মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীহৃদয়ধন মান্না,
ম্যানেজার, ন্যাশনাল নর্শরী,
৪৬ নং রামধন মিত্রের লেন,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

(সন ১৩৪২ সাল)

কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫ নং শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

ভূমিকা

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে প্রকৃতির দান অফুরন্ত। এই অনায়াসলব্ধ দানের ফলে শ্রমবিমুখতা, তিল তিল করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, তাহারই পরিণামে আজ দেশব্যাপী দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের ফল ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে লুপ্ত কৃষি সম্পদকে উদ্ধার করিতে হইবে। কৃষি ব্যতীত শিল্প হয় না, শিল্প না থাকিলে বাণিজ্য চলে না। বাণিজ্যহীন দেশ কখনও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে কৃষিকর্ম্ম বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিত।

ন্যাশনাল নর্শরীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত হরিমোহন বাবু প্রথম জীবন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া হাতে কলমে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। দেশে কৃষির উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। বাংলা দেশে এই সময় এইরূপ একখানি গ্রন্থ বস্তুতঃই আবশ্যক। ফলের চাষ বিশেষ লাভজনক স্বাধীনজীবিকা। ইহাতে মূলধনও বেশী আবশ্যক হয় না। জগতের বাজারে ফলের চাহিদাও খুবই। বৃথা চাকুরীর মোহে না

ঘুরিয়া যদি শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ ফল চাষে মনোযোগী হন তবে যে শুধু তাঁহারাই লাভবান হইবেন তাহা নহে, দেশও সমৃদ্ধ হইবে। কারণ ইহা অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে নানাবিধ ফল কেবল স্বাভাবিক অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয় না। জগতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ শিল্প বিশেষ বিশেষ জাতীয় ফলের সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আম্র, নারিকেল, জম্বীর শ্রেণীয় ফল, পেঁপে, কদলী ইত্যাদি শিল্পের উল্লেখ করিতে পারা যায়। ভারতে এই সমুদয় শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায়; এই প্রকার শিল্পের উন্নতি ও পরিপুষ্টি যে ধনাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেশী বিদেশী নানারূপ ফলের চাষ, কলম তত্ত্ব, উদ্যান-রচনা প্রণালী, সার প্রয়োগ, ছাঁটাই, গাছ হইতে অধিক ফল লাভের উপায়, অফলা গাছকে ফলবতী করিবার প্রক্রিয়া, গাছের বিবিধ রোগ ও শত্রু নিবারণ পন্থা, সময় বিশেষে পাট ও পরিচর্য্যার রীতি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। আমি খুবই আশা করি যে হরিমোহন বাবুর এই প্রচেষ্টা জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবে এবং এই গ্রন্থখানি চাষ-প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রের নিকটেই সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।
এম, আর, এ, এস (লণ্ডন);
পাতিয়ালা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব
ব্যবহারিক উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্।

কলিকাতা
২৮শে চৈত্র,
১৩৪২।

নিবেদন

মৎপ্রণীত সব্জীর কথা সাধারণে প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে অনুরোধ আসিতে লাগিল যে দেশে ফল চাষ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক নাই, সুতরাং ফল চাষীদের জন্য একখানা বই আমাকে লিখিতেই হইবে। তাঁহাদের অনুরোধের ভিতর দিয়া যে প্রেরণা পাইয়াছি তাহাই সম্বল করিয়া আমার ফল চাষ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র জ্ঞানটুকু দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম। সব্জীর কথাকে যাঁহারা আদরের চক্ষে দেখিয়াছেন, আমার এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিকট আদরণীয় হইলে এবং দেশে ফলের বাগান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার যে উল্লেখযোগ্য অভাব রহিয়াছে ইহা দ্বারা তাহার এক শতাংশও পূর্ণ হইলে, আমার এ শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি।

বিনীত

গ্রন্থকার।

উৎসর্গপত্র

শৈশবে পিতৃহীন হইয়া,

যাঁহার আদরে, যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছি,

প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে,

শিক্ষাচ্ছলে

যিনি আমাকে উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে

প্রথম পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন,

সেই উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্

পরম স্নেহময়

৺যোগেন্দ্রনাথ মান্না

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের

পূণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম।

চির সেবক

হরিমোহন।

সূচীপত্র

প্রারম্ভ

কলম

চাষ

বিবিধ তত্ত্ব

ন্যাশনাল নর্শরীর স্বত্বাধিকারী

শ্রীহরিমোহন মান্না প্রণীত

অপর দুইখানি উৎকৃষ্ট কৃষি পুস্তক।

১। **সব্জীর কথা**—সব্জী ব্যবসায়ীর নিকট ইহা একখানা অমূল্য গ্রন্থ। দেশী বিদেশী রকমারী সব্জীর বিভিন্ন চাষ প্রণালী—সব্জী ভেদে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত—অনুর্ব্বরা পতিত জমিকে উর্ব্বরা সব্জী ক্ষেত্রে পরিণত করিবার রীতি—কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে সব্জী রক্ষা করিবার উপায়—বিভিন্ন সার প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী—মাস পঞ্জী ইত্যাদি এক কথায় সব্জী চাষে আবশ্যকীয় যে কোন অভিজ্ঞতার একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

২। **গোলাপ বাগ**—গোলাপ চাষ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তক।

'সব্জীর কথা'

সম্বন্ধে

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলি কি বলেন দেখুন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা বলেন—বিদেশী ও দেশী সব্জী, সার, বিভিন্ন সব্জী চাষের কাল, চাষের রীতি ও প্রণালী এবং এতৎসংক্রান্ত লাভ লোকসান ইত্যাদি এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকের লেখক ও প্রকাশকগণের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কৃষি আন্দোলনের দিনে এই পুস্তক গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী উভয়ের যথেষ্ট হিতসাধন করিবে। পুস্তকটীতে প্রায় সমস্ত প্রকার শাক সব্জীর কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গবাসী বলেন—ইহা একখানি কৃষি বিষয়ক পুস্তক। সব্জী চাষের কথাই ইহাতে সুবিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুন, ঢেঁড়স, মূলা লাউ, কুমড়া, আলু, পটল প্রভৃতি এ দেশের নিত্য ব্যবহার্য্য সব্জী সমূহের কথাই ইহাতে বর্ণিত আছে। পুস্তক প্রণেতা স্বয়ং কৃষিকর্ম্মা, সুতরাং ইহাতে ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ বা পুঁথিগত বিদ্যার কথা লিখিত হয় নাই। তিনি নিজে কাজ করিয়া দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ের ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। ক্ষেত্র, জল, মৃত্তিকা, সার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পরিস্ফুট। ঐতিহাসিক অংশের আলোচনাও সুন্দর। পুস্তকের ভাষার গুণে কোন প্রসঙ্গই বিরক্তিকর বোধ হয় না। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব্জী চাষের দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ফিরিয়াছে। তাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িয়া কাজে হাত দিলে উপকৃত হইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন—This is a reliable guide for the use of agriculturists and others to the cultivation of various products of nature, the edible fruits and vegetables of our everyday use, both of indigenous and foreign origin. Success in agriculture depends on practical experience and the author, already an experienced hand in the line, offers herein valuable suggestions for

the growing of the common field crops which are being cultivated in this country for a long time past with enormous success. Interest in this achievement has been followed by a demand for information on these vegetables, and this account is offered in response to its demand The introductory chapter dealing with the way of improving soil and manure to restore the fertility of poor soil will prove valuable to would-be farmers. The book offers really interesting material for gardeners and agriculturists to profit by.

'ফলের বাগান'

সম্বন্ধে

সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কি লিখিয়াছেন দেখুন।

'ফলের বাগান':—ন্যাশনাল নর্শরীর স্বত্বাধিকারী কৃষিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ **শ্রীহরিমোহন মান্না** প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

পুস্তকখানি ফলের চাষ সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থকার ইহাতে বিবিধ ফলের চাষ, কলমতত্ত্ব, উদ্যান-রচনা প্রণালী, জমিতে সার প্রয়োগ, ছাঁটাই, অধিক ফল লাভের উপায়, অফলা গাছকে ফলবতী করিবার প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই সকল প্রণালী অনুসারে চাষ করিলে লাভের আশা করা যায়। দেশের বর্ত্তমান সমস্যায় পুস্তকখানি কাজে লাগিবে। চাষ-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ফলের বাগান।

উদ্ভিদের পরিচয়।

জীব মাত্রেই প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্র-ণের ভিতরে থাকিয়া জীব যদি তাহার জীবন-গতিকে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে পরিচালিত করিতে পারে, তবে তাহার জীবনধারা চির অব্যাহত থাকে। জীব যতই শক্তিশালী হউক না কেন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিলে তার পরিণাম অশুভ হইবেই।

উদ্ভিদ—জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত জড় পদার্থবিশেষ। অন্যান্য জীবের মত ইহার গতিশীলতা নাই সত্য, কিন্তু জীবনীশক্তির প্রভাব অন্যান্য জীবের মত ইহার ভিতরেও বর্ত্তমান। অন্যান্য জীবের মত ইহারও ভ্রূণ অবস্থা হইতে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আছে। সুতরাং ইহারাও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণা-ধীন। সেই জন্য ফলের বাগান করিতে হইলে ফলকর গাছ-গুলির সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক এবং ইহাদের কিরূপে পালন করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিয়া লইয়া ইহাদের জীবনতত্ত্বের সহিত মোটামুটী

পরিচিত হওয়া প্রত্যেক উদ্যানস্বামীরই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদ যত দিন বীজকোষের ভিতরে থাকে, তত দিন তাহার ভ্রূণ অবস্থা। এ সময় প্রত্যক্ষভাবে ইহার পক্ষে আলো বা বাতা-সের প্রয়োজন হয় না। ঐ অবস্থায় তাহার জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সে ভিতরে বসিয়াই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পায়। কিন্তু বীজদেহ বিদীর্ণ করিয়া সেই স্বতঃপুষ্ট ভ্রূণ-উদ্ভিদকে বাহিরে আসিতে হইলে রস, বায়ু ও উত্তাপের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভূগর্ভেই হউক বা বাহিরেই হউক, যে স্থানে উহারা উক্ত পদার্থত্রয় পূর্ণমাত্রায় পাইবে, সেই স্থানেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে। এই জন্যই অনেক সময় সুপক্ক কাঁঠালের ভিতরে অঙ্কুরিত বীজ দেখা যায়। সাধারণতঃ ভূগর্ভই উত্তম বীজাধার। ইহার ভিতরে থাকিলে উহারা উক্ত তিনটী জিনিষ সহজেই আবশ্যকানুযায়ী পাইয়া থাকে। কিন্তু স্থান কাল অনুসারে ভূমিরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বত্র সম-ভাবে থাকে না। যে স্থানে উক্ত তিনটী জিনিষ প্রয়োজন মত না থাকে, সে স্থানে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। অনেক সময় মৃত্তি-কার দোষে বীজ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বীজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি লোপ পাইয়া থাকে। এই জন্য অনেক সময়ে উত্তম সতেজ বীজ অঙ্কুরিত হয় না—অথবা নির্দ্দিষ্ট কালের বহু পরে অঙ্কুর দেখা যায়, কোনটী বা অঙ্কুরিত হইয়াই দুই এক দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। এই বিফলতার

মূলে রস, বায়ু ও উত্তাপের অভাব—কোন ক্ষেত্রে ইহাদের যে কোন একটীর অভাব বা আধিক্যও থাকিতে পারে।

যাহা হউক, রস, বায়ু ও উত্তাপের আনুকূল্যে বীজ অঙ্কুরিত হইলেই শিশু উদ্ভিদ তখন প্রত্যক্ষভাবে মুক্ত বায়ু ও মুক্ত আলোকের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। তখন ভূমি হইতে দেহ-পোষণোপযোগী রস, আকাশ হইতে মুক্ত আলোক ও নির্ম্মল বায়ু ইহারা চায়। ইহার যে কোনটীর অভাব হইলে বা যে কোনটী দূষিত হইলে ইহারা রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে মারাও যায়। সুতরাং বাগানের মাটি ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বিষয় বিবেচনা করা প্রত্যেক উদ্যানস্বামীর কর্ত্তব্য।

আমাদের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—দেহকে বাঁচাইবার জন্য স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত থাকে।

মূল, গাছকে মৃত্তিকার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে এবং মৃত্তিকাগর্ভের বিভিন্ন স্তর হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া গাছকে পোষণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকাস্থিত স্থূল পদার্থগুলিকে গলিত করিয়া উদ্ভিদদেহের উপযোগী করিয়া তুলিতে ইহারাই সক্ষম। ভূগর্ভনিহিত স্বাভাবিক রসপ্রবাহকে শোষণ করিয়া ইহারা বৃক্ষদেহে পরিচালিত করে। মূল কর্ত্তৃক আহরিত এই খাদ্যই উদ্ভিদের জীবন ধারণের প্রধান সম্বল।

পত্র উদ্ভিদদেহের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মূল দ্বারা শোষিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রস, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাদি অতিক্রম করিয়া পত্রে উপনীত হয়। পত্র আলো ও বায়ুর ভিতর হইতে অঙ্গার ও অম্লজ বাষ্প আহরণ করিয়া—সেই রস পরিপাক করাইয়া সার অংশ উদ্ভিদের সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত করে এবং অবশিষ্ট দূষিত অংশকে বাহির করিয়া দেয়।

আকাশে স্বতঃসঞ্চারিত অঙ্গারাম্লজ বাষ্প অর্থাৎ Carbonic acid gas উদ্ভিদের পাচক শক্তির সহায়ক। আমাদের পাক-স্থলীতে খাদ্য প্রবেশ করিলে যেরূপ একপ্রকার পাচক রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করাইয়া দেয়, উদ্ভিদ-দেহেও মূলের সাহায্যে খাদ্যরস প্রবেশ করিলে উক্ত বাষ্প সাহায্যে সুচারুরূপে জীর্ণ হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। উদ্ভিদদেহের এই পরিপাক ক্রিয়ার জন্য স্বাভাবিক আলোক অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির সহায়তাও প্রয়োজন। জীবনী শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যালোক উদ্ভিদ মাত্রেরই বিশেষ আবশ্যক। অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, মাঠের ভিতরে ইষ্টক অথবা অন্য কোন ঘন পদার্থ দ্বারা যদি কোন স্থান এরূপভাবে চাপা থাকে যে, তার ভিতরে মুক্ত আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা হইলে সেই স্থানের দূর্ব্বাদল ক্রমে পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া যায় এবং শেষে মরিয়া যায়। দূর্ব্বাগুলি ভূমি হইতে রস পায় সত্য, কিন্তু মুক্ত আলো ও বায়ুর সংস্পর্শে বঞ্চিত থাকায় উহাদের জীবনী শক্তি লোপ

পাইয়া যায়। বৃক্ষের পত্ররাজিই আলো ও বাতাস হইতে বৃক্ষ-দেহের উপযোগী উপাদানগুলি আহরণ করিয়া থাকে। বৃক্ষের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও পত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পত্রের এই কর্ম্মশক্তি সূর্য্যরশ্মির সহযোগিতায় জন্মিয়া থাকে। এই জন্য বাগানের সর্ব্বত্র যাহাতে উত্তমরূপে আলো ও বাতাস চলাচল করিতে পারে, তৎপ্রতি উদ্যানকের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

কাণ্ড --বৃক্ষদেহের প্রধান অবলম্বন। অঙ্কুরিত বীজের যে অংশ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, উহাকেই কাণ্ড কহে। ইহার প্রধান কার্য্য—শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদিকে ধারণ করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করা। মূল দ্বারা আহরিত রসকে কাণ্ড, পত্রে চালিত করিয়া দেয় এবং পত্র হইতে বিতরিত সারাংশ আবার মূলে পরিচালিত করিয়া মূলের কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।

পত্রাদির সুচারুরূপে অবস্থান এবং আবশ্যকীয় ফুল ফলাদির ভার বহনের জন্যই শাখা প্রশাখার-প্রয়োজন। ইহারাও বৃক্ষদেহকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়াই খাদ্যাদি পত্রে নীত হয় এবং পত্র হইতে সর্ব্বদেহে পরিচালিত হয়।

আমাদের দেহ যেরূপ ত্বকে আবৃত, উদ্ভিদেরও কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ইত্যাদি স্থূল ত্বকে ঢাকা। আমাদের ত্বকে যেরূপ সংখ্যাতীত রোমকূপ আছে, উহাদের ত্বকেও সেইরূপ আছে।

এই ত্বকের নিম্নভাগে উদ্ভিদদেহের শোণিতস্রোত চলাচল করে। ত্বকের রোমকূপগুলির ভিতর দিয়াও আলো ও বাতাস বৃক্ষদেহের পরিপোষণ করিয়া থাকে। মানুষের মত ত্বক্ বা বাকল উদ্ভিদের স্পর্শেন্দ্রিয়। বাহিরের ধূলা বাতাসে উক্ত ত্বক্ বা পাতার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেলে গাছ অনেক সময় রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই জন্য মাঝে মাঝে পিচকারী সাহায্যে গাছের সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যান্য জীবের মত উদ্ভিদেরও খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। এই জগতের উপর দিয়া ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রবাহ সমভাবে বহিয়া যাইতেছে, ধ্বংস ও সৃষ্টির এই ধারার সমতা রাখিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। এই বিশাল জগতে জীবের অসংখ্য খাদ্যবস্তু রহিয়াছে, কিন্তু সমস্ত জীবেরই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। সমস্ত জীব সমস্ত রকম খাদ্য গ্রহণ করে না। প্রত্যে-কেরই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী খাদ্যাখাদ্য বিচারের শক্তি আছে। তদনুযায়ী তাহারা ভূমি হইতে আপনাপন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই জন্যই দেশভেদে বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন স্থানে জন্মিয়া থাকে এবং স্থানান্তরিত হইলে কেহ হয় ত বাঁচে না বা বাঁচিলেও অনেক ক্ষেত্রে সুফল দেয় না। যে দেশের যে মাটিতে উদ্ভিদের যে প্রিয় খাদ্য থাকে, অন্য দেশে নীত হইলে সেই প্রিয় খাদ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় উদ্ভিদ নূতন দেশের মৃত্তিকানিহিত অনভ্যস্ত খাদ্যে ও অনভ্যস্ত জল

বায়ুর সংস্পর্শে নিজের পুষ্টি সাধনে সক্ষম হয় না। এই জন্যই অনেক ক্ষেত্রে গাছে ফল হয় না বা অনেক ক্ষেত্রে গাছ বাঁচে না। শ্বেত চন্দনগাছ আমাদের বাঙ্গালার মাটিতে বাঁচে না। কিন্তু স্থানান্তরিত হইয়াও কোন জাতীয় গাছ নূতন দেশের মৃত্তিকায় এবং জল বায়ুতে যদি অভ্যস্ত খাদ্যের সন্ধান পায়, তবে জন্ম-ভূমির বাহিরেও সে গাছ বাঁচে এবং ফল প্রসবে সক্ষম হয়—যেমন লকেট গাছ। ইহার জন্মস্থান জাপানদ্বীপ হইলেও ইহা এ দেশে বাঁচে এবং ফল দেয়। আবার অনেক গাছ বাঁচিলেও ফল দেয় না। তাহার কারণ, জন্মস্থানের মৃত্তিকা ও আব-হাওয়ার ভিতরে ফল প্রসবের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে যে উপাদান সে পাইয়া থাকে, বিদেশের স্থানবিশেষে সেইরূপ উপাদানের অভাব থাকে ; কিন্তু শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা হয় ত পায়,—কাজেই গাছ স্থানান্তরিত হইলেও বাঁচে, কিন্তু ফলদানে সক্ষম হয় না। যেমন আপেল গাছ। উহা শীতপ্রধান দেশের ফল, বঙ্গদেশে উহার চারা কলম রোপণ করিলে বাঁচে সত্য, কিন্তু এ যাবৎ কোথাও ফল দিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই, দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতের কোন কোন স্থানে ইহা ফলও দেয়।

এই সমস্ত কারণে বাগানে যে গাছই রোপণ করা হউক না কেন, তাহা স্থানীয় মৃত্তিকার উপযোগী কি না, ঐ মৃত্তিকায় নির্ব্বাচিত উদ্ভিদের খাদ্য আছে কি না, তাহা বুঝিতে হইবে।

কোন্ গাছ কোন্ জমিতে ভাল হইবে বা হইবে না, তাহ

বুঝিতে হইলে একটু পর্য্যবেক্ষণশীল হওয়া দরকার। যে দেশে উদ্যান রচিত হইবে, সেই দেশজাত স্বাভাবিক বৃক্ষলতাদির অবস্থা—তাহাদের বৃদ্ধি—প্রসবিনী শক্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করিতে হইবে। বিদেশী কোন ফলের চাষ করিতে হইলে অনুসন্ধান করিতে হইবে, উক্ত ফল সে দেশের কোন স্থানে কোন দিন হইয়াছিল কি না। যদি হইয়া থাকে, তবে কোন্ জাতীয় সার তাহাতে প্রযুক্ত হইয়াছিল—কি ভাবে তাহার পাট ও পরিচর্য্যা করা হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় ভালরূপে জানিয়া লইতে হইবে। আবহাওয়া এবং মৃত্তিকাভেদে সার ও পাটের অল্পাধিক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ধীরচিত্তে এই সব প্রণিধান করিয়া ধৈর্য্য সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার সাফল্য নিশ্চিত।

ফলের বাগানের প্রয়োজনীয়তা।

আমরা সাধারণ কথায় অন্ন বলিতে 'ভাতই' বুঝিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেহের পুষ্টি সাধন করিতে ও জীবন ধারণের জন্য যে কোন আহার্য্য গ্রহণ করি না কেন, তাহাই অন্নপদবাচ্য। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য ; সেই জন্য ভাতই আমাদের অন্ন। রুটী যাহাদের প্রধান খাদ্য, রুটীই তাহাদের অন্ন, ফলমূল যাহাদের প্রধান খাদ্য, ফলমূলই তাহাদের অন্ন।

আমাদের সুজলা সুফলা দেশে একদিন কোন কিছুরই

অভাব ছিল না। মাঠভরা ধান, গম, ডাল, বাগানভরা বিবিধ সব্জী ও উপাদেয় ফলমূল, নদনদীভরা সুপেয় জল সবই প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু আমাদেরই অবজ্ঞা ও অজ্ঞতার পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়িয়া—ভূমি আজ শস্যহীনা—উদ্যান আজ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পর্য্যবসিত—নদনদী মজিয়া গিয়া ক্ষীণা স্রোতস্বতীতে পরিণত, অন্নহীন জলহীন বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ মহামারীর তাণ্ডব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় এখনও রহিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে ভূমি আবার শস্যশালিনী হইতে পারে, নদনদীর বুক আবার পূর্ণ জোয়ারে ফুলিয়া উঠিতে পারে—উদ্যান আবার ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতে পারে।

সার্ব্বজনীনতা বাদ দিয়া নিজের ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য জীবনের দিকে দৃক্‌পাত করিলেও আমরা ফলের বাগানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। এ দেশে এমন অনেক অনায়াসলব্ধ ফল আছে, যদ্দারা আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াও থাকিতে পারি। এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় শত শত দরিদ্র একমাত্র ফলমূলের উপর নির্ভর করিয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারে। ভবিষ্যতের অন্ধকারে দেশের এক অনিশ্চিত দুর্দ্দিনের আবির্ভাবজনিত আশঙ্কার প্রতীকারের জন্যই যে আমি ফলের বাগানের সার্থকতা দেখাইতেছি, তাহা নহে। মানুষের কতটা প্রয়োজন ইহা দ্বারা মিটান যাইতে পারে, তাহারই একটু আভাস দিলাম মাত্র। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, ফলও

অন্নপদবাচ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে ফলের বাগানের অতি নিকট সম্পর্ক রাখিতে পারিলে আমরাই লাভবান্ হইব। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়বিধ উদ্দেশ্যই ইহা দ্বারা সাধিত হইতে পারে।

বিবিধ ফল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইহা বলকারক, শোণিতশোধক। শাক অথবা অন্যান্য সবুজ সব্জীর ভিতরে যতটা খাদ্যপ্রাণ থাকে, তাহার অনেকাংশ রন্ধন-কালে নষ্ট হইয়া যায়, সম্পূর্ণ খাদ্যপ্রাণ আমরা পাই না। কিন্তু ফলমূল কাঁচা অবস্থায় অর্থাৎ রন্ধন না করিয়া ভক্ষণ করা যায় বলিয়া উহাদের ভিতরে নিহিত খাদ্যপ্রাণ আমরা পূর্ণ মাত্রায় পাইতে পারি। এই খাদ্যপ্রাণ আমাদের দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া—উন্নত করিয়া তোলে। আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, শশা, বেল, কলা ইত্যাদি আমাদের দেশের সহজলভ্য ফল। সহর অঞ্চলে না হইলেও বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই ইহার ২।৪টী গাছ থাকে। যাঁহার বাড়ীতে অধিক পরিমাণে থাকে, তিনি সম্বৎসরের জন্য নিজের আবশ্যকীয় ফল রাখিয়া, অবশিষ্টগুলি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন। ফল ভোজনে আনন্দ, বিক্রয়ে অর্থ লাভ।

পল্লীগ্রামে নানাবিধ ফল গাছ আপনা হইতেই জন্মে বা অনেকে ইচ্ছা করিয়া বসাইয়াও থাকেন। কিন্তু তাহার পরিচর্য্যা

কিরূপে করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। সেই জন্য অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। একখানি মোটামুটী রকমের ফলের বাগান দিয়া একটী ছোটখাটো পরিবারের সম্বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা অনেকে জানিলেও কি ভাবে যে তাহা দ্বারা আশানুরূপ লাভবান্ হওয়া যায়, তাহা অনেকেই বোঝেন না। ইহা বুঝিয়া বাগানের প্রতি বিশেষ যত্ন লইলে ইহা পরিবারবিশেষে স্থায়ী আয়কর সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতে পারে।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে ফলের চাষ একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ভয়াবহ বেকার সমস্যা মীমাংসা করিবারও ইহা একটী সুন্দর উপায়। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ যদি এ দিকে বিশেষ মনোযোগী হন, তবে তাঁহাদের অর্থাভাব ত দূর হইবেই, উপরন্তু দেশে উন্নত প্রণালীতে ফলবিজ্ঞানের চর্চ্চা হওয়ায় দেশও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

ফলের বাগানে ব্যয় অপেক্ষা আয় অনেক বেশী। গাছভেদে বৎসরে একবার মাত্র কিছু খরচ করিয়া রাখিলে বহু বৎসর উহার আয় ভোগ করা যায়। অবশ্য প্রত্যেক বৎসরই কিছু না কিছু খরচের আবশ্যক হয়, কিন্তু আয়ের তুলনায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক গৃহস্থের বাটীর সংলগ্ন সুপারী নারিকেল প্রভৃতির বাগান আছে, তাহা হইতে তাঁহাদের যে আয় হয়, তদ্দ্বারা বহুবিধ প্রয়োজন তাঁহারা মিটাইয়া থাকেন। কোন

কোন পরিবারের হয় ত ঐ বাগানই জীবিকার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কিন্তু ঐ সব বাগানে তাঁহাদের সম্বৎসরের খরচ অতি সামান্য। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, ফলের বাগান কিরূপ লাভজনক।

আশা করি, ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া ব্যক্তিমাত্রেই সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু ফল চাষে মনোযোগী হইবেন।

জমি নির্ব্বাচন।

ফলের বাগান বা সব্জীর বাগান, যাহা কিছুই করা যাউক না কেন, এ জন্য ক্ষেত্রস্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কর্ত্তব্য উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচন। স্থানভেদে ও চাষভেদে জমির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা উভয়ই আছে। সঙ্কল্পিত চাযের জন্য কোন্ জমি উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা নির্ণয় না করিয়া, যে কোন জমিতে চাষ আরম্ভ করিলে প্রায়শঃই ব্যর্থমনোরথ হইতে হয় অথবা বহু শ্রম ও অর্থের বিনিময়ে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। এই জন্যই সর্ব্বপ্রথম উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচন করিয়া চাষ আরম্ভ করিলে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মৃত্তিকার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবরণ—মৎকৃত 'সব্জীর কথা' নামক পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ফলের বাগান

করিতে কিরূপ জমি উপযুক্ত, সে বিষয় মোটামুটী জ্ঞাতব্য কিছু এ স্থলে লিখিত হইল।

সাধারণতঃ উচ্চ সমতল জমি ফলের বাগানের উপযোগী। এরূপ জমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইতে পারে না। ফলের চাষ বারমেসে কৃষি। গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে মূল পচিয়া অথবা বৃক্ষদেহে অতিরিক্ত রস সঞ্চার হইয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

তার পরেই লক্ষ্য করিতে হইবে—মৃত্তিকার প্রকৃতির দিকে। সচরাচর বেলে, এঁটেল ও দোয়াঁশ প্রভৃতি মৃত্তিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে নির্ব্বাচিত জমির মৃত্তিকা কোন্ প্রকৃতির, তাহা বুঝিতে হইলে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। জমির কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুই কিম্বা আড়াই হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া, উহার পার্শ্বদেশে মৃত্তিকাস্তরের বর্ণ লক্ষ্য করিতে হইবে। ভূগর্ভ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। যদি খোদিত গর্ত্তের পার্শ্বদেশ সাদাটে হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহা বেলে প্রকৃতির। হরিদ্রাভ স্তর হইলে দোয়াঁশ এবং কৃষ্ণবর্ণ স্তর হইলে এঁটেল বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া—অনেক সময় গর্ত্ত করিলে নিম্ন-ভাগে কঙ্করময় স্তরের আবির্ভাব হইতে পারে। বেলে ব কঙ্করময় ভূভাগ বাগানের আদৌ উপযোগী নহে। কিন্তু উপরিভাগের কয়েক স্তর মৃত্তিকা যদি দুধে এঁটেল প্রকৃতির হয় এবং নিম্নদেশে কঙ্করময় ভূভাগ থাকে, তবে সেই জমি ফলের বাগানের বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। ইহাতে গাছের

শিকড়গুলি নিম্নে বেশী দূর প্রবেশ করিতে না পারিয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তাহাতে গাছ ঝারাল এবং অধিকতর ফলবান্ হয়। গাছের শিকড় নিম্নাভিমুখী হইয়া মাটির অধিক নিম্নে প্রবেশ করিলে গাছগুলি ঢেঙ্গা হয় এবং অধিকতর ফলদানে সক্ষম হয় না।

ফস্‌ফরিক এসিড, পটাস ও চুণ ফলকর জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মৃত্তিকায় এগুলি না থাকিলে বৃক্ষের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে কোন বাধা জন্মে না সত্য, কিন্তু ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। যে মাটিতে দাহ্য পদার্থের সমাবেশ বেশী থাকে, তাহাতেই পটাস ও ফস্‌ফরিক এসিড আছে। এক্ষণে মৃত্তিকায় উক্ত পদার্থ আছে কি না এবং থাকিলেও কি পরিমাণে আছে, তাহা বুঝিতে হইলে এক স্থানে মৃত্তিকা গভীররূপে খনন করিতে হয়। তার পর ঐ মাটি ওলটপালট করিয়া, উহা হইতে কিছু মাটি সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ মাটিটুকু ভালরূপে ডেলা পাকাইয়া ওজন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবার পর আবার ওজন করিলে যেটুকু কম হইবে, তাহাই মৃত্তিকার রসভাগ বলিয়া জানা যাইবে। তার পর ঐ শুষ্ক ডেলাটীকে ভালরূপে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ওজন করিলে যে পরিমাণ কম হইবে, তাহাই উক্ত মৃত্তিকার দাহ্য পদার্থের ভাগ। এই দাহ্য পদার্থ হইতেই পটাস ও ফসফরিক এসিডের উৎপত্তি। যে অংশটা অগ্নিদগ্ধ হইবার পর ওজনে কম পড়িবে, জমিতে ততটা পরিমাণে পটাস ও ফসফরিক এসিড আছে

বলিয়া জানা যাইবে। সাধারণতঃ শতকরা ৫ ভাগ দাহ্য পদার্থ থাকিলেই যথেষ্ট। যদি জমিতে ঐ পরিমাণে দাহ্য পদার্থ না থাকে, তবে সার প্রয়োগ দ্বারা উহাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। সারের বিষয় স্থানান্তরে লিখিত হইল।

জমিতে চূণের পরিমাণ জানিতে হইলে উক্ত অগ্নিদগ্ধ ডেলাটী হইতে অর্দ্ধ ভরি পরিমাণ মাটি লইয়া ৫ ছটাক জল ও ১ ছটাক মিউরিয়াটীক এসিড সহ মিশ্রিত করিয়া একটী কাচের পাত্রে রাখিয়া দিবেন। ২৫।৩০ মিনিট কাল রাখিলেই চলিবে। তার পর ঐ মিশ্রিত জলটুকু উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ছাঁকিয়া ফেলিবেন। ছাঁকনীতে যে অংশ পড়িয়া থাকিবে, তাহা শুকাইয়া ওজন করিলে যে অংশ কম পড়িবে, তাহাই মৃত্তিকাস্থিত চুণের অংশ বলিয়া জানিবেন। মৃত্তিকায় শতকরা ৫ ভাগ চুণ থাকিলেই সর্ব্বোত্তম।

লবণাক্ত বা বোদ মাটিযুক্ত জমি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। গ্রীষ্মকালে লবণাক্ত জমিতে লবণের ন্যায় একরূপ সাদা পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়। বৃষ্টিপাত হইয়া গেলেও জমির উপরে লবণ ভাসিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলে বা তীব্র লবণাক্ত বারিপূর্ণ নদীতীরে ঐরূপ জমি দৃষ্ট হয়। বোদমাটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। শুষ্ক হইলে খুব হাল্‌কা হয় এবং জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠে। সিক্ত অবস্থায় ইহা ভয়ানক পিচ্ছিল ও আঁটাল হয়। এই প্রকৃতির জমি বাগানের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী। অবশ্য নানা উপায়ে এই জমি

চাষোপযোগী করিয়া তোলা যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একরূপ সাধ্যাতীত বলা চলে। ধনবান্ ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে এত অর্থব্যয় করিয়া জমিকে বাগানের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারে না। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই জমি নির্ব্বাচিত হইলে যথেষ্ট মূলধনের আবশ্যক এবং ব্যয়ের অনু-পাতে আয়ের মাত্রা যাহা দাঁড়ায়, তাহাতে শীঘ্র লাভের বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না।

জমিতে উৎপন্ন স্বাভাবিক গাছ গাছড়া হইতে মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্ব্বরতা নির্ণয় করা যায়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে জানিতে হইলে মৎকৃত "সব্জীর কথা" নামক পুস্তকখানা পাঠ করিবেন।

জমি নির্ব্বাচনের সময় জল সংগ্রহের কোন সহজ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জমির নিকটে যদি নদী বা খাল থাকে এবং নদী বা খালের জল যদি লবণাক্ত না হয়, তবে খুব ভালই হয়। উক্ত জল বাগানের সর্ব্বত্র যাহাতে সহজভাবে সরবরাহ করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি নদী বা খাল নিকটে না থাকে, তবে পুকুর, ইন্দারা বা কূপেব বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাগান ছোট হইলে কূপ বা ইন্দারা দ্বারা কাজ চলিতে পারে। বাগান বড় হইলে পুকুর খনন করাই যুক্তিযুক্ত। পুকুর হইতে জল তোলা সহজ এবং পুকুরের নূতন মাটি জমিকে সারবান্ করে। পুকুরপাড়ে কলা, নারিকেল ইত্যাদির

গাছ খুব ভাল হয়। তাহা ছাড়া পুকুরে মৎস্য পালন করিলে ঐ সঙ্গেই আরও একটী নূতন আয়ের পথ পাওয়া যাইতে পারে। মৎস্য পালন করিতে হইলে কিছু বড় রকমের পুষ্করিণী হইলে ভাল হয়। যাহা হউক, বাগানের আয়তন বুঝিয়া অবস্থানুসারে জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে গরু, ছাগল ইত্যাদি জন্তু এবং চোরের উপদ্রব হইতে গাছ ও ফল রক্ষা করিতে হইলে বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়া দিতে হইবে। যাঁহাবা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাঁহারা ইষ্টক-নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কাঁটাযুক্ত ঘন দুর্ভেদ্য বেড়ার জন্য অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে লেবু গাছের বেড়া দেওয়াই সর্ব্বোত্তম। উহাতে ঘন কাঁটাবিশিষ্ট দুর্ভেদ্য বেড়া প্রস্তুত হইতে পারে। আবশ্যক কাঁটাযুক্ত বেড়ার জন্য আরও অনেক গাছ আছে, কিন্তু সেগুলি দিয়া শুধু বেড়াই হইবে—কোনরূপ আয় হইবে না। উদ্যানক নিজ রুচি ও সাধ্য অনুযায়ী যেরূপ ইচ্ছা, বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

উদ্যান-রচনা-প্রণালী।

জগতে প্রত্যেক কর্ম্মেরই সাফল্য নির্ভর করে শৃঙ্খলার উপর। বিশৃঙ্খলতা সাফল্যের এবং উন্নতির ঘোর পরিপন্থী। উদ্যান রচনা বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বাগান সাধারণতঃ দুই রকমের হইয়া থাকে—এক সখের বাগান, অপর—ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ফলকর বাগান। শৃঙ্খলার সমতার দিক্ দিয়া উভয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উদ্যান রচনা-প্রণালীর প্রাথমিক কর্ত্তব্য উভয়ের পক্ষেই প্রায় এক। তবে সখের বাগানে সাধারণতঃ লোকে কৃত্রিম ঝরণা, পাহাড়, বিরামকুঞ্জ ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া অনেকটা স্থান সঙ্কোচ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যে বাগান প্রস্তুত হয়, তাহাতে ঐগুলি বাহুল্যমাত্র।

উদ্যানের জন্য জমি, জল ও বেড়ার বন্দোবস্ত হইলে সমস্ত জমিটির একটী নক্সা প্রস্তুত করিবেন। ঐ নক্সার সাহায্যে কোন্ স্থানে কি কি গাছ বসান হইবে, তাহা স্থির করিয়া লই-বেন। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে যে কোন গাছ বসাইলে উদ্যান যেরূপ শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বাগানের আব-হাওয়াও সেইরূপ দূষিত হইতে পারে। বাগানের সর্ব্বত্র আলো ও বাতাস সমানভাবে চলাচল করিতে না পারায় ফলন ও বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। প্রত্যেক গাছেরই আকার ও প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। আকারের তারতম্য অনুসারে উভয় বৃক্ষের ব্যবধানের তারতম্যও রাখিতে হয়।

বাগানের সর্ব্বত্র সহজভাবে যাতায়াতের প্রকাশু পথ থাকা আবশ্যক। বাগানের প্রধান ফটক হইতে একটী প্রশস্ত পথ ভিতরে লইয়া গিয়া, উহা হইতে আবার কতকগুলি শাখা-পথ

বাগানের চতুর্দ্দিকে প্রস্তুত করিতে হয়। এই পথ নির্ম্মাণ ব্যাপারে সখের বাগান ও সাধারণ বাগানের ভিতরে একটু তারতম্য আছে। সখের বাগানের পথগুলি বাঁকান ঘুরান হইবে। উহাতে বাগানখানিকে বহুদূর-বিস্তৃত বলিয়া মনে হইবে। সখের বাগানের প্রধান লক্ষ্য শুদ্ধ বাগানের বাহ্যিক শোভা ও আড়ম্বর দিকে থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য যে বাগান হইবে। তাহার প্রধান লক্ষ্য থাকিবে ফলনের দিকে। বাগানখানিকে যে ভাবে সাজাইলে ফল বেশী পাওয়া যাইবে, ব্যবসায়ী উদ্যানকের সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার। সমস্ত বৃক্ষের পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধান যাহাতে সহজে হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই পথঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে। এই জন্য ব্যবসায়ীর বাগানে পথগুলি যত দূর সম্ভব সরল হইবে। পথ সরল হইলে এক স্থানে দাঁড়াইয়া দূরবর্ত্তী গাছগুলিও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পথ বাঁকা হইলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহা ছাড়া বাগানে শত্রুর উপদ্রব নিবারণের পক্ষেও সরল পথই প্রশস্ত। যাহা হউক, পথের উভয় পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষগুলির আয়তন অর্থাৎ উচ্চতা ও বিস্তৃতির পরিমাণ অনুসারে পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। পথের সঙ্কীর্ণতা গাছের ঘনতা বৃদ্ধি করিয়া আলো ও বাতাসের গতি রোধ করে। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া পথঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে।

পথগুলি দ্বারা বিভক্ত প্রত্যেক খণ্ড জমিতে সমজাতীয় বৃক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে। প্রতি খণ্ডে ১টী,

২টী, ৩টী বা তদধিক অর্থাৎ যতগুলি বৃক্ষের স্বচ্ছন্দভাবে স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, তদনুযায়ী স্থাপন করা কর্ত্তব্য। চারা গাছ রোপণের সময় এ ব্যবস্থা অনেকের নিকট জমির অপচয় বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু উত্তরকালে ঐ চারাই যখন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইবে, তখন দেখা যাইবে যে, প্রকৃত পক্ষে জমির একটুও অপচয় ঘটে নাই। একটু পাতলাভাবে গাছ বসাইয়া যাওয়া বরং ভাল, কিন্তু ঘন সন্নিবিষ্ট হইলে অপকারিতা বেশী পরিমাণেই দেখা যায়। আলো ও বাতাস যতটা স্বচ্ছন্দভাবে উহাদের ভিতর দিয়া চলাফেরা করিতে পারিবে, ততই উহারা স্বাস্থ্যবান্ হইয়া অধিকতর ফল ফুল প্রদানে সক্ষম হইবে। ব্যবধানের অল্পতা গাছকে ইচ্ছানুরূপ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে নিজ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিতে বাধা দেয়। তখন প্রকৃতি তাহার বৃদ্ধিশীলতাকে ঊর্দ্ধে পরিচালিত করে। তাহাতে গাছ খুব লম্বা ও ঢেঙ্গা হয় এবং বিরলপত্রবিশিষ্ট হয়। এরূপ গাছে সুফল লাভের সম্ভাবনা কম।

প্রত্যেক খণ্ড জমিতে সমজাতীয় গাছ বসাইবার রীতি বিশেষ শুভকর। কারণ, সমস্ত গাছের পাট বা পরিচর্য্যার রীতি বা কাল এক নহে। আম গাছের ভিতরে যদি কাঁঠাল গাছ থাকে, তবে যে সময় আমের গোড়া খুঁড়িয়া সার দেওয়া প্রয়োজন, সেই সময় কাঁঠালের গোড়াও অল্পাধিক খনন করা হইয়া থাকে এবং আমে যে সার প্রয়োগ করা হয়, তাহারও অংশবিশেষ কাঁঠালের দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু সে সময়

কাঁঠালের গোড়া খনন করা বা সার প্রয়োগ করা হয় ত ক্ষতিকর হইবে। তা ছাড়া যে গাছ খুব বড় হয়, তাহার সঙ্গে ছোট গাছ থাকিলে বড় গাছের আওতায় ছোট গাছটী প্রয়োজনীয় পর্য্যাপ্ত আলো বাতাসে বঞ্চিত হইবে। বৃহত্তর গাছটী তাহার বিস্তৃত শাখা প্রশাখা দ্বারা ক্ষুদ্রতর গাছটীকে সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখে। কাজেই ক্ষুদ্র গাছটী হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া প্রায়ই সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

গাছের ফল প্রসবের কাল অনুযায়ী অবস্থানেরও তারতম্য আছে। সূর্য্যালোক ও বায়ুর ঋতু অনুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল গতি লক্ষ্য করিয়া গাছ বসাইবার দিক্ নির্ণয় করিতে হইবে। যে গাছ যত জলদীজাতীয় অর্থাৎ মরশুমের প্রারম্ভে ফল প্রদান করিবে, তাহাদিগকে বাগানের তত দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে, যে গাছ মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে ফল প্রদান করে, সেগুলিকে পূর্ব্ব দিকে এবং যে গাছ নাবীজাতীয় অর্থাৎ মরশুমের শেষে ফল প্রদান করে, সেগুলিকে পশ্চিমে রোপণ করিতে হইবে।

প্রবল ঝড় উদ্যানের ভয়ানক শত্রু। ঝড়ের বেগে বড় বড় গাছ ভূমিসাৎ হয়—ফলগুলি অকালে ঝরিয়া যায়—উদ্যানে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া শ্রীহীন করিয়া ফেলে। ইহার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। তবে ইহার প্রবল বেগের প্রথম ধাক্কা যাহাতে উদ্যানে আসিয়া না পৌঁছিতে পারে, তাহার উপায় আছে। বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়া সীমা ঘেসিয়া কতকগুলি মেহগ্নি, রেইনট্রি প্রভৃতি টিম্বারজাতীয়

গাছ রোপণ করিয়া দেওয়া উচিত। এ গাছগুলি খুব উচ্চ ও দৃঢ় হয়। ইহারাই ঝড়ের প্রথম বেগটা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে বায়ু-বেগ উদ্যানে প্রবেশ করে, তাহা ততটা প্রবল নহে। কাজেই ফলকর গাছগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই গাছগুলি শুধু উদ্যানের রক্ষক নহে—ইহারা উদ্যানস্বামীর যেটুকু জমি দখল করিয়া থাকে, তাহার মূল্যও উত্তমরূপে দিয়া থাকে। ইহা হইতে গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী কাঠ, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ মাত্রেই কোন না কোন উপায়ে মানবের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে।

গরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তু এবং চোরের উপদ্রব হইতে উদ্যান রক্ষার জন্য দৃঢ় বেড়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

চারা নির্ব্বাচন।

চারা নির্ব্বাচন উদ্যানকের অন্যতম প্রধান দুরূহ কর্ত্তব্য। সুনির্ব্বাচিত উত্তম খাঁটী চারার উপরেই উদ্যানের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। চারা যদি দোষদুষ্ট হয়, তবে উদ্যানস্বামীর সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায় সন্দেহ নাই। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বচক্ষে দেখিয়া চারা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য প্রত্যেক উদ্যানকের পক্ষে স্বয়ং চারা সংগ্রহ করিতে

যাওয়া সম্ভব হয় না। সর্ব্বত্র চারা-ব্যবসায়ীও পাওয়া যায় না। আবার সহর বা পল্লী অঞ্চলে দুচার জন ব্যবসায়ী থাকিলেও সকলেই বিশ্বাসী নয়। কাজেই প্রথমতঃ বিশ্বস্ত চারা-ব্যবসায়ীর সন্ধান করিতে হইবে। তাহার আবাসস্থান যদি দূরেও হয়, তথাপি নিকটস্থ অসাধু ব্যবসায়ীর নিকট না গিয়া, সেই বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর নিকট যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

চারা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট চারা চিনিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। এক আম্রের ভিতরেই বহু জাতি আছে। কিন্তু ফল না দেখিয়া গাছের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কিন্তু যে সময় চারা চিনিবার দরকার হয়, সে সময় ফল পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র চারা-ব্যবসায়ীর সাধুতার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? কাজেই ব্যবসায়ী যদি সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত না হন, তবে প্রতি পদেই প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছে, যাহারা উদ্ভিদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহারা কয়েকজাতীয় গাছ লইয়াই ক্রেতার সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করিয়া থাকে। ক্রেতা গাছ চিনিবে না। গাছে ফল হইলে যখন প্রতারণা ধরা পড়িবে, তখন হয় ত বিক্রেতার আর কোন সন্ধানই মিলিবে না—আর যদিই বা কোন রকমে সন্ধান পাওয়া যায়, তবে এত দিনের পরিশ্রম, আশা ভরসা, অর্থব্যয় যে নিষ্ফল হইল, তাহার কোনই প্রতীকার হইবে না। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর নিকট এরূপ প্রতারিত হইবার আশঙ্কা খুবই কম। তাঁহাদের সুনামের ভয়

আছে এবং তাঁহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থিতি আছে। তাঁহাদের ব্যবসায় প্রায়ই বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। কাজেই তাঁহারা প্রতারণা করিতে পারেন না।

চারা নিজেরাই প্রস্তুত করুন বা কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করুন—সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন, প্রত্যেক চারাই উৎকৃষ্ট নয়। নিজেদের প্রস্তুত চারা সবগুলিই বাগানে বসাইবার উপযোগী নহে। চারার স্বাভাবিক গতি, কমনীয়তা নিটোল স্বাস্থ্য, পত্রবিন্যাসপদ্ধতি, কাণ্ডের আকার ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। কতকগুলি চারা স্বভাবতই ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট হয়। ইহাদের শাখা প্রশাখা ও পত্রবিন্যাস-পদ্ধতি পর্য্যাপ্ত ফল প্রসবের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এরূপ চারা পরিত্যাজ্য। এগুলি প্রায়শই ঝাড়াল হয় না। চারা যদি ঝাড়াল না হয়, তবে তাহার ফলন কম হয়। যে চারার গতি ঊর্দ্ধে চালিত না হইয়া পার্শ্বদিকে প্রসারিত হয়—শাখা প্রশাখাগুলি বেশ নমনীয় ভাবাপন্ন থাকে—কাণ্ডটী ও শাখা প্রশাখাগুলি বেশ পুষ্ট—সেই চারাই উৎকৃষ্ট। রুগ্ন বিকৃতাঙ্গ চারা রোপণ করা উচিত নয়। কীটদষ্ট বা রুগ্ন চারা বাগানে রাখিলে উহাদের সংস্পর্শে অন্যান্য চারা বা গাছগুলি রুগ্ন হইয়া পড়িতে পারে। কীটগুলিও ক্রমে গাছের পর গাছে সংক্রামিত হইয়া উদ্যানের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। এরূপ গাছ হইতে সুফল লাভের আশা খুবই কম। সুতরাং কীটদষ্ট রুগ্ন চারা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

দূর স্থান হইতে চারা আমদানী করিতে হইলে আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে বড় চারা লওয়া অযৌক্তিক ; গাছ যত বড় হইবে, ততই উহার শিকড় মৃত্তিকার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হইবে। হাপোর হইতে তুলিতে গেলে উহা অধিক পরিমাণে আহত হইবে। তার পর বড় গাছ রেল ষ্টীমারে বা কোনরূপ যান বাহনে লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক। পথি মধ্যে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হয়। গাছ যত বড় হইবে, প্রতিকূলতাও তত অধিক প্রবল হইবে। ঝড় বাদলে বড় গাছ যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ছোট গাছ ততটা হয় না। বায়ুবেগ বড় গাছের উপরেই প্রবল হয়। শিকড় মৃত্তিকালগ্ন হইতে না হইতে সেরূপ ঝড় হইলে উহার গোড়া নড়িয়া গিয়া জীবনীশক্তিকে আহত করে। এই আকস্মিক চমকে অনেক সময় গাছের ফলোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ছোট গাছের পক্ষে এই সব প্রতিকূলতা তত প্রবল নহে। ইহা স্থানান্তরিত করা সুবিধাজনক। ব্যয় এবং পরিশ্রম উভয় দিকেই সাশ্রয় ঘটে,। ইহা ছাড়া ছোট গাছকে সহজেই নিজ আয়ত্তাধীনে রাখিয়া ইচ্ছামত আকার দেওয়া যাইতে পারে।

চারা নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে এক কথায় বলিতে গেলে সুপুষ্ট, সতেজ, স্বাস্থ্যবান্, ঝারাল, ছোট নির্দ্দোষ চারাই রোপণ করিবার উপযুক্ত।

———

চারার পরিচর্য্যা।

কাল হইতে একটী মানবশিশুকে যেরূপ সেবা ও যত্নের ভিতরে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, একটী উদ্ভিদশিশুও সেইরূপ আমাদের যত্ন ও পরিচর্য্যার ভিতরে থাকিয়া ধীরে ধীরে গাছে পরিণত হয়। অবশ্য বনে জঙ্গলে মাঠে যে সব উদ্ভিদ আপনা হইতেই জন্মে, তাহারা কাঁহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শুধু স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়াই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে। তাহাতে ফুল, ফল উভয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু সেই স্বভাববর্দ্ধিত গাছের ফুল ফলে এবং উদ্যানকের পরিচালনায় উৎপন্ন ফল ফুলে অনেক তারতম্য আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি এবং উদ্যানকের জ্ঞান ও যুক্তি উভয়ের সম্মিলনে যে ফুল ফলের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রায়শই উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।

চারার প্রকৃত উৎপত্তি বীজ হইতেই। কলম করিয়া যে চারা প্রস্তুত হয়—বীজোৎপন্ন চারার সহিত তাহার অনেক পার্থক্য আছে। বীজোৎপন্ন চারার প্রকৃতি অনিশ্চিত। উহার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বীজটীর প্রকৃতির উপর। কিন্তু কলমের চারার ভবিষ্যৎ মূল গাছটীর প্রকৃতির উপরেই নির্ভরশীল, উপরন্তু ইহা মূল গাছটী হইতে অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীজের চারার প্রকৃতি বিপর্য্যয়ের কারণ গাছের স্থান-

বিশেষে ফলগুলির অবস্থানজনিত তারতম্য। একটী গাছের সমস্ত ফল সমান হয় না। সমস্ত ফল সমানভাবে পুষ্ট হইতে পারে না। গাছের সর্ব্বত্র আলো ও বাতাস সমানভাবে চলাচল করিতে সক্ষম না হইবার জন্য অবস্থানভেদে সবগুলি ফল আলো বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। তাহাতে আকারে, স্বাদে ও প্রকৃতিতে উহারা বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। যে ফলটী যে প্রকৃতির আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইবে—উহা হইতে উৎপন্ন গাছের ফলও সেই প্রকৃতিসম্পন্ন হইবে। এই জন্য বীজের চারা প্রায়শই মূল গাছ হইতে নিকৃষ্টতর ফল প্রসব করে। অবশ্য কখন কখনও মূল গাছ হইতে উৎকৃষ্টতর ফলও যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে। কিন্তু সেরূপ চারা উৎপন্ন করিতে হইলে যে ফলটী হইতে বীজ রাখিতে হইবে, সেটী পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। পর্য্যাপ্ত আলো বাতাসে ঐ ফলটী বঞ্চিত না হয়—যে শাখায় ঐ ফলটী থাকিবে, তাহা রুগ্ন, শুষ্ক ও কীটদষ্ট না হয়, এ বিষয়গুলি ধীরভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ফলটী বেশ সুপক্ক হইলে সযত্নে তুলিতে হইবে। তাহার পর উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপভাবে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে পারিলে অনেক সময় নূতনজাতীয় উৎকৃষ্টতর ফলও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চারা প্রস্তুত করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

বীজের চারার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের মূলে আরও অনেক

রহস্য আছে। গাছ মুকুলিত হইলেই মধুলুব্ধ পতঙ্গগুলি ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে। তাহাদের পদে বাহিত পরাগরেণু এক ফুল হইতে অন্য ফুলে সঞ্চারিত হইয়া সেই ফুলে উৎপন্ন ফলের ভিতরে যে বীজাধার থাকে, তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলেই বীজোৎপন্ন গাছ হইতে নূতন নূতন জাতির আবিষ্কার হয়।

যাহা হউক, এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য লোকে বীজোৎপন্ন চারা পছন্দ করে না। বিশেষতঃ বীজোৎপন্ন চারায় ফলও হয় বিলম্বে। কলমের চারা মূল গাছটীরই পূর্ণ প্রতিকৃতি। আসল গাছটীর নির্দ্দোষ দেহরসে উহার ভিতরে প্রাণশক্তির প্রেরণা আসে। এই জন্য সর্ব্বতোভাবে উহা আসল গাছটীর মতই হয়। উপরন্তু ইহাতে ফলনও শীঘ্র আরম্ভ হয়। এই সব কারণে লোকে কলমের পক্ষপাতীই অধিক।

কলমের চারাই হউক বা বীজের চারাই হউক, প্রথমতঃ উহাদিগকে কিছুকাল হাপোরে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হয়। সদ্য কলম কাটিয়া বা সদ্যোৎপন্ন বীজের চারাটি তুলিয়া জমিতে স্থায়িভাবে বসাইয়া দিলে এক দিকে উদ্যানস্বামীর যেরূপ কর্ত্তব্য বাড়িয়া যায়, অপর দিকে কোমল শিশু চারাকেও জমি হইতে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য আহরণে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। মানব-জীবনের অবস্থার বিভিন্নতা অনুযায়ী যেরূপ খাদ্য, আচার, ব্যবহার ইত্যাদির তারতম্য আছে, উদ্ভিদশিশুর পক্ষেও

তদ্রূপ। সমগ্র জমিটাকে শিশু উদ্ভিদের উপযোগিভাবে তৈরী করা সম্ভব নয়। তার পর স্থায়িভাবে রোপণ করিতে গেলে উভয় চারার ব্যবধান যতটা রাখিতে হয়, তাহাতে সমস্ত চারাই বহু দূরে দূরে অবস্থান করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য প্রত্যেকটী চারার পৃথক্ পৃথক্ পরিচর্য্যার আবশ্যক হয়। ইহাতে শ্রম ও অর্থ, উভয়ই অধিক পরিমাণে নিয়োজিত করিতে হয়। এই জন্যই প্রথমে হাপোরে রাখিয়া প্রতিপালন করা বিধেয়। হাপোরের অল্পায়তন স্থানের ভিতরে রাখিয়া এক সঙ্গে অনেক-গুলি চারা প্রতিপালন করা চলে। তাহাতে প্রত্যেকটী চারা ভালরূপে পরিচর্য্যা পায়। হাপোরের মাটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা প্রকৃতির থাকায় চারাগুলি বেশ সুস্থ থাকে এবং অনেকগুলি চারা এক সঙ্গে থাকায় একে অন্যের ছায়ায় আত্মরক্ষা করিতেও সক্ষম হয়। সুকুমার প্রকৃতির চারাগুলি প্রখর রৌদ্র বা প্রবল বারিবেগ সহ্য করিতে পারে না। রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হাপোরের অল্পপরিসর স্থানে প্রয়োজন মত আচ্ছাদন দেওয়া চলিতে পারে।

হাপোরে রাখিয়া চারা প্রতিপালন করিতে হইলে একাধিক হাপোর পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখা উচিত। কারণ, চারাগুলি যতই বড় হইবে, ততই উহাদের ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিতে হইবে। ইহা ছাড়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করিলে চারাগুলির বৃদ্ধি অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হয়। তবে প্রত্যেক হাপোরের মাটি বেশ সারগর্ভ হওয়া দরকার। উক্ত

মৃত্তিকার ভিতরে সার প্রয়োগ দ্বারা উদ্ভিদখাদ্য সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে।

অনেকে সখ করিয়া টবে বা বালতীতে চারা পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত প্রকারে পালিত চারার পরিচর্য্যা করিতে বেশী বেগ পাইতে হয়। হাপোরের আয়তন বৃহৎ থাকায় উহার মাটি সহজে সারহীন হইয়া পড়ে না। হাপোরে প্রত্যহ জল সেচন না করিলেও চলে, কিন্তু টব বা বালতীর চারাগুলিতে প্রত্যহ জল দেওয়া আবশ্যক। টবের মাটি খুব বেশী দিন সারবান্ থাকে না; কারণ, উহার অল্পায়তনের ভিতরে সারের পরিমাণও অল্প থাকে। কাজেই চারাগুলি অল্প দিনের ভিতরেই ঐ সারাংশ তুলিয়া লইয়া মাটিকে সারহীন করিয়া ফেলে। তখন খাদ্যাভাবে উহা দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে। হাপোরে থাকায় চারাগুলি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে স্বাভাবিক রসও গ্রহণ করিতে পারে। এই রস উদ্ভিদদেহের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু টবের চারা তাহা ত পায়ই না, উপরন্তু উহাতে জল সেচন করিলে জল শীঘ্র শুকাইয়া যায় অথবা পরিমাণে বেশী হইলে গোড়া পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। এই জন্য অনেক সময় টবে জলাভাব বা জলাধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। ভুলক্রমে একদিন জল না দিলে গাছ ঝামরাইয়া যায়। মোট কথা, টবের চারায় অনেক হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয়। এই জন্য আমরা হাপোরের চারার পক্ষপাতী বেশী।

বীজোৎপন্ন চারাগুলিকে অন্ততঃ দেড় বা দুই বৎসর কাল

হাপোরে পালন করিলে ভাল হয়। ঐ চারাগুলিকে অন্য হাপোরে স্থানান্তরিত করিবার সময় চারাগুলির মূল শিকড় ছাঁটিয়া বাদ দিলে গাছ বেশ ঝারাল হয়। মূল শিকড় না কাটিলে কাণ্ড লম্বা ও মোটা হয়। এই জন্য টিম্বারজাতীয় গাছের মূল শিকড় কাটা উচিত নয়। টিম্বারজাতীয় গাছের কাণ্ডটীই প্রয়োজনে আসে, সুতরাং উহা যত সরল স্থূল হইবে, ততই ভাল। মাত্র ফলকর গাছের মূল শিকড় বাদ দিবেন।

কলমের চারাগুলিকে বেশী দিন পালন করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু কিছুদিন হাপোরে পালন না করিয়া জমিতে বসাইলে চারাগুলি ঝামরাইয়া যায়। এই চারাগুলিকে বর্ষা-কাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রত্যহ প্রাতে অথবা বৈকালে স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে চারাগুলি বেশ স্নিগ্ধ থাকে এবং তাহাদের ভিতরে প্রফুল্লতার আবির্ভাব হয়। স্নানের আরাম আমরা যেরূপ ভোগ করি, উদ্ভিদগণও সেইরূপ ভোগ করে।

সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় চারা বা কলম প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এ জন্য বিশ্বস্ত চারা-ব্যবসায়ীর (নার্শারী ম্যান) নিকট হইতে উৎকৃষ্ট চারা আমদানী করিতে হয়। তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রীত চারার প্রাথমিক পরিচর্য্যা তাঁহাদের নিকট হইতেই হইয়া থাকে। কাজেই সে জন্য উদ্যানস্বামীকে বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত করিতে হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও

আনীত চারাগুলির পথশ্রম অপনোদনের জন্য তৎকালীন প্রাথমিক পরিচর্য্যার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

চারা-ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সে কাটাম প্রস্তুত করিয়া, নূতন কাপড় দিয়া চারাগুলি সাবধানে ঢাকিয়া দিয়া থাকেন। উহাতে বাহিরের নানা অসুবিধা হইতে, বিশেষতঃ চুরি যাইবার ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু একরূপ বদ্ধ আবহাওয়ার ভিতরে থাকায় গাছগুলি অল্পাধিক অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই অসুস্থতা দূর করিয়া তাহাদিগকে শান্ত স্নিগ্ধ করিবার জন্য প্রথমতঃ বাক্সের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, চারাগুলিকে অপেক্ষাকৃত শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে দিতে হয় এবং গাছগুলির গায় আস্তে আস্তে জল ছিটাইয়া স্নান করাইয়া দিতে হয়। এই স্নান এবং মুক্ত আলো বাতা-সের স্পর্শ তাহাদিগকে পুনরায় সজীব করিয়া তোলে।

স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে গাছের শিকড় যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য ব্যবসায়িগণ গাছের গোড়ায় গুল বাঁধিয়া রাখেন এবং চারার মূল বৃদ্ধি স্থগিত রাখিবার জন্য অল্পাধিক এঁটেল মাটির গুল বাঁধিয়া থাকেন। ইহাতে দৃঢ়বদ্ধ গাছের গোড়া সহজে ভাঙ্গিয়া গাছের শিকড় নষ্ট করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে এঁটেল মাটি প্রয়োগ না করিয়া সাধারণ মাটি দ্বারা গুল বাঁধিয়া নারিকেলপাতা, খেজুরপাতা অথবা কলার পেটো দিয়া গুলটী সাবধানে জড়াইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

গাছগুলি আসিয়া পৌঁছিলে কিছু দিন হাপোরে রাখিয়া প্রতিপালন করতঃ পরে স্থায়িভাবে বসাইলেই ভাল হয়। তাহাতে উহাদের পথশ্রমজনিত কষ্ট একেবারেই দূর হয় এবং ক্ষেত্রস্বামীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে থাকায় নূতন মৃত্তিকা ও জল-বায়ুর ভিতরে আগমন-জনিত অসুবিধা সহজেই দূরীভূত হইয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে বাহির হইতে গাছ আনাইয়া রোপণ করিতে হইলে গাছগুলির জন্য ছায়ামণ্ডপ প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া থাকে। কারণ, এ সময়ে প্রখর রৌদ্র বাতাসকে অতিশয় উত্তপ্ত করিয়া ফেলে। এই তপ্ত বাতাস চারার পক্ষে অনিষ্টকর। এই জন্য প্রথমে চারাগুলিকে হাপোরে রাখিয়া, উপরে হোগলা, নারিকেলপাতা বা অন্য কিছু দিয়া একটী আচ্ছাদন প্রস্তুত করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার ফলে চারাগুলি রৌদ্রের প্রখরতা ও বাতাসের উত্তপ্ততা, উভয় হইতেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঐ আবরণ খুলিয়া ফেলা আবশ্যক। নিশির শিশির এবং অপেক্ষাকৃত শীতল আব-হাওয়া উহাদের দিবাভাগের ক্লান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লতা আনয়ন করে। উপরে যে আচ্ছাদন দিবেন, তাহা যেন ঘন না হয়। আচ্ছাদন পাতলা করিয়া না দিলে উহাদের গায়ে রৌদ্র আদৌ লাগিতে পারিবে না। প্রত্যক্ষভাবে রৌদ্রের সংস্পর্শে না আসিলেও এক আধটু রৌদ্র উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সূর্য্যকিরণ হইতে একেবারে বঞ্চিত হওয়া মোটেই

বাঞ্ছনীয় নয়। তাহাতে চারাগুলি ঢেঙ্গা হয়, পত্রে পত্র-হরিৎ জন্মিতে পারে না। পত্র-হরিতের অভাব হইলে ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপে পরিপাক হয় না এবং উদ্ভিদজীবনের আরও অনেক কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উহারা পায় না। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া উপরের আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

যে দেশে বরফপাত হয়, সেই দেশে বরফপাতের সময় বিবেচনা করিয়া আমদানী গাছ বসাইতে হইবে। নতুবা সমস্ত চারাই অতিরিক্ত শৈত্যে মারা পড়িতে পারে। গাছগুলি পৌঁছিবার পরে যদি শীঘ্র বরফপাতের আশঙ্কা থাকে, তবে সেই সময় পর্য্যন্ত ভূগর্ভে গর্ত্ত করিয়া, গাছগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মাটি চাপা দিয়া ভিতরে রাখিয়া দিবেন। তার পরদিন বেশ পরিষ্কার হইয়া গেলে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া নিরূপিত জমিতে গাছগুলি রোপণ করিয়া দিবেন।

রোপণ-কাল।

আমাদের দেশে পর্য্যায়ক্রমে ষড়্ ঋতুর আবির্ভাব হইলেও শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রভাবই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋতু-ভেদে আবহাওয়ার যেরূপ অবস্থান্তর ঘটে—সেই আবহাওয়ার অবস্থান্তরের সঙ্গে জীব ও উদ্ভিদমাত্রেরই দৈহিক ক্রিয়ার অল্প-বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ঋতুভেদে এই অবস্থান্তর-

জনিত বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া জমিতে স্থায়িভাবে চারা রোপণের সময় নির্ণয় করিতে হয়।

সাধারণতঃ বর্ষাকালই গাছ বসাইবার প্রকৃষ্ট কাল। এই সময়ে মাটি স্বভাবতঃই সরস থাকে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপক্লিষ্ট আকাশ, বাতাস ও সমস্ত প্রকৃতি বর্ষার শীতল জলে স্নান করিয়া যেন নূতন প্রাণ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও অতিরিক্ত বর্ষার সময় গাছ রোপণ বিধেয় নহে। অবিশ্রান্ত বারিপাতের ফলে জমি অতিরিক্ত আর্দ্র থাকে। অনেক সময় গাছের গোড়ায় জল জমিয়া মূল পচিয়া যায়। মাটি সর্ব্বদা ভিজা থাকায় জমিতে সর্দ্দিভাবের সৃষ্টি হয়—তার ফলে উদ্ভিদদেহে অতিরিক্ত রস সঞ্চার হইয়া গাছ পীড়িত হইয়া থাকে। ভূগর্ভের স্বাভাবিক উত্তাপ নবরোপিত চারার দেহের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মৃত্তিকা আপনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মুখের সাহায্যে আকাশ হইতে অনেক বায়বীয় পদার্থ নিজ দেহে টানিয়া লয় এবং তাহা রসের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উদ্ভিদদেহে পরিচালিত করে। কিন্তু এ সময় মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত থাকায় উহাদের সূক্ষ্ম মুখগুলি জোড়া লাগিয়া যায় এবং বায়বীয় পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। মাটি অধিকতর জমাট বাঁধিয়া গেলে নবরোপিত চারার ক্ষুদ্র কোমল শিকড়গুলি সহজে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া শিশু উদ্ভিদের পক্ষে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা খুবই দুষ্কর হইয়া পড়ে।

গ্রীষ্ম ঋতুর ভিতরে যে সময় রৌদ্রের ভাব অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির থাকে, সেই সময় চারা রোপণ করিতে পারা যায়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কোন মতেই চারা রোপণ করা উচিত নহে। এ সময় জমি সাধারণতঃ শক্ত, জমাট ও নীরস প্রকৃতির হয়। প্রখর রৌদ্রে জগতের সমস্ত সরস পদার্থ হইতেই জলীয় অংশ অল্পবিস্তর বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। নৈসর্গিক আকর্ষণে উদ্ভিদদেহ হইতেও এই ভাবে রস বহির্গত হইয়া যায়। একে ত তাহারা মাটিতে প্রয়োজনীয় রস পায় না—তদুপরি নিজ দেহস্থ রসের অপচয় ঘটিতে থাকে—এ ক্ষেত্রে তাহার বাঁচিবার আশা খুবই কম। শোষণের সঙ্গে পোষণের সমতা রক্ষিত না হইলে ক্ষয়ের মাত্রাই বৃদ্ধির দিকে যায়—কাজেই অতিক্ষয়ে কাহারও অস্তিত্ব জগতে বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না।

নবরোপিত চারা অত্যধিক শীতের প্রাবল্য সহ্য করিতেও অক্ষম হইয়া থাকে। প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল জীবোদ্ভিদ মাত্রেই শীতকালে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচনের আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে। শীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আড়ষ্টতা। এ সময়ে দেহের প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক স্নায়ু এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অল্পবিস্তর আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রত্যেক ক্রিয়ার ভিতরে মন্থরভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সময়ে রস মাত্রেই অধিকতর ঘন হয় এবং তাহাদের সঞ্চালন ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্যই উদ্ভিদজগতে শীতকাল

রাত্রিরূপে পরিগণিত হয়। আমরা যেরূপ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া নিদ্রা যাই, উদ্ভিদগণও সেইরূপ সম্বৎসর ফল ফুল প্রদান করিয়া, এই সময়ে বিশ্রাম লাভ করে। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শীত-কালে অধিকাংশ গাছের পাতা ঝরিয়া যায়—গাছগুলির ভিতরে সর্ব্বত্র যেন একটা নীরব, নির্ঝুমভাব ফুটিয়া উঠে। শীত অন্তে বসন্ত আসিয়া ঘুমন্ত প্রকৃতিকে জাগাইয়া দেয়। নব বসন্তের যাদুপরশে আড়ষ্ট প্রকৃতির বুকে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া যায়—নূতন পল্লবে মুকুলে গাছগুলি ভরিয়া উঠে। এই জন্য শীতকালে গাছ রোপণ আদৌ প্রশস্ত নহে। এই বিশ্রাম-কালে তাহাদিগকে নূতন স্থানে বসাইয়া নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাহারা সহজেই নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়ে। অবশ্য গাছ-বিশেষে এই নিয়মের একটু তারতম্য আছে। গতিশীল জীব-জগতেও স্থান, কাল, পাত্রবিশেষে চিরন্তন প্রথার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। রাত্রিকাল জীবমাত্রেরই বিশ্রামের সময়। কিন্তু সমস্ত জগৎ যখন ঘোর সুষুপ্তিতে মগ্ন—সেই সময় পেচকাদি কতকগুলি নিশাচর প্রাণীর দৈনন্দিন কর্ম্মকাল উপস্থিত হয়। উদ্ভিদজগতেও এরূপ নিশাচর উদ্ভিদ বিরল নহে। গোলাপ গাছ বসাইবার প্রশস্ত সময় শীতকাল। গোলাপই উদ্ভিদজগতে নিশাচর। গোলাপের জীবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় শীত ঋতুতে।

যাহা হউক, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ প্রথম বারি-

পাতের সময় হইতে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং ভাদ্রের শেষ বা আশ্বিনের প্রথম হইতে অর্থাৎ বর্ষার বেগ হ্রাস পাইলে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্তই গাছ রোপণের প্রশস্ত কাল। জ্যৈষ্ঠের শেষে বর্ষাপাত আরম্ভ হইলেই গ্রীষ্মের প্রখরতা কমিয়া যায়— তার পর আষাঢ়ের শেষ হইতেই বর্ষার প্রাবল্য আরম্ভ হয় এবং ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত উহা প্রায় সমভাবে থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে শরৎ ও হেমন্তের প্রথম শিশিরে গাছগুলি বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অবশ্য জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সময় মধ্যে গ্রীষ্ম ও বর্ষার হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত অবসর পাইলেই গাছ রোপণ করিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া যে দিন গাছ স্থায়িভাবে জমিতে রোপণ করা হইবে, সেই দিনটী মেঘমুক্ত পরিষ্কার হওয়া দরকার। কুয়াসাচ্ছন্ন মেঘলা দিনে কখনও গাছ রোপণ করিবেন না। প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নকাল গাছ রোপণের প্রশস্ত কাল। তন্মধ্যে আবার অপরাহ্নকালই সর্ব্বোত্তম। প্রাতে গাছ লাগাইলে অনতিবিলম্বেই রৌদ্র আসিয়া পড়ে। সদ্য-রোপিত চারার পক্ষে রৌদ্রের তেজ প্রথমাবস্থায় সামলাইয়া উঠা কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক সময় গাছ ঝামরাইয়া যায়। অপরাহ্নে রোপণ করিলে চারাগুলি অনেকক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়। রাত্রির অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাসে চারার শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হয়।

এক কথায় অতিরিক্ত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বাদ দিয়া, মেঘমুক্ত পরিষ্কার দিবসে অপরাহ্ন কালেই গাছ রোপণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রোপণ-প্রণালী।

গাছ রোপণ-প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটী বিবরণ উদ্যান রচনা-প্রণালীর ভিতরেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন্ জাতীয় গাছ কোথায় রোপণ করিলে উদ্যান এবং উদ্যানক উভয়েই লাভবান্ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আর তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। নিজ উদ্যানে তৈরী অথবা আমদানী-করা চারা কলম ইত্যাদির প্রাথমিক পরিচর্য্যার পর যখন জমিতে স্থায়িরূপে রোপণ করিতে হইবে, তখন কলমের গোড়ায় যে গুল বাঁধা থাকে, সেই গুলটী যদি শক্ত এঁটেল মাটির তৈরী হয়, তবে গুলটীর উপরিভাগের মাটি বিশেষ সতর্কতার সহিত ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুব বেশী সাবধান না হইলে গাছটী মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। গুলটী ভাঙ্গিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, যেন একটী শিকড়ও নষ্ট বা আহত না হয়। উক্ত শক্ত গুল ভাঙ্গিয়া না দিলে চারা গাছের শিকড় উহা ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পায় এবং তাহাতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। এই সময় মধ্যে গাছটী শীর্ণ ও দুর্ব্বল

হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু গুল যদি বেশ সাধারণ ভাবে তৈরী থাকে অর্থাৎ কোমল মৃত্তিকায় জড়ান থাকে, তবে আর ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই। গুলটীর প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। গুল ভাঙ্গিতে যাইয়া— অনেকে চারাটীকেই মারিয়া ফেলেন। এই জন্য যাহাতে গুল ভাঙ্গিবার প্রয়োজন না হয়, সম্ভ্রান্ত গাছ-ব্যবসায়ীরা সেই ভাবে গুল বাঁধিয়া থাকেন এবং উহা যেন কোন মতে না ভাঙ্গে, ক্রেতাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন।

চারাগুলিকে শিকড় ও মূল কাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে বসাইয়া দিতে হয়। তদনুযায়ী মাপ লইয়া জমিতে প্রথমে গর্ত্ত করিয়া রাখিতে হয়। কলমের চারা পুতিবার সময় জোড় পর্য্যন্ত মাটির ভিতরে পুতিতে হয়। উক্ত জোড় উপরে থাকিলে বাতাসের বেগে কলমটী সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। জোড়ের নিম্নাংশ হইতে যাহাতে কোন শাখা প্রশাখা উদ্গত হইতে না পারে, সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উক্ত শাখা প্রশাখা মূল গাছটীর পরম শত্রু। সুতরাং ঐরূপ শাখা প্রশাখার সম্ভাবনা দেখিলেই— তৎপ্রতীকারে যত্নবান্ হইবেন। উহা জন্মিবামাত্র কাটিয়া ফেলিবেন। উক্ত শাখা প্রশাখা মূল দ্বারা আহরিত সমস্ত রসভাগ নিজেরাই টানিয়া লইয়া নিজ অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করে এবং মূল গাছটী রসাভাবে দিন দিন শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গাছ রোপণের জন্য যে গর্ত্ত করা হইবে, তাহার মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইবেন এবং তাহা হইতে তৃণগুল্মাদির শিকড় বা অন্যান্য আবর্জ্জনা সযত্নে বাছিয়া ফেলিবেন। তার পর ঐ মাটির সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় সার মিশ্রিত করিয়া রাখিবেন। এ ক্ষেত্রে পাতাপচা সার বা অন্য কোনরূপ গলিত সার হইলেই ভাল হয়। তার পর গাছটীকে ঠিক গর্ত্তের মধ্য-স্থলে রাখিয়া, চারি দিক্ হইতে উক্ত গুঁড়া মাটি দিয়া চাপা দিবেন। মাটি খুব দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দিবেন না। তাহাতে মাটি খুব শক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবে এবং উক্ত চাপের ফলে গাছের শিকড়গুলিও অল্পবিস্তর আহত হইতে পারে এবং নিজ ইচ্ছামত বিস্তৃত হইতে বাধা পায়।

এইরূপে গাছ রোপণ করিয়া গাছে জল সেচনের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এ সময়ে গাছের গোড়ায় প্রত্যক্ষভাবে জল না ঢালিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে গাছটীকে অপরাহ্নকালে স্নান করাইয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে অবশ্য জলের প্রয়োজন হয় না। বর্ষা বাদে অন্য সময়ে রোপণ করিলে একদিন অন্তর প্রায় মাসাবধি কাল পর্য্যন্ত উক্ত নিয়মে গাছকে স্নান করান আবশ্যক। ঐ স্নানের জলেই গাছের গোড়া ভিজিয়া যায়, তাহাতে গাছের সমস্ত অংশই জল পায় এবং তাহাতে উহারা যথেষ্ট আরাম অনুভব করে।

———

বৃক্ষ ফলবান্ না হইবার কারণ।

ফল অথবা ফুল লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যক্তি মাত্রে উদ্যান রচনা করিয়া থাকেন। অনেক সময় নানা যত্ন ও সেবা করা সত্ত্বেও কোন কোন গাছ বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়া উদ্যানকের সমস্ত শ্রম ও অর্থ বিফল করিয়া দেয়। ফলকর বৃক্ষের প্রকৃতি হইবে ফল দান করা। তাহা না করিলেই তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতীকারে যত্নবান্ হইতে হইবে।

গাছের এই ফলদানে বিমুখতা স্বেচ্ছাকৃত নহে। মৃত্তিকা ও বহির্জগতের নিকট হইতে সে অনেক সময় এমন সব বাধা বিপত্তি পায়, যে জন্য তাহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায়। জীব মাত্রকেই রোগ, শোক, শত্রুর আক্রমণ এবং আরও নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই উপদ্রবের প্রভাব প্রত্যেক জীবনেই অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। গাছেরও জীবনী শক্তি আছে, অনুভূতি আছে; তাহার ফলে নিত্যনৈমিত্তিক জাগতিক নিয়মে চালিত পরিবর্ত্তনের প্রভাব তাহার জীবনী শক্তির উপরেও অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে একই স্থানে রোপিত, একই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত বৃক্ষরাজির মধ্যে কোনটী বা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উদ্যানস্বামীর শ্রম সফল করিয়া তোলে,

আবার কোনটী হয় ত ফুল ফলদানে অক্ষম হইয়া উদ্যানকের শ্রম বিফল করিয়া দেয়। কিন্তু বৃক্ষের এই অক্ষমতার মূলে যে কারণ নিহিত থাকে, তাহা নির্ণয় করিয়া, সেই কারণ দূর করিতে পারিলেই বৃক্ষ তাহার লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পায়। পীড়িত ব্যক্তি দিন দিন নষ্টস্বাস্থ্য হইয়াও উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিলে পুনরায় স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হয়। উদ্ভিদগণের পক্ষেও ঠিক একই নিয়ম প্রযোজ্য।

গাছ যদি পীড়িত হইয়া পড়ে বা অতিরিক্ত তেজাল হয়, তবে প্রায়শঃই তাহারা ফলদানে বিমুখ হয়। এই পীড়ার কারণ—কীট পতঙ্গ বা পরগাছা ইত্যাদির আক্রমণ। ইহাদের আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেই গাছ সুস্থ হইবে। গাছের গোড়ায় জল জমিয়া অতিরিক্ত রস সঞ্চয় হেতু গাছ রুগ্ন হইয়া যায়। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নানারূপ পোকা মাকড় জন্মিয়া গাছের মূলে ক্ষত সৃষ্টি করে। নানারূপ কীট পতঙ্গ বৃক্ষের ত্বকে, শাখা প্রশাখায় ও পত্রে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া গাছটীকে দিন দিন অধিকতর রুগ্ন করিয়া ফেলে। গাছ ফুল ফল ধারণ না করিলে সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। অনুসন্ধানের ফলে যে ত্রুটি বাহির হইবে, তাহারই নিরাকরণে তৎপর হইতে হইবে।

সাধারণতঃ উদ্যানের জঙ্গল বা আবর্জ্জনা হইতেই এই সব কীট পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই জন্য বাগানে অনাবশ্যক গাছ-

গাছড়া থাকিতে দিবেন না। বাগান পরিষ্কার করিয়া, আবর্জ্জনার স্তূপ বাগানের ভিতরে না রাখিয়া, বাহিরে এক স্থানে জড় করিয়া রাখিবেন ; পরে উহা পচিয়া উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হইবে। কিন্তু ঐ সার টাটকা কখনও ব্যবহার করিবেন না। তাহা হইলে ঐ সঙ্গে গাছের গোড়ায় নানারূপ কীট আসিয়া পৌঁছিবে এবং আরও নূতন কীটেরও সৃষ্টি হইতে পারে। এই জন্য ঐগুলি রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিবেন। শেষে ভালরূপে চালিয়া লইয়া গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিবেন। চালিয়া লইলে পর যে ঈষৎ স্থূল কণিকা বা টুকরাগুলি থাকিবে, সেগুলি আগুনে পোড়াইয়া ছাই করিয়া ব্যবহার করিলে খুব ভাল হয়। এই সার গাছের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। বাগানে স্তূপীকৃত করিয়া পচাইলে উহা হইতে নানারূপ কীট পতঙ্গ সৃষ্টি হইয়া উদ্ভিদের শত্রুতা সাধন করিবে।

অনেক গাছে মুকুল হয়, কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাহা শুকাইয়া ঝরিয়া যায়—ফল জন্মিবার আর অবকাশ পায় না। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে, ফল প্রসবের জন্য বৃক্ষদেহে যে উপাদানের প্রয়োজন, সে তাহা পর্য্যাপ্তরূপে পায় নাই। যেটুকু তাহার ভিতরে ছিল, মুকুল প্রসবেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মুকুলের পুষ্টি সাধন করিয়া তাহাকে ফলে পরিণত করিবার মত শক্তি তাহার আর নাই। অনেক সময় দেখা যায়, একই গাছে প্রত্যেক বৎসরই এই ভাবে মুকুল

ঝরিয়া পড়ে। তাহার কারণ ঐ একই। তাহার ভিতরে এমন একটা দুর্ব্বলতা আছে বা এমন একটা উপাদানের অভাব আছে, যাহা সে কোন মতেই দূর করিতে পারিতেছে না। সম্বৎসরের চেষ্টার ফলেও সে ফল প্রসবের জন্য পরিমিত শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই। খাদ্য গ্রহণ এবং তাহা পরিপাক করিয়া দেহ রক্ষার জন্য ও দেহ ধারণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সকলে সমানভাবে প্রস্তুত করিতে পারে না। মানব-জগতেও এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একই গৃহে একই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া কেহ হয় ত সুস্থ সবল-দেহী হয়, কেহ বা চিররুগ্নই থাকিয়া যায়। আবার যেমন দুর্ব্বল ক্ষীণদেহী ব্যক্তিকে দিয়া কোন দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইলে আমরা বলকারক টনিক ব্যবহার করাইয়া তাহার সাময়িক বলাধান করাইয়া লই এবং উক্ত বলসঞ্চারের ফলে সে নিরূপিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ বৃক্ষকে ফলশালী করিবার জন্য এই মুকুলিত অবস্থার প্রারম্ভে নূতন বলসঞ্চার করাইতে হয়। এই সময় গোড়ায় উৎকৃষ্ট সার ও নিয়মিতভাবে জলদান করা আবশ্যক। এই ভাবে পরিমিত সার প্রয়োগে তাহার দেহে তেজ বৃদ্ধি পায় এবং মুকুলগুলিকে পোষণ করিয়া ফলে পরিণত করিবার শক্তি লাভ করে। প্রত্যেক গাছেই ফল প্রসবের সময় কিছু না কিছু সার প্রয়োগ করিলে উত্তম হয়।

সার এক দিকে যেমন গাছের পক্ষে হিতকারী, অতিরিক্ত

সার আবার তেমনই অপকারী। অতিভোজনে কেহ বা রুগ্ন হইয়া পড়ে, আবার কাহারও হয় ত বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। চর্ব্বিযুক্ত মোটা থলথলে ব্যক্তি সংসারে বিরল নহে। তাহাদের বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিতে মোটামুটী মন্দ নহে। কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। গাছের বেলাতেও তাহাই। অতিরিক্ত সার প্রয়োগে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি হ্রাস পাইয়া, শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহারা ফল প্রদানে প্রায়ই অক্ষম হয়। এইরূপ গাছকে ষাড়াইয়া যাওয়া বলে। কাজেই সার প্রয়োগের সময় এ বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এইরূপ অতিরিক্ত তেজাল গাছের শাখা প্রশাখা ও পত্রাদির সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে হয়। তাহাতে গাছের তেজ কমে। তাহা ছাড়া বৃক্ষকাণ্ডের বা স্থূল শাখা-প্রশাখার স্থানে স্থানে কোন অস্ত্র দ্বারা ঘা করিয়া দিলে রস নিঃস্থত হইয়া উহার তেজ বৃদ্ধিতে বাধা জন্মায়। তখন উহার বৃদ্ধির গতি দেহের দিকে না গিয়া, ফল প্রসবের দিকে ধাবিত হয় এবং গাছের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়।

অনেকে অনেক সময় নানারূপ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া বলপূর্ব্বক ফল লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা খুবই অন্যায়। প্রকৃতির সঙ্গে পর্য্যায় রক্ষা করিয়া বিধিসঙ্গত উপায়ে যতটা লাভ করা যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উদ্যানক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আপাততঃ অধিক ফল লাভে

নিজকে লাভবান্ মনে করিলেও অদূর ভবিষ্যতে সেই বৃক্ষ হইতে একটী ফলও যে লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে, তাহার প্রতীকারোপায় কে নির্ণয় করিবে? এ জন্য তাঁহাকে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, তাহা আর পূরণের সুযোগ ঘটিবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ প্রকৃতির উপর অত্যাচার করা। প্রতিদানে প্রকৃতিও যে তাহার উপর প্রতি-শোধ তুলিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃতির সঙ্গে ভাব রাখিয়া চলিলে দীর্ঘকাল স্থায়িভাবে ফল ভোগ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। কিন্তু ভাবের অভাব হইলেই দুরন্ত প্রকৃতির প্রতিহিংসায় পরিণামে অনুতাপ মাত্রই সার হইবে। বয়স, খাদ্যাখাদ্য ও জল বায়ুর তারতম্য অনুসারে জীবমাত্রেরই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। উদ্ভিদজগৎ এ নিয়মের বহির্ভূত নয়। সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে গেলে ক্ষয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে অক্ষমতাও শীঘ্র আসিয়া দেখা দেয়। সেই জন্য কোন উদ্যানকেরই বলপূর্ব্বক অধিক ফল লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়।

মুকুলসম্ভাবী বৃক্ষের পরিচর্য্যা।

গাছ মুকুলিত হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই গাছের পরিচর্য্যা আরম্ভ করিতে হয়। এই সময়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যা না পাইলে গাছ অনেক সময় আশানুরূপ ফল দান করিতে পারে না।

কোন্ সময়ে কোন্ গাছ মুকুলিত হয়, তাহা জানিয়া রাখা প্রত্যেক উদ্যানকের একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে তিনি সময়োচিত পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। গাছে মুকুল আসিবার অন্ততঃ মাস দুই পূর্ব্বেই এই পরিচর্য্যা শেষ করিতে হয়। কারণ, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ঠিক না থাকিলে উদ্ভিদগণ উক্ত পরিচর্য্যার উপকারিতা বুঝিতে না বুঝিতেই মুকুলিত হয় এবং ফল প্রসব করিতে থাকে। কাজেই সেরূপ পরিচর্য্যা করা না করা একই কথা।

দুই মাস পূর্ব্বে গাছের গোড়া বেশ সাবধানে খুঁড়িয়া ৭।৮ দিন বাহিরের আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে রাখিতে হয়। মৃত্তিকার অন্তরস্থিত তৃণ আবর্জ্জনা ইত্যাদি সাবধানে বাছিয়া ফেলিতে হয়। আলো ও মুক্ত বায়ুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসায় মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অনেক দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। মূল ও শিকড়গুলির কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তার পর নূতন মাটিতে উপযুক্ত সার মিশ্রিত করিয়া গোড়া আবার ঢাকিয়া দিতে হয়।

সাবধানতা সত্ত্বেও অনেক সময় গোড়া খুঁড়িবার কালে গাছের মূল ও শিকড় অল্পাধিক আহত হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে তাহার আঘাত সামলাইয়া লইতে পারে বলিয়া ফল প্রসবের পক্ষে গাছের কোন বাধা জন্মে না। তার পর ইতিমধ্যে সারগুলি মৃত্তিকার সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকাগর্ভে উৎকৃষ্টতর খাদ্যপ্রাণ সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই দুই মাস পরে গাছ যখন মুকুলসম্ভাবী হইবে, তখন সে

সেই নূতন খাদ্য আহরণ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টি সাধনে হইবে।

ঐ সময়ে গাছের শাখা-প্রশাখাগুলিও অল্পবিস্তর ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মরা, শুষ্ক অথবা অকর্ম্মণ্য রুগ্ন ডালপালা ও পত্রাদি একেবারে কাটিয়া বাদ দিতে হয়। এই সময়ে ছাঁটিয়া দিলে গাছের পুষ্টি ফল-প্রসবের দিকে অধিকতর উপযোগী হইবে। কিন্তু ফলোন্মুখী হইবার কালেই যদি ছাঁটিয়া দেওয়া যায়, তবে মুকুলিত হইবার প্রারম্ভেই সদ্য আঘাতের প্রথম ধাক্কায় তাহার প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং উক্ত সঙ্কো-চনের ফলে আশানুরূপ ফুল ফল দানে বিরত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ছাঁটিয়া রাখিলে উক্ত আঘাতের ধাক্কা সামলাইয়া, ফল প্রসবের দিকে স্বীয় প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতে পারে।

এই সময় যেন জমি একেবারে শুষ্ক বা অতিরিক্ত ভিজা না থাকে। যে সব গাছে নিয়মিত ভাবে জল সেচন করা হইয়া থাকে, মুকুলিত হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাহাতে জল দান একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। শেষে যখন গাছে মুকুল ধরিবে, তখন আবার জল দিয়া, পরে ফলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের মাত্রাও বাড়াইয়া দিতে হইবে। এই সময় জমি সর্ব্বদাই রসাল থাকা আবশ্যক। নচেৎ মুকুল ও ফল উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ফলগুলি মাঝামাঝি রকমের বড় হইলে শুধু গোড়ায় জল না দিয়া, সমস্ত গাছটাকে মাঝে মাঝে স্নান করাইয়া দিলে ভাল হয়। এ ক্ষেত্রে পিচকারী সাহায্যে

জল ছিটাইয়া দেওয়াই উচিত। ইহাতে গাছের প্রকৃতি স্নিগ্ধ থাকে, ফলের বোঁটা দৃঢ় হয় এবং গাছে অনেক দিন পর্য্যন্ত ফল ভালরূপে থাকে।

মুকুলিত হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে যদি জমি অত্যন্ত ভিজা বা রসস্থ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে মাটি বার বার ওলট পালট করিয়া দিলে বাহিরের বাতাসে উহার জলীয় অংশ অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু এ সময় গাছের শিকড়, মূল বা কাণ্ড যেন কোনরূপে আহত না হয়, তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সময়ে কোনরূপ আঘাত গাছের প্রকৃতিতে আকস্মিক চমক লাগাইলে মুঞ্জরিত হইতে বাধা জন্মিতে পারে।

প্রকৃষ্ট প্রণালীমত পরিচর্য্যায় ফলগুলি আকারে, স্বাদে ক্রমেই উন্নত হইয়া থাকে এবং এই পরিচর্য্যার অভাব হইলে উৎকৃষ্ট ফলও ক্রমে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

কলম তত্ত্ব।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে—"Neecssity is the mother of invention"। বাস্তবিকই প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন সিদ্ধির নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে যতটা প্রয়োজন, সেই প্রয়ো-জন মিটাইতে সে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে ততটা পরিচালিত করিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলেই জগতে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

গাছ হইতে কলম করিবার প্রথা এ দেশে নূতন না হইলেও কত দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু এই প্রথার মূলেও মানবের প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল। বীজ হইতেই স্বাভাবিক গাছের উৎপত্তি। কিন্তু এই বীজোৎপন্ন গাছের নানারূপ বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা থাকা সত্ত্বেও নূতন নিয়মে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবার জন্য মানবের মনে স্বতঃই যখন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, তখনই নানা গবেষণার ফলে এই 'কলম-পদ্ধতি'র সৃষ্টি হইল। দেশ-মধ্যে গাছ-গাছড়ার আদর যতই বাড়িতে লাগিল, কলমের প্রসার ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে এ দেশে কলম খুব সহজ-লভ্য ছিল না। কিন্তু আজকাল চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমেই সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। দেশমধ্যে বড় বড়

নার্শারী প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের এই অভাব মোচনে যত্নবান্ হইয়াছে।

বীজ হইতে যে চারা প্রস্তুত হয়, তাহার প্রকৃতি প্রায়ই মূল গাছের প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন রোধ করিবার একমাত্র উপায় কলম। কলম তাহার মূল গাছের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। বীজ হইতে উৎপন্ন চারার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির, কিন্তু কলমের বৃদ্ধি খুব দ্রুত। বীজের গাছ হইতে ফলও বিলম্বে পাওয়া যায়, কিন্তু কলম হইতে খুব শীঘ্রই ফল লাভ করা যায়। এই সমস্ত কারণেই লোকে বীজের চারা অপেক্ষা কলমের পক্ষপাতী বেশী।

কলমের চারা বিশেষ সুবিধাজনক হইলেও সব গাছের কলম প্রস্তুত হয় না। এই বিষয়ে গাছকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই উভয় জাতীয় গাছের ভিতরে গঠনের যে তারতম্য আছে, তাহা হইতেই বোঝা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার গাছ কলম প্রস্তুতের উপযোগী নহে।

আম, জাম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি গাছের মত যাহাদের পাতাগুলি শিরাবহুল—কিন্তু প্রত্যেকটী শিরাই অসরল, জালের গ্রন্থির মত পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত, এইরূপ গাছই কলম প্রস্তুতের উপযোগী। ইহাদের পাতাগুলি শুষ্ক হইয়া গেলে শাখা-প্রশাখা হইতে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভাবে ঝরিয়া যায়, পত্রের পতনের সঙ্গে শাখা-প্রশাখার কোনরূপ স্থানচ্যুতি ঘটে না।

পাতা একবার পড়িয়া গেলে সেই স্খলিত গ্রন্থির মুখেই আবার নূতন পল্লবের উদ্ভব হয়। এই জাতীয় গাছ ইংরেজীতে 'একসোজিনস্' নামে অভিহিত।

খেজুর, নারিকেল, তাল ইত্যাদির গঠন ও প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহাদের মত যে সব বৃক্ষের পাতা সরল, একশিরা বিশিষ্ট, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং পাতাগুলি শুকাইয়া গেলেও শাখার পতন না হইলে বৃক্ষগাত্র হইতে খসিয়া পড়ে না, শাখাগুলি স্খলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িলে বৃক্ষকাণ্ডে সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকিয়া যায়, এরূপ গাছে কখনও কলম প্রস্তুত হয় না। এইরূপ গাছকে ইংরেজীতে 'এণ্ডোজিনস্' বলা হয়।

যাহা হউক, যে গাছ হইতে কলম করা হইবে, সেই গাছের স্বাস্থ্য, ফলোৎপাদনের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কলম মূল গাছের পূর্ণ প্রতিকৃতি। কাজেই মূল গাছ যে বিষয়ে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হইবে, কলমেও সেই সব দোষ বা গুণ বর্ত্তিবে। কলম তৈয়ারী করিবার নানারূপ উপায় আছে। প্রত্যেক উপায়ে প্রস্তুত কলমের বিভিন্ন নাম আছে। অবশ্য যে উপায়েই কলম প্রস্তুত হউক না কেন, উহাতে কলমের গুণের কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। গাছ ভেদে সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করা হয় মাত্র। ফলকর গাছের জন্য ডাল কলম, চোক কলম, জিব কলম জোড় কলম, চোঙ কলম, গুল কলম ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সকল শাখায় বা সকল চারাতেই কলম প্রস্তুত হয় না। এ জন্য বেশ ধীর ভাবে উপযুক্ত শাখা ও চারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সুনির্ব্বাচিত গাছটীর কাণ্ড বা যে শাখাটী হইতে কলম প্রস্তুত হইবে, তাহা অত্যন্ত মোটা, খুব দৃঢ় ও পুরাতন হইলে চলিবে না। এরূপ শাখা হইতে কলম প্রস্তুত করা যেমন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও যত্নসাপেক্ষ, তেমনি ইহা হইতে প্রস্তুত কলম হইতে সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। এইরূপ শাখার স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি মন্থর এবং রসপ্রবণতাও কম। আপনার দেহ পুষ্ট করিয়া, সেই রসে নূতন আর একটী জিনিষের পোষণের মত পর্য্যাপ্ত শক্তি এই শাখায় খুব কমই থাকে। এই জন্য যদিই বা অনেক কষ্টে এবং বিলম্বে কলমটী প্রস্তুত হয়, তথাপি শিশু চারার দেহ পোষণোপযোগী প্রয়োজনীয় পর্য্যাপ্ত রসে বঞ্চিত হওয়ায় ইহা তাদৃশ বল সঞ্চয়ে সক্ষম হয় না। সেই জন্য এই কলম হইতে সুফলের আশা বিশেষ করা যায় না। নূতন, নরম, কচি ডালও কলম প্রস্তুতের উপযোগী নহে। ইহাদের রস অত্যন্ত পাতলা। অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র প্রচুর তরল রস নির্গত হইয়া—ডালটীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে বা অনেক সময়ে একেবারে মারিয়াই ফেলে। কাজেই কলম করিবার পক্ষে নূতন ডালও উপযুক্ত নহে। পূর্ণ পরিপক্কতা লাভ করে নাই, এরূপ নীরোগ, সুঠাম শাখাই কলমের পক্ষে প্রশস্ত। ইহার স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি ও রসগ্রাহিতা পূর্ণ মাত্রায় থাকে। অর্দ্ধপরিপক্ক শাখার রস কচি ডালের মত তরল বা মোটা

পুরাতন ডালের মত ঘন নহে। ইহারা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু, রৌদ্রের প্রখর তাপ সহ্য করিয়া কলমের পুষ্টি সাধন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এই জন্য এই শাখাই কলমের পক্ষে সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণীয়।

কলম প্রস্তুত করিতে গিয়া অনেকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের উপযুক্ত শাখা-নির্ব্বাচনের অক্ষমতা এবং কলম প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অল্পতাই ইহার কারণ।

কলম প্রস্তুত করিবার রীতি সাধারণতঃ দুই প্রকারের। কোন চারার সহিত অন্য কোন গাছের অংশবিশেষ যুক্ত করিয়া একরূপ কলম প্রস্তুত হয়। অপর, অন্য কোন একটী গাছের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র লইয়া তদ্দারা নূতন চারা প্রস্তুত হয়। চোক্ কলম, জিব কলম, জোড় কলম ইত্যাদি প্রথমোক্ত উপায়ে এবং গুল কলম, দাবা কলম, ডাল কলম প্রভৃতি দ্বিতীয় উপায়ে প্রস্তুত হয়।

পৃথক্ পৃথক্ কলম প্রস্তুতের আবার বিভিন্ন প্রথা আছে। প্রত্যেক উপায়ের সঙ্গেই কলমকারকের দূরদর্শিতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও ধৈর্য্যের সমাবেশের প্রয়োজন। ইহার যে কোনটীর অভাব হইলে সাফল্য কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ধীর স্থির, সুবিবেকী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সহজ ভাবে কলম প্রস্তুতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কলমবিশেষে একটু ত্রুটি বা ধৈর্য্যের অভাব হইলে সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া যায়।

চোক কলম।

একই গাছে নানাজাতীয় ফল বা ফুল তৈরী করাইতে হইলে চোক কলমই একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে নানাজাতীয় অর্থে কুলগাছে পীচ বা পীচগাছে কুল নহে। এক কুলেরই নানা প্রকার আছে। একই সমজাতীয় গাছে প্রকারের বিভিন্নতার সমাবেশ করা যায় মাত্র। একটী গাছেরই এক ডালে উৎকৃষ্ট ফল হইবে—অপর ডালে নিকৃষ্ট ফল ধরিবে। এই উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা—স্বাদে, গন্ধে, আকারে সর্ব্ববিধ প্রকারেই দৃষ্ট হইতে পারে। একটী গাছে সমজাতীয় বিভিন্ন প্রকারের গাছ হইতে চোক তুলিয়া আনিয়া, যতগুলি সম্ভব বসাইলে, একই গাছে রকমারী ফল পাওয়া যাইবে এবং গাছও শীঘ্রই ঝাড়াল হইয়া উঠিবে।

অত্যন্ত শক্ত আঁটিবিশিষ্ট যে সমস্ত ফল, তাহাদের পক্ষে চোক কলমই উৎকৃষ্ট। এই সব গাছ হইতে প্রায়ই আটা বা রস নির্গত হইতে থাকে। অবশ্য এইরূপ রস নির্গমনের কারণ

এক প্রকার কীট। এই জাতীয় কীটের আক্রমণ এই সমস্ত বৃক্ষের উপর অত্যন্ত বেশী। এইরূপ রস নির্গত হওয়ায় গাছগুলি স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জন্য অন্য কোনরূপে কলম করিতে গিয়া গাত্রে ক্ষত সৃষ্টি করিলে উক্ত কীট ঐ ক্ষতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গাছটীকে আরও বেশী দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এই জন্য চোক কলম করাই যুক্তিযুক্ত। নতুবা ইহারা অধিকতর রুগ্ন হইয়া পড়ে। তার পর এই সব গাছের রসপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন। এই কারণে ইহাতে জোড় কলম ইত্যাদি বাঁধা সহজসাধ্য নহে। অতিরিক্ত রস-প্রবাহে কলমে জোড় বাঁধিতে বাধা জন্মে।

অত্যন্ত শীত ও অতিরিক্ত গরম বাদ দিয়া, বৎসরের অন্য সব সময়েই চোক কলম প্রস্তুত করা যায়। শীত অন্তে বসন্তের সমাগমে যখন প্রকৃতির ভিতরে আবার নব জীবনের সাড়া পড়িয়া যায়, তখনই এই কলমের পক্ষে প্রশস্ত কাল। এই সময় গাছে নূতন পাতা, নূতন শাখা-প্রশাখা সৃষ্ট হইতে থাকে। গাছের ছাল কাষ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত একটু শিথিল হইয়া পড়ে। জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উদ্ভিদজগতে এই সময়েই অনুভূত হইয়া থাকে। এই পরিপূর্ণ আনন্দের উন্মাদনার মুখে নূতন সৃষ্টির প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ফলবতী হয়। কাজেই সম্বৎসরের ভিতরে এই সময়ে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসেই এই কলম করিতে পারিলে ভাল হয়। তবে ফাল্গুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্তই ইহা প্রস্তুত করা চলিতে পারে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে কলম প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। অতিরিক্ত গরমে চোকগুলি প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এই জন্য ইহার উপর ছায়াদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও প্রায়ই কলম নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য এই দুটী মাস বাদ দিয়া করাই ভাল। কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত শীতের জন্য উদ্ভিদজগতে একটা জড়তা আসে। এই সময়টা গাছের বিশ্রামকাল। কাজেই এ সময়ে কলম প্রস্তুত করিতে যাওয়া বৃথা।

যে গাছটীতে চোক বসাইতে হইবে, তাহা কম পক্ষে এক বৎসরের পুরাতন হওয়া দরকার। অবশ্য প্রাচীন গাছ হইতেও কলম প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু তাহা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এ বিষয় বিশদভাবে পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং বাহুল্য ভয়ে এ স্থানে আর উদ্ধৃত করা হইল না। যে গাছটীতে চোক বসাইতে হইবে, সেই গাছটীর শাখা-প্রশাখাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তার পর অপর কোন উৎকৃষ্ট গাছের বেশ স্বাস্থ্যবান্ শাখা অথবা প্রশাখা হইতে ভাল দেখিয়া চোক তুলিয়া আনিবেন। প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা পত্রের গ্রন্থির ক্রোড়ে চোক থাকে। সুতীক্ষ্ণ ছুরী দিয়া চোকের উপরিভাগে এবং নিম্নভাগে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে কাষ্ঠ সমেত ছাল তুলিবেন। কাষ্ঠ বাদ দিয়া শুধু ছালটী তুলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু ঐ ছালটী পাখের কলমের মত ঈষৎ হেলাইয়া কাটিতে হইবে। তার পর চোকটী সাবধানে তুলিয়া ভিজা

কাপড়ের ভিতর রাখিয়া দিবেন। কোন জলপূর্ণ পাত্রের ভিতরে রাখিলেও চলিবে। মোট কথা, ইহাকে সর্ব্বদা সরস রাখিবার জন্য যে কোন ভাবে জলের সংশ্রবে রাখিতে হইবে। শেষে যে চারার যে স্থানে চোক বসাইতে হইবে, সেই স্থানে ইংরেজী 'T' এরূপ একটী দাগ কাটিয়া, সাবধানে ছালটী আল্‌গা করিয়া, উহার ভিতরে চোকটী বসাইবেন। তার পর চারার ছালটী উহার উপরে এমন ভাবে বিছাইয়া দিবেন, যেন চোকটী বাহিরে থাকে। অবশেষে নরম সুতা বা কলাগাছের ফেঁকড়ী দ্বারা সাবধানে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবেন। কিন্তু চোকটীকে সর্ব্বদাই বন্ধনের বাহিরে রাখিতে হইবে। তখন এঁটেল মাটি বা রজন ও টার্পিন তৈল মিশ্রিত করিয়া আগুনে গালাইয়া উহার উপরে প্রলেপ দিয়া রাখিবেন। ইহাতে বাহিরের আলো ও বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া কলম প্রস্তুতে বাধা জন্মাইতে পারিবে না। এ সময়ে রৌদ্র প্রখর হইলে মস্‌ অথবা খড় দিয়া কলমের স্থান জড়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

চোক তুলিবার সময় পাতা সহ কখনও চোক তুলিয়া বসাইতে যাইবেন না। কারণ, চোক নিজেই তখন পরিপুষ্টির জন্য অপরের মুখাপেক্ষী থাকে। তাহার উপর আবার পত্রগুলিকে পরিপোষণ করিতে হইলে, সে নিজ পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে সে অনেক সময় মারাও যায়।

সাধারণতঃ দুই সপ্তাহের ভিতরেই চোক ফুটিয়া নূতন পল্লবের সৃষ্টি হয়।

জিব কলম
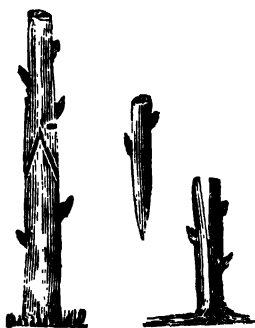
গাছের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে জিব কলম বিশেষ উপ-যোগী। এই কলম প্রস্তুত করিবার প্রশস্ত সময় বসন্ত কাল। এই কলম উত্তাপ সহ্য করিতে একরূপ অক্ষম বলিলেই চলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এ কলমে কৃতকার্য্য হওয়া একটু দুরূহ। তাহা সত্ত্বেও অনেকে এই কলম প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং পর্য্যাপ্ত জল দানের ফলে ক্ষেত্রবিশেষে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন।

জিহ্বার মত আকারে এই কলম কাটিতে হয় বলিয়া ইহাকে জিব বা জিহ্বা কলম বলে। বীজোৎপন্ন চারার সহিত

এই কলম বাঁধিতে হয়। বেশ সুপুষ্ট উৎকৃষ্ট ১টী বীজের চারার মাথা একেবারে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। শেষে অবশিষ্ট কাণ্ডটীর ১॥০ ইঞ্চি কি ২ ইঞ্চি পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত ইংরেজী V এইরূপ আকারে কাটিতে হইবে। তার পর অপর কোন সমশ্রেণীর উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছ হইতে সুপুষ্ট সতেজ শাখাংশ কাটিয়া আনিয়া এমন ভাবে চাঁচিতে হইবে, যেন চারার ঐ কর্ত্তিত অংশমধ্যে বেশ ভালরূপে বসিতে পারে। শাখাটীর অধোভাগ হইতে ২।৩ ইঞ্চি পরিমাণ গ্রহণ করিবেন এবং লক্ষ্য রাখিবেন, যেন শাখার উক্ত অংশে দুই তিনটী চোক থাকে। ঐ চোক হইতেই শাখা পল্লবের সৃষ্টি হইবে। যাহা হউক, উভয়কে একত্র আবদ্ধ করিয়া ভালরূপে বাঁধিয়া দিবেন। তার পর চারাটীর উপরে ছায়া দানের ব্যবস্থা করিবেন এবং নিয়মিত ভাবে জল দিবেন।

চারাটীর কাণ্ড মোটা হইলে একটী গাছে একাধিক কলম বসাইতে পারা যায়। কাণ্ডটীর চারি পার্শ্বে যতগুলি সম্ভব, স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কাটিয়া, একই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কলম আনিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বসাইতে হইবে। উপরের চিত্র দেখুন।

———

জোড় কলম।

বর্ষাকাল ও শরৎকালই এই কলম বাঁধিবার প্রশস্ত সময়। এই সময় গাছের রস তরল এবং ছাল অপেক্ষাকৃত আল্গা ভাবে থাকে। গ্রীষ্মকালে এরূপ কলম বাঁধিতে গেলে অতিরিক্ত উত্তাপে রস শুকাইয়া যায় এবং জোড় বাঁধিতে বিলম্ব ঘটে বা অনেক সময় জোড় বাঁধেই না। জোড় বাঁধিতে ক্ষেত্র ও সময়-বিশেষে ১০।১২ দিন হইতে ১৫।২০ দিন পর্য্যন্ত লাগিতে পারে।

কোন গাছের ডালের সহিত সমশ্রেণীর অন্য জাতীয় চারাকে সংযুক্ত করিয়া যে কলম বাঁধা হয়, তাহাকেই জোড় কলম বলে। ইহা দ্বারা গাছের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ফলকর বৃক্ষের মূল কাণ্ডের সহিত সম-শ্রেণীর উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষের শাখার মিলন ঘটাইয়া, উক্ত গাছে সুন্দর সুস্বাদু ফল উৎপন্ন করান যাইতে পারে।

প্রকৃতির স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া যে চারাটী হইতে উৎকৃষ্ট ফল লাভের আশায় জোড় বাঁধিতে হইবে, সেই মনোনীত চারাটীকে টবে বা গামলায় রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে। অবশ্য মাটিতে রাখিলেও চলে, কিন্তু যে গাছের শাখার সঙ্গে জোড় বাঁধিতে হইবে, উক্ত চারাটীর উচ্চতা যদি সেই শাখার সমান না হয়, তবে জোড় বাঁধা সম্ভব হয় না। এই জন্যই নির্ব্বাচিত চারাটীকে সযত্নে টবে তুলিয়া কিছুদিন পালন করিতে হয়। টবে চারাটী বেশ ভালভাবে জমিয়া গেলে পর টবটিকে গাছের নিকটে এরূপভাবে ঝুলাইয়া—অথবা উচ্চ মঞ্চ করিয়া বসাইয়া রাখিতে হইবে যে, উক্ত গাছের নির্ব্বাচিত শাখাটীর সঙ্গে মিলন সহজেই সম্ভব হইতে পারে। এই চারাটী অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসরের পুরাতন হইবে এবং মূল গাছের শাখাটীও অর্দ্ধপরিপক্ক, সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান্ হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শাখাটী যেন চারাটীর কাণ্ড অপেক্ষা স্থূলতর না হয়। বরং চারাটীর কাণ্ড অপেক্ষাকৃত একটু স্থূল হইলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু শাখাটী অধিক স্থূল হইলে চারাটীর পক্ষে উক্ত শাখাকে পোষণ করা একটু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে।

নির্ব্বাচিত শাখাটীর নিকটে চারাটীকে ঠিক স্থানে বসান হইলে, শাখাটীকে দোলাইয়া চারার সঙ্গে সহজে মিলিত হয় কি না দেখিতে হইবে। কোন্ স্থানে পরস্পরের মিল অধিক, তাহা লক্ষ্য করিয়া উভয়কেই চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন। শেষে উভয়কে পৃথক্ ভাবে কাটিতে হইবে। শাখা ও কাণ্ডের মিলন—

সম্ভব স্থলে ৩।৪ অঙ্গুলি-পরিমিত স্থান লম্বালম্বি ভাবে বেশ সাবধানে কাণ্ড ও শাখার স্থূলতার আনুমানিক সিকি ভাগ গভীর ভাবে কাটিতে হইবে। কাটিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন শাখা বা কাণ্ড ভাঙ্গিয়া না যায় বা অধিক কর্ত্তিত না হয়। এইরূপে পরিমাণমত কাটা হইলে উভয়কে যুক্ত করিয়া, কোমল অথচ শক্ত সূতা অথবা অন্য কিছু দিয়া বাঁধিয়া দিবেন। শেষে জোড়ের উপর রজন বা টার্পিণ তৈল গালাইয়া বা তদভাবে এঁটেল মাটির প্রলেপ দিয়া দিবেন। তাহা হইলে বাহিরের আলো ও বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অতঃপর জোড় সম্মিলিত হইয়া গেলে জোড়ের নিম্ন ভাগের শাখাটী কাটিয়া ফেলিবেন। আরও কিছু দিন পরে জোড়ের উপরি ভাগে চারার মাথাটী ছেদন করিয়া কলম নামাইবেন। কিন্তু প্রত্যেক বার কাটিবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যেন ঝাঁকি লাগিয়া কলমটী চমক না খায় বা জোড়ের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়। তারপর কলমটীকে হাপোরে কিছু দিন রাখিয়া প্রতিপালন করতঃ স্থায়িভাবে জমিতে লাগাইয়া দিবেন।

অনেকে একই গাছে দুই রকম ফল পাইবার উদ্দেশ্যে চারাটীর মস্তক ছেদন করিতে চাহেন না। ইহাতে দুই রকম ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু শাখা হইতে যে কলমটী প্রস্তুত হয়, তাহার বিশেষ অনিষ্ট হয়। উহা পর্য্যাপ্ত পোষণের অভাবে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে প্রায়ই মারা

যায়। সুতরাং অতি লোভ করিতে গিয়া চারাটীর নিকৃষ্ট ফলই ভোগ করিতে হইবে। শাখাটী বাঁচিলেও হয় ত অতি-রিক্ত দুর্ব্বলতার জন্য ফল দানে বিমুখ হইয়া থাকে বা ফল দিলেও বিশেষ উৎকৃষ্ট ফল দানে সক্ষম হয় না। এই জন্য এরূপ প্রথার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। একই গাছে নানারূপ ফল পাইতে হইলে চোক বা চোঙ কলম করাই প্রশস্ত। ইহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; নিঃসন্দেহে একই গাছ হইতে নানাবিধ ফল লাভের আনন্দ উপভোগ করা যায়।

গুল কলম।

বর্ষার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কলম প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সময়। এই কলমের জন্য জলের প্রয়োজন খুব বেশী। কাজে কাজেই বর্ষাকালে ইহা প্রস্তুত করাই সুবিধাজনক।

যে সব গাছে ঘন আটা নির্গত হয়, সে সব গাছের শাখায় গুল কলম বাঁধা নিরাপদ্ নহে। কারণ, শাখা প্রশাখার কর্ত্তিত স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘন রস বাহির হইয়া, যে শিরাগুলি হইতে নূতন মূল বাহির হইবে, সেই শিরাগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শিকড় নির্গমনে বাধা জন্মে। এইরূপ গাছে যে আদৌ গুল কলম হয় না, তাহা নহে। অনেক চেষ্টা যত্ন করিলে হয় ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাও প্রচুর সময়সাপেক্ষ।

কোন গাছেরই সমস্ত শাখায় কলম প্রস্তুত হয় না। এ জন্য উপযুক্ত শাখা নির্ব্বাচনের জ্ঞান থাকা চাই। আবার নির্ব্বাচিত শাখার যে কোন স্থানে কলম বাঁধিলে অনেক সময় ব্যর্থমনোরথ হইতে হয়। সতেজ বৃক্ষের একটী অর্দ্ধপক্ক নাতিস্থূল শাখা প্রথমে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শাখাটী যেন কীটদষ্ট, রোগাক্রান্ত বা বেশী সরু না হয়। শাখাটীর গতি ঊর্দ্ধে, কি অধোভাগে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঊর্দ্ধে গতিশীল শাখায় কলম বাঁধিলে তাহা বিশেষ উৎকৃষ্ট হয় না। এই কলমে বিলম্বে ফলন আরম্ভ হয়। সেই জন্য যে শাখা গুলির গতি নিম্ন দিকে, সেই শাখাই উত্তম। ইহার মধ্যে আবার উক্ত শাখা বা প্রশাখা যদি মূল কাণ্ড হইতে উত্থিত হয়, তবে সর্ব্বোত্তম। এরূপ শাখায় যেন নূতন কচি পাতা না থাকে। এইরূপে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করতঃ শেষে নির্ব্বাচিত শাখার উপরাংশে গুটী বাঁধিতে হইবে। নিম্নাংশে অর্থাৎ শাখা বা প্রশাখার উৎপত্তিস্থানের নিকটে গুটী বাঁধিলে

উদ্দেশ্য প্রায়ই বিফল হয়। কারণ, নূতন মূলের এমন ক্ষমতা প্রায়শঃই থাকে না যে, উহারা সম্পূর্ণ শাখাটাকে পোষণ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। কাজেই রসাভাবে সম্পূর্ণ কলমটী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া, শেষে একেবারে শুকাইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যতটুকু স্থান কলম করিবার জন্য কাটা হইবে, সেই স্থানের নিম্নে ও উপরিভাগে যেন পর্ব্ব বা গ্রন্থি থাকে। পর্ব্ব বা গ্রন্থির উপর লক্ষ্য না রাখিয়া, যে কোন স্থানে কলম বাঁধিলে কলমে নূতন শাখা-পল্লবের সৃষ্টি হইতে পারে না—ফলে সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইবে।

এক্ষণে যেরূপে কলম বাঁধিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। নির্ব্বাচিত শাখা বা প্রশাখার দুটী গ্রন্থির মধ্যবর্ত্তী আনুমানিক দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থানের ছাল খুব সাবধানে তীক্ষ্ণ ছুরী দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ছাল তুলিবার সময় যাহাতে নিরূপিত সীমার বহির্ভাগের ছাল উঠিয়া না যায়, সে জন্য উপরিভাগে ও নিম্নদেশে ডালটীকে বেষ্টন করিয়া দুটী গোলাকার দাগ কাটিয়া লইতে হইবে। ইহাতে উপরে বা নীচে, কোন দিকেই অনাবশ্যকভাবে ছাল উঠিতে পারিবে না এবং অযথা গ্রন্থি নষ্ট হইবার আশঙ্কাও থাকিবে না। ছাল তোলা শেষ হইলে উহার উপরে শাখার স্থূলতা অনুযায়ী পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দিয়া গুল বাঁধিয়া দিবেন। ডাল যদি সরু হয়, তবে ছোট গুল এবং ডালখানা মোটা হইলে অপেক্ষাকৃত মোটা গুল বাঁধিতে হইবে। গুল কলম বাঁধিতে দোআঁশ মাটিই উৎকৃষ্ট।

বেলে মাটি দিয়া উহা আদৌ বাঁধা চলে না। এই বেলে মাটির সঙ্গে পুকুরের পাঁক মাটি ও গোবর মিশাইয়া, ভালরূপে ছানিয়া লাগাইলেই চলিবে। এঁটেল মাটিতে গুল বাঁধা যায় সত্য, কিন্তু এঁটেলে মাটির গুল এত দৃঢ় হইয়া পড়ে যে, নবোদ্গত কোমল মূলগুলি উহা অনেক সময় ভেদ করিতে পারে না বা কোন কোন ক্ষেত্রে পারিলেও তজ্জন্য উহাদিগকে খুব বেগ পাইতে হয়। যাহা হউক, যদি এঁটেল মাটি দ্বারাই গুল বাঁধিতে হয়, তবে সর্ব্বদাই উহাকে ভিজা রাখিতে হইবে। তাহা হইলে উহা ততটা আঁট বাঁধিয়া শিকড় প্রবেশের পথ দুর্গম করিয়া তুলিতে পারিবে না। অনেকে এই সময়ে নানা-রূপ সার মিশ্রিত করিয়া, বেশ সারবান্ মৃত্তিকা দিয়া গুল বাঁধিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সময়ে উক্ত সারের কোনই প্রয়োজন হয় না। কলম উহা হইতে কোনরূপ সাহায্যই গ্রহণ করে না। কাজেই উহা অনাবশ্যক আড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভালরূপে মাটি দেওয়া হইলে পর উহার উপরিভাগে নারিকেলের ছিবড়া বা চট দিয়া বেশ ভালরূপে মুড়িয়া, শক্ত কলার ছোটা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। নারিকেলের ছিবড়া বা পাহাড়ী শৈবাল অর্থাৎ মস্ দিয়া ঢাকিয়া দিলেই ভাল হয়। উহাতে একবার জল দিলে অনেকক্ষণ ভিজা থাকে এবং মাটিও সরস থাকে। তবে সকলের পক্ষে মস্ সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। তাঁহারা ছেঁড়া চট বা নারিকেলের ছিবড়াই ব্যবহার

করিবেন। গুলটী সর্ব্বক্ষণ সরস রাখিবার জন্য উপরে মৃন্ময় ঘট ছিদ্র করিয়া, ছিদ্র-পথে কতকগুলি পাট ভরিয়া দিয়া, পাত্রটী জলপূর্ণ করতঃ গুলের উপরে ঝুলাইয়া রাখিলেই ফোঁটা ফোঁটা জল উহার উপরে পড়িবে। ইহাতে কলমে কখনও রসাভাব ঘটিবে না। অবশ্য বর্ষা হইলে আর জল দিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কয়েক দিন যদি বর্ষাপাত বন্ধ থাকে, তবে গুলের রসাভাব নিবারণের জন্য যে কোন উপায়ে হউক, জল দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এক মাস দেড় মাসের ভিতরেই কলমে শিকড় জন্মে। গাছ ভেদে প্রথম বার শিকড় জন্মিলে পর উহার উপরে আর এক দফা মস্ বা নারিকেলের ছিবড়া দিয়া ঢাকা দিলে ভাল হয়। যে গাছের কাষ্ঠাংশ কঠিন, তাহাতেই এরূপ করা বিধেয়। আর যদি কাষ্ঠাংশ কোমল হয়, তবে ইহা নিষ্প্রয়োজন।

শিকড় উদ্গত হইলে সপ্তাহখানেক পরে কলমটীকে কাটিয়া আনিয়া, ছাপোরে পালন করিতে হইবে। ইচ্ছা হইলে টবেও রাখিয়া পালন করা চলে। গুল কলম কাটা হইলে পর উহার পাতাগুলি প্রায়ই কম-বেশী ঝরিয়া গিয়া থাকে। কিন্তু পরে আবার নূতন শাখা-পল্লব উদ্গত হয়।

———

দাবা কলম

বর্ষাকাল এই কলম প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট সময়। গুল কলমের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। গাছের নির্ব্বাচিত শাখায় মাটির গুল বাঁধিয়া গুল কলম প্রস্তুত হয়, আর এই কলম প্রস্তুত করিতে শাখাটীকে মাটির ভিতরে দাবাইয়া রাখিতে হয়।

যে চারাটী হইতে দাবা কলম প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই চারার নির্ব্বাচিত শাখাটী নমনীয় অর্থাৎ শাখা সহজেই নত করিয়া মাটির উপরে শোয়াইয়া দেওয়া যায়—এরূপ হওয়া দরকার। যদি সেরূপ নমনীয় ভাল শাখা না পাওয়া যায়, তবে বালতী বা টবে মাটি পূর্ণ করিয়া শাখাটীর নিকটে এরূপ ভাবে ঝুলাইয়া রাখিবেন, যেন কলম করিবার জন্য নির্ব্বাচিত শাখার নিরূপিত অংশটী অনায়াসে মৃত্তিকার ভিতরে দাবাইয়া রাখা যায়।

যে শাখাটী হইতে কলম প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার যে

অংশটী মৃত্তিকার ভিতরে দাবাইয়া রাখা যাইবে, সেই অংশের কতটুকু ছাল ঠিক গুল কলমের ন্যায় তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শেষে উক্ত অংশ মাটির ভিতরে চাপা দিয়া রাখিবেন। শাখাটী যদি কঠিন হয়, তবে হয় ত চাপা রাখা দুষ্কর হইবে। এ জন্য উহার উপরিভাগে ইষ্টক বা অন্য কিছু দিয়া চাপা দিয়া রাখিবেন। কিন্তু ইষ্টকটীর সম্পূর্ণ ভার কলমের উপর না থাকে, এ জন্য কোনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ইষ্টকখানিকে ঈষৎ আল্‌গা ভাবে উপরে ঝুলাইয়া রাখিবেন। নতুবা ইষ্টকের চাপে কলমে মূল উদ্গমনে বাধা জন্মিতে পারে।

কলমে রসাভাব লক্ষ্য করিলে গুল কলমের মত উহার উপরেও ঝারা দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা হইলে আর কলমে রসাভাব ঘটিবে না।

সাধারণতঃ এক মাস দেড় মাসের ভিতরেই কলমে শিকড় জন্মে। তাহার পর আরও ১৫।২০ দিন অপেক্ষা করিয়া শেষে কলমটীকে মূল গাছ হইতে কাটিয়া লইয়া, হাপোরে বসাইয়া দিবেন।

ডাল কলম।
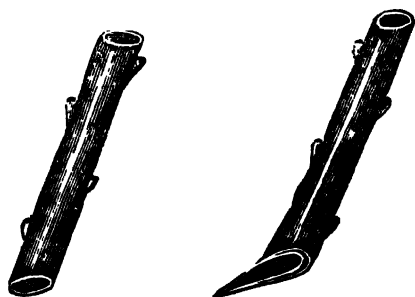
কলম প্রস্তুত প্রণালীর ভিতরে ডাল কলমই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। তবে সমস্ত গাছেই ডাল কলম হয় না। যে সমস্ত গাছের কাণ্ড বেশ কঠিন এবং রস ঘন, তাহাদের শাখা-প্রশাখায় ডাল কলম করা যায় না। অপেক্ষাকৃত কোমল ও তরল রসবিশিষ্ট গাছের শাখা-প্রশাখায় উত্তম ডাল কলম প্রস্তুত হয়।

উপযুক্ত গাছ হইতে নির্ব্বাচিত শাখা সংগ্রহ করিয়া, উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবেন। প্রত্যেক খণ্ড অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ থাকিবে। প্রত্যেক খণ্ডের উপরিভাগে এবং নিম্নদেশে একটী করিয়া চোক্ থাকা আবশ্যক। চোক না থাকিলে কলম ফুটিবে না। সুতরাং শাখাটীকে খণ্ড খণ্ড করিবার সময় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শাখাটীর প্রত্যেক খণ্ডের উভয় দিক্ই কিঞ্চিৎ হেলাইয়া কাটিতে হইবে। এই সমস্ত খণ্ডে পাতা আদৌ না থাকা যেরূপ অন্যায়, অধিক

পত্র থাকাও সেইরূপ হানিকর। প্রত্যেক খণ্ডে কিছু কিছু পাতা রাখিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক পত্রের অর্দ্ধাংশ ছাঁটিয়া দিবেন। উপরিভাগেই এইরূপ কিছু অর্দ্ধ কর্ত্তিত পাতা রাখিয়া দিবেন। এই ভাবে শাখা-খণ্ডগুলিকে প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হাপোরে একটু হেলাইয়া বসাইয়া দিবেন। এইরূপে বাঁকা ভাবে বসাইলে কলমে শীঘ্র শিকড় উৎপন্ন হয়।

কাণ্ড বা শাখা-সংলগ্ন কোন ডালকে মূল শাখা বা কাণ্ডের কিঞ্চিৎ ছালের সহিত হেলাইয়া কাটিয়া আনিয়া হাপোরে বসাইলেও ডাল কলম প্রস্তুত হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও ডাল-খানির অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ রাখিয়া, উপরিভাগের বাকী অংশ কাটিয়া ফেলিবেন। রোপিত অংশটীতে ২।১টী চোক অর্থাৎ গ্রন্থি এবং ২।৪টী অর্দ্ধছিন্ন পত্র থাকা আবশ্যক।

ডাল কলম বসাইবার জন্য নিম্নোক্ত উপায়ে হাপোর প্রস্তুত করিলে বিশেষ ভাল হয়। কলমের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্থানের সীমা স্থির করিয়া কোন ছায়াবিরল স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিবেন। নিকটবর্ত্তী কোন গাছের শাখা-প্রশাখা উহার উপরে যেন না থাকে। উপরে কোন বৃক্ষশাখা থাকিলে বৃষ্টির সময়ে উহা হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িয়া কলমের অনিষ্ট করিবে। যাহা হউক, হাপোরের জন্য নিরূ-পিত জমির চারি দিক্ ইট দিয়া গাঁথিয়া দিলে ভাল হয়। শেষে ঐ সীমাবদ্ধ স্থানের নিম্নস্তর ইটপাটকেল, ঝামা প্রভৃতি দিয়া ৮।৯ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু করিয়া ভরাট করিবেন। তার

উপরে ৪।৫ ইঞ্চি পুরু করিয়া কিছু মাটি এবং শেষে ৯।১০ ইঞ্চি পুরু করিয়া অতি সূক্ষ্ম বালি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন। ইহাতে চৌকায় কখনও রসাধিক্য বা রসাভাব ঘটিবে না।

এক্ষণে হাপোরে রোপিত কলমগুলিকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য দিনের বেলায় প্রয়োজন মত আচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিবেন। রাত্রিকালে উহা সরাইয়া ফেলিবেন। হাপোরে বৃষ্টির ধারা পড়িলে চারাগুলির মূলদেশ আহত হইতে পারে, এই জন্য বৃষ্টির সময় উহাদিগকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কলমে শিকড় বাহির হইলে হাপোর হইতে তুলিয়া অন্য হাপোরে কিছু দিন প্রতিপালন করতঃ শেষে স্থায়িভাবে জমিতে লাগাইয়া দিতে হয়।

চোঙ কলম।

মাঘ ফাল্গুন মাস চোঙ কলম করিবার প্রশস্ত কাল। বিশেষতঃ কুল গাছের কলম করিতে ফাল্গুন মাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মাঘ মাসে গাছের কুল নিঃশেষিত হইলে পর গাছগুলিকে ছাঁটিয়া দিতে হয়। পরে ফাল্গুন মাসে আবার উহাতে নূতন শাখা-পল্লবের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই নূতন সৃষ্টির সময়ে কুলের শাখায় চোঙ বসাইয়া কলম প্রস্তুত করিতে গেলে শীঘ্র সুন্দর কলম প্রস্তুত হইতে পারে।

চোক্ কলম ও চোঙ কলম করিবার রীতি প্রায় এক

রকমই। চোক কলমে চোক তুলিয়া বসাইয়া দিতে হয়, আর চোঙ কলমে শাখার উপরের ছালটী চোঙের আকারে তুলিয়া অন্য শাখায় বা চারার মাথায় বসাইয়া দিতে হয়। অন্যান্য পদ্ধতি একরূপই।

যদি মূল চারাটীর কাণ্ড হইতে চোঙ তুলিতে হয়, তবে উহার মস্তক একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া, ২।৩ ইঞ্চি নিম্নে ছুরি দিয়া একটী গোলাকার বেষ্টনী চিহ্ন দিয়া, বেশ সাবধানে ছাল-খানা তুলিয়া আনিবেন। তখন ঐ ছালখানা ঠিক একটী চোঙের মত হইবে। ইতিমধ্যে যে গাছের যে শাখায় ঐ চোঙটী বসাইতে হইবে, সেই শাখাটীর অগ্রভাগ কাটিয়া, ঐ চোঙের পরিমাণ স্থানের ছাল সাবধানে তুলিয়া, চোঙটী ঐ স্থানে বসাইয়া দিবেন। যে গাছটী হইতে চোঙ আনীত হইয়াছে, কলমের ফল সেই গাছের মতই হইবে। কোন ভাল জাতীয় গাছের শাখা হইতে ঐরূপ চোঙ তুলিয়া আনিয়া, কোন চারার মাথা কাটিয়া ছাল তুলিয়া, ঐ স্থানে চোঙটী বসাইয়া দিলে, ঐ চারায় কালে যে ফল হইবে, তাহা উক্ত গাছের মতই হইবে। চোঙটী বসাইবার সময় বা তুলিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন ইহা কোনরূপে না ফাটিয়া যায়। ঐ চোঙে যেন ২।১টী চোক্ থাকে। চোক না থাকিলে শাখা পল্লবের সৃষ্টি হইবে না। সর্ব্বপ্রকার কলম প্রস্তুতের সময় চোকের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেক সময় কোন কোন গাছের শাখা হইতে যদি চোঙের

মত করিয়া ছাল তোলা দুষ্কর হইয়া পড়ে, তবে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে একটী সরু দাগ কাটিয়া, ছালটীকে আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া লইবেন। তৎপর উহা অন্য শাখায় বা চারার মাথায় পরাইয়া দিতে হইবে। যদি উক্ত চোঙ অপেক্ষা কাণ্ড বা শাখা সরু হয়, তবে চোঙের ছালখানি দিয়া উহাকে সম্পূর্ণ জড়াইয়া দিয়া, যে অংশ-টুকু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও উপর দিয়া জড়াইয়া দিবেন। যদি কাণ্ড বা শাখা সরু না হইয়া চোঙ অপেক্ষা মোটা হয়, তবে চোঙের ছালখানা যতদূর বেষ্টন করিতে পারে, তাহা নির্ণয় করিয়া মাত্র সেই স্থানটুকুর ছাল তুলিয়া ফেলিবেন—বাকী অংশের ছাল তুলিবার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত চোঙের আকারে অক্ষত ভাবে যে ছাল তোলা হয়, তাহার বেলাতেও কাণ্ডের বা শাখার এইরূপ ছোট বড় ভাব দেখিলে চোঙটী লম্বাভাবে চিরিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কলম বাঁধিতে হয়। সব সময়ে চোঙের অনুপাতে সরু বা স্থূল কাণ্ড বা শাখা পাওয়া যায় না। সেই জন্যই এই নিয়ম অনুসারে কলম প্রস্তুত করা বিধেয়।

এই ভাবে যথারীতি চোঙ বসান হইলে নরম সূতা বা কলার ছোটা দিয়া চোঙটীকে ভালরূপে বাঁধিয়া দিবেন। ইহা বাঁধি-বার বা রক্ষা করিবার প্রণালী চোক্ কলমের মতই। বাহুল্য ভয়ে এ স্থানে আর স্বতন্ত্রভাবে লেখা হইল না।

ছাঁটাই পদ্ধতি।

গাছ ছাঁটাই পদ্ধতি কখন্ কোন্ দেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহার মধ্যে প্রকৃতির যে মঙ্গলময় গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই ইঙ্গিতের সন্ধান কাহার কোন্ গবেষণা-প্রসূত, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। এ বিষয়ে বিলাতের জনৈক উদ্যানক একটী সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন। এই ছাঁটাই পদ্ধতির সঙ্গে ইহার খুব নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়াই এখানে সেই গল্পটী উদ্ধৃত করা বাহুল্য বোধ করিলাম না।

গল্পটী হইতেছে এই,—"একটী গর্দ্দভ দৈবাৎ কোন গর্ত্তে পড়িয়া যায়। সে বহু চেষ্টা করিয়াও গর্ত্ত হইতে উঠিতে পারিল না। সেই গর্ত্তের নিকটে একটী আঙ্গুরগাছ ছিল। উহার অধিকাংশ লতা ঐ গর্ত্তের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। গর্দ্দভটী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ঐ লতাগুলি মুড়াইয়া খাইয়া ফেলিল। পর বৎসর দেখা গেল যে, ঐ গাছটী নূতন শাখা-পল্লবে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সুপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়াছে। গাছটীর অধিকারী এই ব্যাপার দেখিয়া খুব বিস্মিত হন এবং তিনি তখন হইতে ফলকর সমস্ত গাছই ছাঁটিতে আরম্ভ করেন। এই ছাঁটাইর ফলে সমস্ত

গাছেই প্রচুর উৎকৃষ্ট ফলন দেখা যায়। ক্রমে এই প্রথা জনসমাজে প্রচলিত হইয়া পড়ে।”

উক্ত গল্পটীর মূলে কোন সত্য নিহিত থাকুক বা নাই থাকুক, ছাঁটাই দ্বারা যে অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

গো মহিষাদি ইতর প্রাণীমাত্রেই প্রকৃতির স্বেচ্ছাকৃত দানেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু মানবের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা এতই প্রবল যে, প্রকৃতি-দত্ত সমস্ত দানকে তাহারা সঠিকভাবে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। প্রকৃতি ধান্য দেয়, মানব সেই ধান্য হইতে চাউল বাহির করিয়া, অগ্নিস্থালে সিদ্ধ করতঃ অন্নে পরিণত করিয়া গ্রহণ করে। মানবের এইরূপ উন্নত প্রণালীতে ব্যবহারস্পৃহার মূলে প্রকৃতির নিকট হইতে উন্নততর প্রণালীতে দান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষার ফলে গবেষণা এবং গবেষণার ফলেই অভিনব সৃষ্টির অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হয়। গাছ ছাঁটাই পদ্ধতিও এইরূপ গবেষণার ফল।

যে কোন কাজই করা হউক না কেন, সেই কাজের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হইলে কি ভাবে কি উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে তদ্দারা আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তদ্দারা অহিতও সাধিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক সময় আমরা অপরের অনুকরণ করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যহীন অনেক কাজ করিয়া

বসি। 'অমুকে ঐরূপ করিয়াছে, সুতরাং আমারও করা উচিত'—এই মনোবৃত্তি অন্ধের মত পথ চলা ছাড়া আর কিছুই নহে। গাছ ছাঁটিলে ফল ভাল হয়, সুতরাং আমার গাছ আমি ছাঁটিব। কিন্তু কি ভাবে কখন্ ছাঁটিলে সুফল পাওয়া যাইবে, তাহা জানা আবশ্যক। এই জ্ঞান না থাকার ফলে অনেকে ছাঁটিতে গিয়া গাছটীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন। সুফল দূরের কথা, পূর্ব্বে যে অল্প-বিস্তর ফল পাওয়া যাইত, তাহাও পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় গাছ আদৌ না ছাঁটাই ভাল। তাহাতে নূতন কিছু উপকার না হইলেও অপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

গাছ ছাঁটাই দ্বারা দুটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ অনাবশ্যক শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদির আড়ম্বরের খরচ যোগান হইতে গাছ রক্ষা পায়। দ্বিতীয়তঃ মূল দ্বারা আহরিত রস প্রয়োজনীয় অল্পসংখ্যক শাখা-প্রশাখার পরিপোষণে ব্যয়িত হইয়া, অবশিষ্টাংশ ফল ফুলের পুষ্টির জন্য সঞ্চিত থাকিতে পারে। ফল প্রসব শেষ হইলে পর গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যেও আবার শীতকালই ছাঁটিবার প্রকৃষ্ট সময়। ফল প্রসবের পর গাছগুলি স্বভাবতঃই একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন মূল দ্বারা আহরিত রসে সমস্ত অঙ্গের নিয়মিত পুষ্টি সাধন করিয়া, উক্ত দুর্ব্বলতা দূর করা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। এই জন্য এই সময় ইহাকে অল্প-বিস্তর ছাঁটিয়া দিলে ইহার ভার অনেকটা লাঘব হয় এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে দেহ পোষণ করিয়া

পরবর্ত্তী প্রসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শীতকাল উদ্ভিদজগতের রাত্রিকাল। অবশ্য রাত্রিকালে যে সকলেই বিশ্রাম করে, তাহা নহে। চলৎশক্তি-সম্পন্ন জীবজগতেও বহু জীব রাত্রিকালে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত। তদ্রূপ গাছবিশেষের পক্ষেও শীতকাল বিশেষ মরশুমের মধ্যে গণ্য। যাহা হউক, শীতকাল বিশ্রামকাল বলিয়া গাছগুলির ভিতরে একটা স্বাভাবিক জড়তা আসে এবং এই সময় ইহারা আহারাদিতে বিরত থাকে। পূর্ব্বসঞ্চিত খাদ্য দ্বারাই এই সময় নিয়মিত পোষণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই সময় যদি অনাবশ্যক শাখা-প্রশাখা কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার পরিপোষণ ক্রিয়া আরও ভাল ভাবে চলে এই জড়তার আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে অঙ্গচ্ছেদের দরুণ তাহার চমক অপেক্ষাকৃত কম লাগিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণেই ফল প্রসবের পর শীতের প্রারম্ভে গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে গাছবিশেষে এ নিয়মের অল্প-বিস্তর তারতম্য আছে।

শুধু শাখা-প্রশাখা ছাঁটিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। উহা দ্বারা গাছের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। নূতন শাখা-পল্লবে গাছগুলি শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং গাছের বিশৃঙ্খল আকার শৃঙ্খলার ভিতরে থাকিয়া সুন্দররূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আশানুরূপ প্রচুর ফল লাভ করিতে হইলে শিকড়গুলিও ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছ ফলবান্ হইবার মাস দুই পূর্ব্বে গাছের গোড়া একটু গভীর ও বিস্তৃত ভাবে খুঁড়িয়া দিতে হয়।

তখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি শিকড় আপনা হইতেই কাটিয়া যায়। তার পর মোটা মোটা কতকগুলি শিকড় সামান্য একটু করিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। উপরিভাগে যে সমস্ত শিকড় থাকে, সেগুলি গাছের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া থাকে। ফলোৎপাদন বিষয়ে গাছগুলি আংশিক ভাবে ইহাদের মুখাপেক্ষী। এগুলির গতি যদি পার্শ্বদিকে ধাবিত না হইয়া নিম্নাভিমুখে পরিচালিত হয়, তবে ফলোৎপাদনে বিশেষ বাধা জন্মে। এই জন্যই গাছ ফলোম্মুখী হইবার পূর্ব্বে ইহাদের পার্শ্বগতি অব্যাহত রাখিবার জন্য ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই ছাঁটাইর ফলে গাছের বৃদ্ধি শাখা-প্রশাখার দিকে না যাইয়া ফল প্রসবের দিকে চালিত হয়। সুতরাং বৃক্ষকে ফলশালী করিতে হইলে শিকড় ও শাখা-প্রশাখা, উভয়ই ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছের শাখা-প্রশাখা এরূপভাবে ছাঁটিতে হইবে, যেন গাছটী অতিরিক্ত ঘন বা অতিরিক্ত পাতলা না হয়। প্রথমতঃ পোকাধরা, শুষ্ক বা রুগ্ন শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদি ছাঁটিয়া বাদ দিতে হয়। তার পর অন্যান্য শাখার শেষ ভাগ ছাঁটিতে হইবে। ডালপালাগুলির প্রান্তভাগ শুধু না ছাঁটিয়া, অর্দ্ধ-পরিপক্ক স্থান পর্য্যন্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া দিতে হয়। গাছটীকে আপনি যেরূপ আকার দিতে ইচ্ছা করেন, তদনুযায়ী বিবেচনা করিয়া ছাঁটিবেন। ছাঁটিবার সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন গাছের সর্ব্বত্র আলো ও বাতাস অবাধে চলাচল করিতে

পারে। এই আলো বাতাস চলাচলের তারতম্য অনুসারে একই গাছের বিভিন্ন অংশের ফলের মধ্যে আকারের ও গুণের ইতরবিশেষ দেখা যায়। পর্য্যাপ্ত সূর্য্যালোক না পাইলে শাখাস্থিত ফলোন্মুখী চোকগুলি বিকশিত হইতে পারে না। অনেক সময় মুকুলিত হইয়াও ঝরিয়া পড়ে।

গাছের ডালপালা এবং শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়ায় গাছের কাণ্ড বা মূল বেশী বাড়িতে পারে না, গাছের বৃদ্ধির গতি শাখা-প্রশাখার দিকেই অধিক ধাবিত হয় এবং গাছ দীর্ঘাকৃতির না হইয়া বেশ ঝাড়াল হইয়া উঠে। গাছ যত ঝাড়াল হইবে, ফলও তত বেশী পাওয়া যাইবে।

আনারস। (Pine apple)

পৃথিবীতে যত রকমের শ্রেষ্ঠ উপাদেয় রসাল ফল আছে, আনারস তন্মধ্যে অন্যতম। স্বাদে, গন্ধে ইহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুপক্ক আনারসের সৌরভে প্রাণ মন স্বভাবতঃই পুলকিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে ইহা অযত্নেও প্রচুর ফলে বলিয়াই লোকে ইহাকে ততটা আদরের চক্ষে দেখে না। এই হতাদরের জন্য আনারসের অমৃততুল্য স্বাদে আমাদের দেশবাসী বঞ্চিত। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিল্লাতেই বাড়ীর আনাচে কোনাচে, অন্ধকারময় স্যাঁতসেঁতে স্থানে, বড় বড় গাছের আওতায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং ফলেও প্রচুর। কিন্তু ইহাদের স্বাদ প্রকৃত উৎকৃষ্ট আনারসের স্বাদের চাইতে অনেক হীন। যেমন মানবের দেহের ও মনের উৎকর্ষতা নির্ভর করে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর—উদ্ভিদেরও তদ্রূপ। অস্বাস্থ্যকর কুস্থানে বাস, অখাদ্য ভোজন ইত্যাদিতে অতি সুপুরুষ ও সুচরিত্র লোকের যেরূপ চেহারা ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, সেইরূপ প্রয়োজনীয় আবহাওয়া বর্জ্জিত স্থানে অবস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব উদ্ভিদের প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলে। এই জন্যই আমাদের দেশের অযত্ন-সম্ভূত আনারস এত কদর্য্য হইয়া থাকে এবং সিঙ্গাপুর, সিংহল প্রভৃতি দেশের

এবং বাঙ্গালার বা ভারতেরও স্থানবিশেষের—যত্নে বৰ্দ্ধিত আনারস স্বাদে গন্ধে অনুপম হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যাঁহারা আনারসকে উদ্যানে স্থান দেন, তাঁহারা প্রায়ই অপর কোন বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াতলে এবং বাগানের অব্যবহার্য্য কদর্য্য স্থানে উহাদিগকে রোপণ করিয়া থাকেন। উহাদের বিধিবদ্ধ ভাবে রোপণ করিবার যে একটা প্রণালী আছে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য করেন না। ইহার ফলে গাছগুলির নিম্নদেশ গভীর জঙ্গলে এবং সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাসভূমিতে পর্য্যবসিত হয়। আনারসের রোপণ কার্য্য শেষ হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। উহার যে রীতিমত পাট আছে, তাহা আমরা গণ্যই করি না। সেই জন্যই উহা হইতে অতি নিকৃষ্ট ধরণের ফল পাইয়া থাকি।

আনারস ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ বটে—কিন্তু তাহার জীবন ধারণের জন্য এবং উৎকৃষ্ট ফল প্রসবের জন্য আলো ও বাতাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বড় গাছের আওতায় থাকিয়া উহারা তাহা প্রয়োজনানুরূপ পায় না। তাহা ছাড়া ইহারা যে গাছের আওতায় থাকে, সেই গাছেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। আনারসগাছ ভূমি হইতে খুব বেশী পরিমাণে রস গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে আশ্রয়দায়ক বৃক্ষে শীঘ্রই রসাভাব হইয়া পড়ে এবং তাহাতে উক্ত বৃক্ষেও আশানুরূপ ফলন হয় না।

অমৃত তুল্য রসাল ফল হিসাবে আনারস ভোগ করিতে

হইলে অথবা ব্যবসায় হিসাবে ইহার চাষ করিয়া লাভবান্ হইতে হইলে পৃথক্ভাবে যত্নের সহিত ইহার আবাদ করা আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহা জন্মে না বা স্থানবিশেষে জন্মিলেও ভালরূপে ফল প্রদান করে না। যে সমস্ত দেশে সম্বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২ ইঃ হইতে ১৮ ইঃ, সেই সমস্ত দেশে আনারসের উৎকৃষ্ট আবাদ হয়।

আনারসের জমি সমতল অথচ গড়ান প্রকৃতির হইলে ভাল হয়। এই আবাদের জন্য জমি অত্যন্ত সরস হওয়া দরকার বটে; তাই বলিয়া যে জমিতে জল দাঁড়ায়, সেই জমি মোটেই উপযোগী নহে। ইহার গোড়ায় জল জমিলে গোড়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। বর্ষা যতই প্রবল হউক না কেন, জমিতে জল দাঁড়াইতে না পারিলে আনারসের কোনই ক্ষতি হইবে না। জমি যদি তাদৃশ গড়ান প্রকৃতির না হয়, তবে জল নিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। জল যেন পড়িবা মাত্রই বাহির হইয়া যাইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

আনারস গাছ স্বভাবতই একটু ছায়াপ্রিয়। তজ্জন্য উহাদিগকে কোন গাছের আওতায় স্থান না দিয়া, জমির পশ্চিম সীমায় কতকগুলি রেইনট্রী বা দ্রুত বর্দ্ধনশীল গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসাইয়া দিতে হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া, প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখিয়া, কিছু কিছু জিলাবী গাছ মাঝে মাঝে রোপণ করিয়া যাইতে পারেন। এগুলি ছোট গাছ, ইহাদের

সামান্য আওতায় চারাগুলি ছায়াও পায় অথচ মুক্ত আলো বাতাসের কোন বিঘ্ন জন্মে না।

আনারসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইলে প্রথমেই উক্ত নিরূপিত জমির মৃত্তিকার পরিচয় লইতে হইবে। জমির মাটি যদি এঁটেল প্রকৃতির হয়, তবে তাহাতে আনারস ভাল হইবে না। কারণ, এঁটেল মাটির কঠিন স্তর ভেদ করা উহার সূক্ষ্ম মূলের পক্ষে খুবই কষ্টকর। উহার শিকড়গুলি আশানুরূপ বাড়িতে পারিবে না। তাহাতে দেহ পরিপুষ্টির ব্যাঘাত জন্মিবে। কারণ, স্বেচ্ছামত বৃদ্ধিতে বাধা জন্মিলে শিকড় রস আহরণে অক্ষম হইয়া পড়িবে। এই জন্য উক্ত মাটির দোষ সংশোধন করিতে পরিমাণ মত বালি, কিছু চূণ এবং কাঠের ছাই মিশ্রিত করিয়া উহার স্বাভাবিক কঠিনতা দূর করিতে হইবে। ঐগুলি মিশ্রণের ফলে মাটি হালকা হইবে এবং মাটির ধারকতা গুণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং শিকড়গুলির ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধিতে বাধা জন্মিবে না। জমির মৃত্তিকা যদি দোআঁশ প্রকৃতির এবং সরস ও উর্ব্বরা হয়, তবে তাহা আনারস আবাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। মাটির দোষে চারার প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। নিরূপিত স্থানের মৃত্তিকায় যদি চূণের পরিমাণ বেশী থাকে, তবে চারার পাতাগুলি হলদে রংএর হইয়া যায়, ফল বিশেষ বড় হয় না এবং ফলে মিষ্টত্বও কম জন্মে ; এমন কি, অনেক সময় ফল টকও হইয়া যায়। যদি জমি উক্ত প্রকৃতির হয়, তবে সামান্য

পরিমাণে সালফেট অব আয়রণ জলে মিশাইয়া, প্রতি মাসে সমস্ত জমিতে ছিটাইয়া দিলে উহা সংশোধিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া সবুজ সার (ধঞ্চে, অড়হর, মটর ইত্যাদি বপন করিয়া একটু বড় হইলে চাষ দিয়া, ঐগুলিকে মাটির সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হইবে) ব্যবহার করিলেও এই দোষ সংশোধিত হইয়া জমির উর্ব্বরতা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

অনেকের ধারণা যে, আনারসের জন্য চাষের বিশেষ প্রয়োজন নাই। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া চারা বসাইলেই হইল। কিন্তু ইহার পক্ষেও সুচাষ বিশেষ প্রয়োজন। চাষের ফলে মৃত্তিকার আভ্যন্তরীণ দোষ সংশোধিত হয়, কীট পতঙ্গের উপদ্রব হ্রাস পায় এবং মাটি প্রয়োজনানুরূপ হালকা হয়। মৃত্তিকার নিম্নদেশে অনেক আগাছা এবং কীট পতঙ্গের আবাস থাকে। জমিতে বার বার গভীর ভাবে চাষ দিয়া মাটি ওলট পালট করিয়া আগাছাগুলি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। তার পর জমিতে দুই হাত অন্তর আইল বাঁধিতে হইবে। জমির গড়ান ভাবের অনুকূলে এই আইল বাঁধিয়া যাইতে হইবে। যে দিকে জমি ক্রমশঃ ঢালু হইবে, সেই দিক হইতে ক্রমোচ্চ দিকে লাইনবন্দী করিয়া আইল বাঁধিতে হইবে। অন্যথায় বিপরীত ভাবে বাঁধিতে গেলে জল আটকাইয়া যাইবে। আইল বাঁধা হইলে মধ্যবর্ত্তী জুলিপথে এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া চারাগুলি বসাইতে হয়। চারা রোপণ করিয়া, ঐ গর্ত্তের মাটির সঙ্গে সম-পরিমাণ গোবরসার মিশ্রিত করতঃ সেই

মাটি দ্বারা গোড়া চাপা দিবেন। চারাগুলি একটু একটু বড় হইলে তখন ঐ আইল ভাঙ্গিয়া, ক্রমে গোড়া উঁচু করিয়া দিবেন। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত জুলিপথ আইলে এবং আইল জুলিপথে পরিণত হইবে। অবশ্য আনারস-ক্ষেত্রে আইল না বাঁধিলেও চলিতে পারে। তবে আইল বাঁধিলে পরিচর্য্যার সুবিধা হইয়া থাকে এবং গাছগুলির গোড়া রৌদ্রের হাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পায়। চারাগুলি ৩।৪ ফুট অন্তর বসাইয়া যাইতে হয়।

ফিজি দ্বীপে অভিনব প্রণালীতে ইহার চায হইয়া থাকে। তথাকার কৃষকেরা অগ্রভাগ সরু—এরূপ এক প্রকার লাঠী দ্বারা খুঁচিয়া খুঁচিয়া সমস্ত জমিটির মাটি হালকা করিয়া ফেলে। শেষে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে ঐ লাঠীর সাহায্যেই গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে চারাগুলি বসাইয়া যায়। যে দেশে যে ভাবেই চাষ হউক না কেন, ভাল আনারস পাইতে হইলে সুচাষের যে একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বীজ হইতেও আনারসের গাছ জন্মান যায়। কিন্তু সে বহু সময়সাপেক্ষ এবং তাহাতে যে ফল হইবেই, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। তার পর ফল যদি দৈবাৎ ধরেও, তাহাও অতি কদর্য্য হইয়া থাকে। এই জন্য বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিবার প্রথা নাই। কলাগাছের মত আনারস গাছের ফেঁকড়ী জন্মে। ঐ ফেঁকড়ী হইতেই চারা উৎপন্ন হয়। আনারস বৎসরে মাত্র একবার একটী ফলধারণ করে। ফল

কাটিয়া লইবার সময় মূল গাছটীকে তুলিয়া ফেলিয়া, ঐ স্থানে একটী ফেঁকড়ী লাগাইয়া দিতে হয়। মূল গাছের সঙ্গে যদি কতকগুলি চারা আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে ১টী মাত্র রাখিয়া, অবশিষ্টগুলি স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে। এক স্থানে অধিকসংখ্যক চারা রাখিলে তাহা বিশেষ সুবিধা-জনক হয় না। একটী আনারস গাছ হইতে মূলদেশে, পাতার গোড়ায় এবং ফলের শীর্ষভাগে তিন রকমের চারা পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে পাতার গোড়ায় উৎপন্ন চারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ফলের মাথায় যে চারা জন্মে, সেগুলিকে রোপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ রৌদ্রে কিছু শুষ্ক করিয়া পরে রোপণ বিধেয়। উক্ত চারাগুলিতে সাধারণতঃ রসাধিক্য ঘটিয়া থাকে। উহার রসভাব কিঞ্চিৎ কমাইয়া না লইলে উহা আশানুরূপ বাড়িতে পারে না। সমস্ত চারাই প্রথমে সংগ্রহ করিয়া, মূলদেশ অল্পাধিক শুষ্ক করিয়া লইলে ভাল হয়। নতুবা অনেক সময় মূলে অধিক রস সঞ্চিত হইয়া চারা মারা যাইতে পারে। চারাগুলি বসাইবার সময় প্রত্যেকটী চারার মূলদেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, উহার ভিতরে কোনরূপ পোকা মাকড় আছে কি না। বাহির হইতে পোকা মাকড় না দেখা গেলেও ভিতরে পোকা থাকিলে মূলদেশে তাহার চিহ্ন থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটী চারার গোড়া সামান্য তুঁতে মিশ্রিত জলে ২।১ মিনিট কাল ডুবাইয়া লইবেন। তাহাতে এই দোষ সংশোধিত হইবে।

ফাল্গুন মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এই চারা রোপণ করা চলে। ফাল্গুন মাসে জমি তৈরী করিয়া, দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে পর চারা বসাইবেন। সাধারণতঃ দেশী আনারসের চারা বৈশাখ মাস মধ্যেই রোপণ করা বিধেয়। বাহির হইতে আমদানী-করা বিদেশী চারা শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে লাগাইতে হয়। চারা বসাইবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, মাটি যেন শুষ্ক না হয়। মৃত্তিকা সরস না থাকিলে নবরোপিত চারার পক্ষে মৃত্তিকার গভীর স্তর হইতে রস আহরণ করিয়া দেহ পুষ্টি সাধন করা সম্ভব নহে।

জমিতে বসাইবার পর মাস দেড়েকের ভিতরেই চারাগুলি মৃত্তিকার সঙ্গে বেশ আঁটিয়া যায় এবং প্রয়োজন মত শিকড় বৃদ্ধি করিয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। এই সময় মাঝে মাঝে জমির তদ্বির করা আবশ্যক। গোড়ার মাটি নরম রাখিবার জন্য আবশ্যক মত গোড়া খুসিয়া দিতে হইবে। সে সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন নবোদ্গত কোমল শিকড়গুলি আহত না হয়। আর বর্ষাকালে কখনও গাছের গোড়া উস্‌কাইয়া দিবেন না। তাহা হইলে গোড়ায় জল জমিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কোন স্থানে যেন আগাছাদি জন্মিয়া উহাদের খাদ্য অপহরণ করিতে না পারে। আগাছা দেখিলেই উহা সাবধানে তুলিয়া ফেলিবেন। চারার পাতাগুলির ভিতরে কোন মতে মাটি যেন প্রবেশ না করে। তাহাতে চারার বৃদ্ধির পক্ষে বাধা জন্মে। প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ, পৌষ ও কার্ত্তিক মাসে

চারাগুলির গোড়ার মাটি উস্‌কাইয়া দিবেন। অনেক সময় প্রয়োজন মত চাষের বা জলের অভাবে অনেক চারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জমি অত্যধিক ক্ষারযুক্ত হইলেও চারাগুলি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এই দুর্ব্বল চারার পাতাগুলি সরল ও সরু হইয়া থাকে। অনেক সময় পাতার নিম্নদেশে টানা লম্বা কাল দাগ থাকে। এইরূপ চিহ্ন নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। কোন চারায় এইরূপ চিহ্ন দেখিলে সেগুলি তুলিয়া ফেলিয়া, ঐ স্থানে নূতন সতেজ চারা বসাইবেন এবং দুর্ব্বলতা যাহাতে অন্য চারায় সংক্রামিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং মাটির দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

উত্তম খাদ্য ব্যতীত আমাদের দেহ যেরূপ ভালরূপে পুষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যেক উদ্ভিদও সেইরূপ উপযুক্ত পরিমাণে সার না পাইলে সুপুষ্ট হইয়া উত্তম ফল প্রদানে সক্ষম হয় না। চারা রোপণান্তে বৎসর কাল পরেও যদি চারাগুলিকে তাদৃশ তেজাল না দেখা যায়, তবে সরিষার খৈল রৌদ্রে শুকাইয়া ভালরূপে চূর্ণ করতঃ মাটির সঙ্গে মিশাইয়া, প্রত্যেকটী গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ২।১ মুঠা দিয়া যাইতে হয়। ইহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই খইলসার টাটকা প্রয়োগ করিবেন না। টাটকা খৈলের তেজ চারাগুলি সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় ইহাতে গাছ মারাও যায়। যাহা হউক, সার দিয়া পরে গাছের গোড়ায় আবশ্যক মত জল দিতে হইবে। জল পাইলে সার মৃত্তিকার সঙ্গে ভাল-

রূপে মিশ্রিত হইতে পারে এবং সহজেই উদ্ভিদ-খাদ্যে পরিণত হয়। ২।১ বার জল দেওয়া হইলে শেষে মাটির শুষ্কতা বুঝিয়া তদনুযায়ী জল দিতে হইবে। নতুবা বিনা প্রয়োজনে জল দিলে মূল পচিয়া যাইতে পারে। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া অল্পাধিক সার প্রয়োগ বিধেয়। কারণ, এই সময় গাছ ফলোন্মুখী হইতে থাকে। আনারসের পক্ষে গোয়ালের আবর্জ্জনা, কাঠের ছাই, পুরাতন গোবর-সার উৎকৃষ্ট। তার পর ফল ধরিলে পচা গোবর খৈল-জল সহ মিশ্রিত করিয়া তরল সার প্রস্তুত করতঃ মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় দিলে ফলের আকার বড় হয় এবং শাঁসে ছিবড়ে জন্মিতে পারে না। ব্যবসায় হিসাবে আনারসের চাষ করিতে হইলে ফলগুলির আকার, বর্ণ ও ওজনের উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত কাঠের ছাই ২ মণ, পটাস সালফেট ও সুপার ফস্‌ফেট অব বোন প্রত্যেকটী ১৫।২০ সের পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, প্রতি বিঘায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহাতে আনারসের সৌরভ বেশ বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আনারস জমি হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যরস আহরণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে জমি শীঘ্রই সার-হীন হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রত্যেক বৎসরই উক্ত জমিতে সার প্রয়োগ করিতে হয়। ২।৩ বৎসর ফসল পাইবার পর ক্ষেত্র হইতে সমস্ত চারা তুলিয়া ফেলিয়া, জমিটীকে ভালরূপে চাষ দিয়া, কিছু দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। উহাতে আলো ও

বাতাসের সাহায্যে জমিতে স্বভাবতঃই নূতন খাদ্য-প্রাণ সৃষ্ট হয় এবং জমির আভ্যন্তরীণ দোষ সংশোধিত হয়। তার পর জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া, ভালরূপে চাষ দিয়া, নূতন করিয়া জমি প্রস্তুত করতঃ নূতন চারা লাগাইয়া যাইতে হয়। ইহাতে ক্ষেত্রস্বামী নিজেকে আপাততঃ ক্ষতি-গ্রস্ত মনে করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত প্রথা অবলম্বনে মৃত্তিকায় নূতন তেজ সঞ্চার না করিয়া, অবিশ্রান্ত ভাবে চাষ করিয়া গেলে ২।৩ বৎসর পর তাহাতে আর আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। ফলের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। বস্তুতঃ এই ক্রমিক হ্রাসের ফলে উদ্যানস্বামী যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, কিছু দিন ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া, নূতন ভাবে তৈরী করিয়া, আবার চাষ করিলে সেই ক্ষতির চতুর্গুণ লাভবান্ হইবেন সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ পৌষ মাস হইতেই আনারস চারা ফলোন্মুখী হয়, কিন্তু ইহা পাকিবার সময় গ্রীষ্মকাল। অবশ্য চেষ্টা করিলে বৎসরের যে কোন সময়েই ইহা অল্লাধিক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্মকালের ফল যেরূপ সুস্বাদু ও সৌরভ-ময় হয়, অন্য সময়ে সেরূপ হয় না।

গাছ হইতে সুপক্ক আনারসই তোলা উচিত। কারণ, গাছে থাকিয়া ভালরূপে পাকিতে না পারিলে উহার ভিতরে মিষ্টত্ব অপূর্ণ রহিয়া যায়। কাটা হইলে ঘরে রাখিয়া দিলে উহার ভিতরে আর মিষ্টত্ব জন্মিতে পারে না। কারণ, মিষ্টত্বের

জন্য যে পরিমাণ শর্করা আবশ্যক, তাহা সে একমাত্র গাছ হইতেই পায়। অনেক ফল ঘরে রাখিয়া পাকাইলেও মিষ্ট হয়। কিন্তু আনারসের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। সে গাছ হইতে যতদিনে যতটুকু শর্করা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার মিষ্টত্ব ততটুকুই থাকিবে। কিন্তু গাছে রাখিয়া খুব সুপক্ক করিবারও একটা বিপদ্ আছে। অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে আবার উহার ভিতরে পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহাতে ফলটীর স্বাদ টক্ হইয়া যায়। কাজেই সম্পূর্ণরূপে পাকিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উহা কাটিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ব্যবসায় হিসাবে বিদেশে রপ্তানী করিতে হইলে পাকিবার পূর্ব্বেই অবশ্য তুলিতে হয়। তাহাতে কিছু দিনের মধ্যেই উহার বাহিরের বর্ণ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু উহাতে মিষ্টত্ব জন্মিতে পারে না। তবে ফলের পচন নিবারণের জন্য বরফ দিয়া ঢাকিয়া চালান দিতে পারিলে সুপক্ক আনারসই গাছ হইতে তোলা যায়। নিকটবর্ত্তী কোন বাজারে বা দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যেখানেই বিক্রয়ের সুবিধা থাকিবে, সেই স্থানের দূরত্ব অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া ফল তুলিতে হইবে।

অনেকের ধারণা যে, ফলের মস্তকে যে ফেঁকড়ী থাকে, তাহা কাটিয়া ফেলা উচিত। তবে প্রথমেই না কাটিয়া, ফলের বয়সের মাঝামাঝি সময়ে কাটা কর্ত্তব্য। কারণ, ফলের সারাংশ টানিয়া লইয়া উহারা পুষ্ট হয়। সুতরাং কাটিয়া দিলে ফলের সারাংশ অযথা ব্যয়িত হইতে পারিবে না।

তাহাতে ফলই অধিকতর পুষ্ট হইবে। এই ধারণা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না। কেন না, আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ফেঁকড়ী কাটিয়া দিলে ফলের বৃদ্ধিতে বরং বাধা জন্মে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর পরিণাম হইতেছে ইহার স্বাভাবিক সৌরভ নাশ। আনারসের বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য্যই হইতেছে পরম তৃপ্তিদায়ক ঐ সৌরভটুকু। তাহাই যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে আর আনারসের ভিতরে লোভনীয় কি রহিল? অবশ্য ফেঁকড়ী দ্বারা যে ফলটী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু পরমকরুণাময় ভগবান্ একেবারে নিষ্প্রয়োজনে উহাকে সৃষ্টি করেন নাই। ফেঁকড়ীগুলির অস্তিত্ব একেবারে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না। এই জন্য না কাটিয়া উহাদের বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। ফলটী মাঝামাঝি বয়সের হইলে দুই দিকে দুইখানা বাঁশ পুঁতিয়া, একখানা ইষ্টক ঝুলাইয়া ফেঁকড়ীগুলিকে চাপা দিয়া রাখিতে হয়। আর এইরূপ করিবার পূর্ব্বে ঐগুলি বেশ ভাল করিয়া পিঁজিয়া দিতে হইবে। অবশ্য খুব বড় বাগান হইলে এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য থাকিলে এ প্রথা অবলম্বন করিলে অত্যন্ত মজুরী লাগিয়া যাইবে। যে দরে আনারস বিক্রয় হইবে, তাহাতে এ মজুরী পোষাণ কষ্টকর হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফেঁকড়ীগুলি শুধু পিঁজিয়াই দিবেন। ২।৪ বার মাঝে মাঝে পিঁজিয়া দিলেই চলিবে। তাহাতে মজুরীও বিশেষ লাগিবে না অথচ উদ্দেশ্য সফল হইবে।

আনারস যে শুধু ফল হিসাবেই বিক্রয় হয়, তাহা নহে। ইহা দ্বারা জ্যাম, জেলী ইত্যাদি নানারূপ সুখাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে এবং ইহা বিক্রয় করিয়াও লাভবান্ হওয়া যায়। আনারসের রস বেশ রসনাতৃপ্তিকর পানীয়। এগুলি প্রস্তুত করাও কষ্টসাধ্য নহে।

খোসা সমেত কিন্তু চোক্ তুলিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ফলটী চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া চিনির রসের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পাক করিলেই জ্যাম প্রস্তুত হয়।

জেলী প্রস্তুত করিতে হইলে ফলটীকে খোসা, বীজ ইত্যাদি ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া, সম ওজনের জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ছাঁকিবার পর কমলালেবুর রস মিশাইয়া আনারসের ওজন পরিমাণ চিনির সহিত পুনর্ব্বার ১ ঘণ্টা পাক করিয়া লইলেই জেলী প্রস্তুত হইবে। গরম থাকিতে থাকিতেই ইহা বোতলে পুরিয়া বন্ধ করা উচিত।

আনারসের রস প্রস্তুতের সহজ উপায় নিম্নরূপ ;—

সুপক্ক আনারস ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী মোটা কাপড় অথবা পাতলা ক্যাম্বিসের থলের মধ্যে পুরিয়া চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া লইতে হইবে। পরে উক্ত রস ১৮০° হইতে ১৯০° ডিগ্রি ফারেণ হিট্ তাপাঙ্কে অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য ফুটাইতে হইবে। অতঃপর ফুটান রস হইতে ফ্লানেলের ছাঁকনী দ্বারা ভাসমান অথবা অধঃস্থ কঠিন পদার্থ পৃথক করিয়া

ফেলিয়া দিতে হইবে। পরিষ্কৃত রসে পাউণ্ড প্রতি ৩ গ্রেণ স্যালি সাইলিক অম্ল সামান্য সুরাসারে দ্রব করিয়া সংযোগ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ১৫ মিনিটের জন্য ২০০° ডিগ্রি তাপাঙ্কে ফুটান আবশ্যক ; এইবার ফুটান পাত্রটী এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে রসপূর্ণ বোতলের গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। বোতলের ছিপিগুলিও ঐ সঙ্গে ফুটাইয়া লইতে হইবে। রসপূর্ণ বোতল গরম থাকিতে থাকিতেই উহাতে ছিপি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে একটী পাত্রে প্যারা-ফিণ্ গলাইয়া বোতলের মুখ ডুবাইয়া লইবেন। উহা শীতল হইলে আর বায়ু প্রবেশের উপায় থাকিবে না এবং রসও খারাপ হইবে না।

আনারস হইতে উৎকৃষ্ট আসব ও সির্কা প্রস্তুত হয় ; কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার এবং তদ্রূপ দ্রব্য আবগারীর আমলে আসে বলিয়া লাইসেন্স না লইলে প্রস্তুত করিতে পারা যায় না।

আনারসের পাতা হইতেও অতি উৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত হয়। ঐ সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি উচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়।

নিম্নে কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় আনারসের বিবরণ দেওয়া গেল। এইগুলির চারা সংগ্রহ করিয়া প্রকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করিতে পারিলে একমাত্র ফল বিক্রয় দ্বারাই লাভবান্ হওয়া যায়।

কিউজায়েণ্ট—ফিজি দ্বীপে ইহার বহুল পরিমাণে চাষ হইয়া

থাকে। ফলগুলি আকারে অত্যন্ত বড় হইয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া হইয়া থাকে, ফুলগুলি লাল ও নীল বর্ণে মিশ্রিত থাকে। ইহার গন্ধ ও স্বাদ অতি উৎকৃষ্ট। এগুলি সহজে শুকাইয়া যায় না। বহু দিন ঘরে রাখিয়া ব্যবহার করা চলে।

সিঙ্গাপুরী—ইহা আকারে খুব বড় হইয়া থাকে। সিঙ্গাপুর ইহার জন্মস্থান বলিয়া ইহাকে সিঙ্গাপুরী আনারস কহে। ফলগুলি একটু লম্বা হইয়া থাকে এবং তাহাতে অনেকগুলি চোক্ থাকে।

সিলন—সৌরভে বোধ হয় ইহার তুল্য ফল খুব কমই আছে। লঙ্কাদ্বীপে ইহা জন্মিয়া থাকে। আকার খুব বড় হয়।

শ্রীহট্ট—শ্রীহট্ট জেলায় ইহা জন্মে। চোক্ খুব কম থাকে। আকারে বেশী বড় হয় না, কিন্তু খাইতে বেশ সুমিষ্ট ও সুগন্ধি।

ঢাকাই—ইহার উপরের খোসা অপেক্ষাকৃত মসৃণ এবং চোখগুলি সাদা রঙের হইয়া থাকে। বেশ সুগন্ধি।

চিনা লাল }
চিনা সাদা } এইগুলি পাতাবাহারী জাতীয় আনারস। ফলগুলি খুব ছোট হয়, কিন্তু সুস্বাদু। সৌখীন ব্যক্তির আদরের জিনিষ। গ্রীণ হাউসে রাখিবার উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আনারস ক্রিমিনাশক, সারক, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মাবৰ্দ্ধক।

আম্র (Mango)।

আম্র ফলের রাজা। স্বাদে, গন্ধে আম্র মর্ত্ত্যধামে সুধা-ফল নামে বিখ্যাত। এরূপ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ফল পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজকাল পৃথিবীর নানাদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আম্রের চাষ হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই ফল আম্রের স্বক্ষেত্র অর্থাৎ ভারতজাত ফলের সমকক্ষ এখনও হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ আম্রের জন্মস্থান। শীতপ্রধান অঞ্চল ব্যতীত এসিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে এবং ভারতমহাসাগরস্থিত লঙ্কাদ্বীপ (সিংহল), যবদ্বীপ, মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আম্র জন্মিয়া থাকে। ইহা গ্রীষ্ম ঋতুর ফল, সেই জন্য গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব যেখানে নাই, সে স্থানে ইহা স্বভাবতঃ জন্মে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, সীতা অন্বেষণে বীর হনূমান্ যখন লঙ্কায় গিয়াছিলেন, তখন সে স্থানে আম্র ভক্ষণ করিয়া ভারতে আঁটী নিক্ষেপ করেন, ঐ আঁটী হইতেই ভারতে আম্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ণনার মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কারণ, ইহাকে মূল

ধরিলে বলিতে হয় যে, ভারতে আম্রের প্রথম উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের হিন্দু সাধারণের ভিতরে প্রতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আম্রপল্লবের প্রচলন হইয়া আসিতেছে; তাহাতে ভারতে যে রামায়ণী যুগের পূর্ব্বে আম্র ছিল না, এ কথা বলা চলে না। বিশেষতঃ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও যখন আম্রের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে ভারত-বর্ষই যে আম্রের জন্মস্থান তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ ইহা ভারতেরই নিজস্ব ফল। যাহা হউক, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আম্র, আম, মাবিড়ি, মা, আম্বা ফল, আম্বা, মেঙ্গা, অম্বজ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে মধুব্রত, কামাঙ্গ, রসাল, চূত প্রভৃতি নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই আম জন্মে সত্য, কিন্তু স্থান-বিশেষে ইহা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ-ভারতে বোম্বাই, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, বেহারে দ্বারভাঙ্গা, হাজিপুর, যুক্ত প্রদেশে কাশী, এলাহা-বাদ, সাহারাণপুর ও সন্নিকটস্থ স্থান এবং রাজপুতানায় চিতোরে যে সকল আম্র জন্মে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। বঙ্গ-দেশের সব জেলাতেই আম্র জন্মে, কিন্তু মালদহ ও মুর্শিদা-বাদের মত উৎকৃষ্ট নয়। উত্তরবঙ্গে মালদহ ব্যতীত অন্যান্য জেলাতে যে সব আম্র জন্মে, তাহা নামজাদা না হইলেও তন্মধ্যে কতগুলি যে বিশেষ উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই;

কিন্তু ব্যাপকভাবে চাষ না থাকায় এবং ব্যবসায়ের হিসাবে ব্যবহার না করায় বাহিরে এগুলির খ্যাতি নাই এবং তদ্দরুণ মুর্শিদাবাদ বা মালদহের মত কোন ফলবিশেষের সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের আম্রই সর্ব্বনিকৃষ্ট। এগুলি প্রায়শঃই কীটদষ্ট হয় এবং স্বাদ ও গন্ধও বিশেষ কিছু থাকে না। উৎকৃষ্ট স্বাদ ও গন্ধের বিশেষত্ব হিসাবে মুর্শিদাবাদেই উপাদেয় আম্রের সংখ্যা বেশী। কিন্তু এগুলি প্রায়ই ধনীদের বাগানে সীমাবদ্ধ থাকায় বাহিরে ইহার প্রচলন একরূপ নাই।

আম্রের চারা প্রস্তুত-প্রণালী দুই প্রকার। এক রকম আঁটী হইতে, অপর রকম কলম দ্বারা। অনেকে আঁটী হইতে প্রস্তুত চারার পক্ষপাতী নহেন। আঁটীর চারায় নানাবিধ দোষ আছে সত্য, কিন্তু একটী জাতি হইতে বিভিন্ন রকমের ফল উৎপাদন করিতে আঁটীর চারা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আঁটীর চারায় ফলন আরম্ভ হয় বহু বিলম্বে এবং ফলগুলি মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ না হইতে পারে। ইহার ফলের ভাল মন্দ সমস্তই নির্ভর করে বংশানুগত্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। আঁটীর চারায় যে পর্য্যন্ত না ফল আসিবে, সে পর্য্যন্ত একটা অনিশ্চয়তার সন্দেহের ভিতরে থাকিতেই, হইবে। কিন্তু কলমের চারার ফল সম্পূর্ণ নিশ্চিত। যে গাছ হইতে কলম কাটা হইবে, ফলও সেই গাছের মত হইবে; বরং অনেক সময় অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের ফলই কলম হইতে পাওয়া যায়।

কলমের চারাকে স্থানান্তরিত করিলেও ফলে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিন্তু আঁটীর চারা নিজ জন্মভূমিতেই পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি লইয়া ফলদান করিতে পারে। স্থানান্তরিত হইলে ইহার প্রকৃতি আরও পরিবর্ত্তিত হয়। আঁটীর চারার এই পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির প্রধান কারণ—বিভিন্ন শ্রেণীর পরাগ-সঙ্গম। কীট পতঙ্গের দ্বারা এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে যে পরাগ নীত হয়, সেই পরাগের দোষ গুণের সংমিশ্রণে যে ফলের সৃষ্টি হয়, সেই ফলের আঁটী হইতে উৎপন্ন চারার ফলে সেই সেই দোষ বা গুণ সংক্রমিত হইয়া থাকে। এই জন্যই অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় ফলের আঁটী হইতে প্রস্তুত চারায় অতি নিকৃষ্ট ফল হওয়া যেরূপ অসম্ভব নয়, সেইরূপ আবার অতি নিকৃষ্ট ফলের বীজোৎপন্ন চারায় অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় ফলের উৎপত্তিও সম্ভব হইতে পারে। এই অনিশ্চয়তার সংশয়ে কেহই থাকিতে প্রস্তুত নহেন। বিশেষতঃ ব্যবসায় হিসাবে যাঁহারা আম্রের চাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সব সময়ে এই অনিশ্চয়তা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই দিন দিন কলমের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু নূতন নূতন জাতীয় ফল সৃষ্টি করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে বীজের চারা প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। বীজের চারার প্রতি অবজ্ঞা না দেখাইয়া বরং উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বর্ণসঙ্কর (Hybrid) প্রস্তুতে মনঃসংযোগ করিলে ভাল হয়।

যে সমস্ত আম খুব উৎকৃষ্ট, তাহাদের আঁটী প্রায়শঃই খুব

পাতলা হইয়া থাকে। এই পাতলা আবরণের ভিতরে যে অঙ্কুর লুক্কায়িত থাকে, তাহাও অতি ক্ষুদ্র। এই জন্যই উপরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উঠা এই অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুরের পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহাতে বহুল পরিমাণে বীজও নষ্ট হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আঁটিটির উপরের কঠিন আবরণ সুতীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা সাবধানে খুলিয়া ফেলিয়া বীজটীকে সোজাভাবে পুঁতিয়া দিবেন। তবে কাটিবার সময় এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, যেন অঙ্কুরটির গায়ে একটুও আঁচড় না লাগে। অঙ্কুরটি যদি বিন্দুমাত্রও আহত হয়, তবে নষ্ট হইয়া যাইবে। বীজটীর উপরে পাতলা করিয়া মাটি চাপা দিবেন এবং লক্ষ্য রাখিবেন, যেন পিঁপড়া দ্বারা বীজটীর অনিষ্ট ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকে। উহাদিগের আক্রমণে অঙ্কুর বিনষ্ট হয়, অনেক সময় পিঁপড়া সমস্ত শাঁসটুকুই খাইয়া ফেলে। তার পর মৃত্তিকার রসভাবও লক্ষ্য করিতে হইবে। অধিক রস সঞ্চার হেতু বীজটী অনেক সময় পচিয়া যায়। এই জন্য যে মাটিতে উহা বসাইবেন তাহা সরস হইবে সত্য, কিন্তু অত্যধিক আর্দ্র হইবে না। এই অঙ্কুর হইতে যে চারা বাহির হইবে, তাহা প্রায় কলমের গাছের মত হইবে। ইহার ফলন শীঘ্র হয় এবং ফলগুলিও প্রায় মাতৃবৃক্ষের মতই হইয়া থাকে। মোট কথা, স্বভাবজাত বীজোৎপন্ন চারা অপেক্ষা এই প্রণালীতে উৎপন্ন চারা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও বীজোৎপন্ন চারা মাতৃবৃক্ষের স্বভাব পূর্ণভাবে পায় না—তথাপি বীজ সংগ্রহকালে উৎকৃষ্ট জাতীয় ফলের বীজই সংগ্রহ করিতে হয়। যে গাছটী নীরোগ, সেই গাছটীর সর্ব্ব-বিষয়ে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ পক্ক ফলটীকে বীজ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এই বীজ বপনের প্রশস্ত কাল। একটী ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিয়া, নির্ব্বাচিত বীজগুলি বপন করিতে হইবে। বেশ হাল্‌কা সারযুক্ত মাটি দিয়া হাপোর প্রস্তুত করিতে হইবে। বাটীর বা গোশালার আবর্জ্জনা-পচা সার হাপোরের মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হয়। বীজ রোপণ করিয়া সদ্য সদ্য জল সেচনের প্রয়োজন নাই। যদি হাপো-রের মাটি নিতান্ত নীরস হইয়া যায় এবং মৃত্তিকায় জলাভাব ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তবে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হইবে। জল খুব বিবেচনা করিয়া দেওয়া উচিত; কারণ, জলের আধিক্য ঘটিলে বীজ পচিয়া যাইতে পারে; আবার জলাভাব ঘটিলে বীজ আদৌ অঙ্কুরিত না হইতে পারে। সাধারণতঃ ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই অঙ্কুরিত চারাকে ২।৩ মাস কাল ঐ স্থানে রাখিয়া পালন করিয়া, শেষে অন্য হাপোরে স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই হাপোরও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিতে হইবে। তবে এই হাপোর পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনে বড় হওয়া আবশ্যক। কারণ, এখানে চারাগুলির পরস্পর ব্যবধান কিছু বেশী রাখিতে

হয়। উভয় চারার ব্যবধান বেশী না থাকিলে চারাগুলি ইচ্ছামত চতুর্দ্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করিতে পারে না। ইচ্ছানুযায়ী বিস্তৃতির অভাব ঘটিলে গাছের ভিতরে আপনা হইতে একটা সংকীর্ণ ভাব আসে এবং তাহাতে উহারা স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়িতে পারে না। ঘেষাঘেষি হইলে উহাদের স্বাভাবিক সহজ গতিতে বাধা জন্মে এবং গতি ঊর্দ্ধমুখী হওয়ায় চারা ঋজু ও সূক্ষ্মকাণ্ড হয়। চারা দুই বৎসর কাল সযত্নে পালন করিয়া, শেষে নিরূপিত জমিতে স্থায়িভাবে রোপণ করা বিধেয়।

এক্ষণে কলমে প্রস্তুত চারার কথা বলিব। সাধারণতঃ জোড়-কলমই এ ক্ষেত্রে উত্তম। তবে গুল্-কলম, ডাল-কলম, দাবা-কলম, চোঙ-কলম, জিব্ কলমেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে। কলম-তত্ত্ব অধ্যায়ে কলম প্রস্তুত-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

কলমের চারা অল্প দিনের মধ্যে ফলবতী হয় এবং উহা অবিকল মাতৃবৃক্ষের প্রতিরূপ হইয়া থাকে। এ জন্য কলমের চারার ফল সম্বন্ধে নিশ্চয়তায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কলমের চারার বিশেষ গুণ এই যে, উহা স্থানান্তরিত হইলেও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করে না। কলমের চারার নানাবিধ গুণ থাকিলেও স্থিতিকাল হিসাব করিয়া লাভালাভ বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, বীজের চারা দ্বারাই অধিকতর লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা। কারণ, কলমের চারা যেরূপ শীঘ্র

ফল প্রসব করে, সেইরূপ অধিক কাল ফলদানে সক্ষম হয় না।
কিন্তু বীজের চারা দীর্ঘজীবী। এক একটী বীজোৎপন্ন গাছ
২।৩ পুরুষ পর্য্যন্ত ফলদান করিতেছে এরূপও দেখা যায়।
বাস্তবিক বীজের চারাই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইত, যদি ইহার
ফলের নিশ্চয়তা থাকিত। এই অনিশ্চয়তার জন্যই বীজোৎ-
পন্ন চারা চাষ করিতে সাধারণতঃ কেহ সাহসী হন না।

আঁটীর চারাই হউক বা কলমের চারাই হউক, স্থায়িভাবে
রোপণের পূর্ব্বে এগুলিকে খাসি করিয়া লইলে ভাল হয়।
সাধারণতঃ হাপোর হইতে স্থানান্তরিত করিবার সময় খাসি
করাই যুক্তিযুক্ত। এই খাসি করার ফলে গাছের গতি ঊর্দ্ধ-
মুখী না হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গাছ ঢেঙা বা
উচ্চ হইলে ফলন বিশেষ ভাল হয় না। নাতিদীর্ঘ চতুর্দ্দিকে
বিস্তৃত ঘন শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষই অধিক ফলদানে সক্ষম
হয়। গাছের মূল শিকড়টীকে কাটিয়া ছোট করিয়া দেওয়ার
নাম খাসি করা। মূল শিকড়টীকে কাটিয়া ছোট করিলে
উহা আর বাড়িতে পারে না এবং কর্ত্তিত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু
শিকড় উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। মূল শিকড়ের
স্বাভাবিক গতি নিম্নমুখী। এই গতি রুদ্ধ হইলে শাখা-
শিকড়গুলি স্বভাবতঃই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া উদ্ভিদের আহার
সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিকড় দ্বারা বহু দূর
হইতে অধিক পরিমাণে আহার্য্য সংগৃহীত হওয়ায় কাণ্ড ও
শাখার অপরিপুষ্ট গ্রন্থিগুলি ক্রমেই জাগ্রত হইয়া উঠে এবং

বৃক্ষও অধিক শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে। অধিক সংখ্যক শাখায় অধিক সংখ্যক ফল জন্মে। কাজেই প্রত্যেকটী চারাকে খাসি করিয়া স্থায়িভাবে রোপণ করিলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা বেশী।

চারাগুলিকে নির্দ্দিষ্টকাল হাপোরে প্রতিপালন করিয়া, শেষে আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন কার্ত্তিক মাস মধ্যে স্থায়িভাবে বাগানে রোপণ করিবেন। অতিরিক্ত বর্ষায় কখনও চারা বসাইবেন না। এ সময় মাটি অত্যধিক রসস্থ থাকে। কাজেই মাটির যো বুঝিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা রসের আধিক্যে চারা নষ্ট হইতে পারে। স্থায়িভাবে রোপণের ২।১ সপ্তাহ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক একটী গর্ত্ত করিয়া রাখিবেন। প্রত্যেকটী গর্ত্ত ২ হাত চওড়া এবং ২ হাত গভীর করিবেন এবং পুরাতন পাঁক মাটি ও আবর্জ্জনা-পচা সার সহ নূতন মাটি মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা গর্ত্তগুলি ভরাট করিয়া দিবেন। তার পর একদিন মেঘমুক্ত দিবসের পরিষ্কার অপরাহ্নে চারাগুলি ঐ গর্ত্তে পুঁতিয়া দিবেন। কলমের চারার জোড় পর্য্যন্ত এবং আঁটীর চারার কাণ্ড ও শিকড়ের মিলনস্থান পর্য্যন্ত মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। মেঘলা দিনে চারা রোপণ করিলে সে চারার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। প্রাতঃকালেও চারা রোপণ করা যায়, কিন্তু অপরাহ্ন কালই সর্ব্বোত্তম। কারণ, প্রাতঃকালে যে চারা রোপিত হইবে, কিছু পরেই সেই চারাকে রৌদ্র ভোগ করিতে হইবে। ঐ ক্ষেত্রে স্থানান্তরজনিত শ্রম দূর করিয়া রৌদ্র

হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ সে পায় না। ইহাতে অনেক সময় চারাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং এই বেগ সামলাইতে একটু দীর্ঘ সময় আবশ্যক হয়। কিন্তু অপরাহ্ণে রোপণ করিলে সমস্ত রাত্রির শীতল ছায়ায় সে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিয়া শ্রম দূর করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে পরবর্ত্তী দিবসের রৌদ্র তাহাকে বিশেষ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে না।

স্থায়িভাবে রোপণ করিবার সময় প্রত্যেকটী চারার ব্যবধান ১৮ হইতে ২০ হাত পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। চারাগুলি বড় হইয়া দীর্ঘ শাখা-প্রশাখায় শোভিত হইলে পর যাহাতে কেহ কাহারও গায়ে না পড়িতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গাছগুলি ঘন-সন্নিবেশিত হইলে পরস্পরের প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের পথও অনেকাংশে রুদ্ধ হয়। তাহাতে গাছ ক্রমেই ঊর্দ্ধ দিকে বাড়িতে চেষ্টা করে। খাসি করার ফলে গাছের ঊর্দ্ধগতি হ্রাস পাইলে এবং ঘন-সন্নিবেশের দরুণ পরস্পরের বিরোধিতায় পার্শ্বদিকে প্রসারিত হইতে না পারিলে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া পর্য্যাপ্ত মুক্ত আলো বা বাতাসের অভাববশতঃ গাছ দিন দিন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইতে থাকে; এই গাছ হইতে মোটেই সুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তার পর যদিও বা গাছ ঊর্দ্ধমুখী হয়, তবুও তাহা হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ, এই গাছে অধিক শাখা-প্রশাখা হয় না, কাজেই ফলন কম হইয়া থাকে। এই জন্যই গাছ-

গুলির আবশ্যকীয় ব্যবধান সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

এই সময় অনেকে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগের পক্ষপাতী। হাড়ের গুঁড়ায় চারার উপকার হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চারা রোপণের ২।১ বৎসরের মধ্যে কোন সার প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে। হাড়ের গুঁড়া সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ইহা ব্যবহার না করাই ভাল। ফসলের উন্নতি বিধানে হাড়ের গুঁড়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ইহার যে ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব বর্ত্তমান, তাহাতে ইহার ব্যবহার যত কম হয়, ততই ভাল। শীতপ্রধান দেশে অতিরিক্ত শৈত্যে ইহার অনিষ্টকারিতা ততটা উপলব্ধি করা যায় না এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহার ভিতরে যে সব জীবাণুর সৃষ্টি হয়, সেগুলি অত্যধিক শীতে ধ্বংস হয়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সেরূপ না হওয়ায় ইহা দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা খুবই প্রবল। নানারূপ দূষিত রোগের জীবাণু ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। এই জন্য এ দেশে ইহার প্রচলন কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যখন কন্‌কনে শীত পড়ে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু শীতের প্রখরতা হ্রাস পাইলে ইহা আর ব্যবহার করা উচিত নহে। চারা রোপণের ২।১ বৎসর পরে প্রতি গাছে ১ ঝুড়ি খৈলসার, ৩ ঝুড়ি গোবরসার ও কিছু চুণ মিশ্রিত করিয়া

প্রয়োগ করিবেন। চুণ যদি পুরাতন হয়, তবে সিকি ঝুড়ি, আর যদি নূতন টাটকা হয়, তবে এক ঝুড়ির ৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র দিবেন। চূণের মাত্রা বেশী হইলে গাছের ক্ষতি হইবে, কিন্তু একটু কম হইলে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে না।

স্থায়িভাবে রোপণ করার পর চারাগুলিকে খুব সাবধানে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু ইহাদের মহাশত্রু। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও সুযোগ পাইলে ইহাদের উপর দৌরাত্ম্য কম করে না। পাতা ছেঁড়া, ডাল ভাঙ্গা, পেন্সিল বা ছুরী দিয়া ক্ষত সৃষ্টি করা, লাঠী দ্বারা আঘাত করা ইত্যাদি নানারূপে ইহারা গাছের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, উহাদের ভাষা বা চলৎশক্তি নাই বটে, কিন্তু জীবনীশক্তির প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতক্ষতি অনুভূতি বোধ আমাদের মতই উহাদের আছে। যাহা হউক, এই জন্যই উহাদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। চারাগুলি রোপণ করিয়া চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় বেড়া দিলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ইহারা বাঁচিতে পারে, কিন্তু বেড়া দিবার সময় ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, যেন উক্ত বেড়া দিবার ফলে চারা-গুলিকে পর্য্যাপ্ত আলো বাতাসের অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় এবং উহাদের শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারণে কোন বাধা না জন্মে। মোট কথা, প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পথে সহজ গতিতে চলিবার পক্ষে যেন কোন বাধা না জন্মে এবং বাহির বা ভিতর হইতে

কোন শত্রুর আক্রমণ যেন ইহাদের সহ্য করিতে না হয়। মৃত্তিকাজাত নানাবিধ কীট পতঙ্গ ইহাদের অন্তঃশত্রু। মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে এই সব পোকা থাকিতে পারে না।

নবরোপিত সুকুমার চারাগুলি প্রথমতঃ মৃত্তিকা হইতে রস আহরণ করিতে সক্ষম হয় না। এ জন্য মৃত্তিকার যো বুঝিয়া মাঝে মাঝে জল সেচন করিতে হয়। শিকড়গুলি উত্তমরূপে মৃত্তিকা-সংলগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের এইরূপ অক্ষমতা থাকে। চারাগুলি উত্তমরূপে লাগিয়া গেলে পর প্রত্যেক বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ও জ্যৈষ্ঠের শেষে গোড়ার চতুর্দ্দিকস্থ মাটি খুঁড়িয়া দিলে ভাল হয়। ইহাতে মাটির দোষ সংশোধিত হয়, মুক্ত আলো বাতাসের সংস্পর্শে আসায় মৃত্তিকায় নূতন উদ্ভিদ-খাদ্যের সৃষ্টি হয় এবং চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিকড়গুলি কিছু কিছু কর্ত্তিত হওয়ায় গাছের উপকার হয়।

সমস্ত আমগাছ একই সময় ফলে না। শ্রেণী হিসাবে ইহাদের ফলন-কালের তারতম্য আছে এবং এই তারতম্যের জন্য ফলগুলির পাকিবার সময় বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্য গাছের পাট করিতে হইলে গাছের ফল প্রসবকাল নির্ণয় করিয়া, তদনুযায়ী ভিন্ন পর্য্যায়ে রোপণ করা বিধেয়। কারণ, একই সময় সকলগুলির পাট করিলে অপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক গাছেরই ফলন-কাল অনুযায়ী পাট করার বিভিন্ন

সময় আছে। ইহার অন্যথা ঘটিলে অসময়ে পাট নিবন্ধন কোন গাছ অকালে ফলিতে আরম্ভ করে, আর কোন কোন গাছ হয় ত বা ফলনের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন শাখা-প্রশাখায় অধিকতর ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অসময়ে ফলিতে আরম্ভ করিলে গাছে ফলন কম হয় এবং ফলগুলির স্বাদ, গন্ধ ও আকার প্রভৃতি প্রায় সর্ব্ববিষয়েই নিকৃষ্টতা দেখা যায়। ফলোন্মুখী নিদ্রিত গ্রন্থিগুলি অকালে পাটের ফলে অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া শাখা-পত্রে পরিণত হয়। সেই বার হয় ত উক্ত গাছ হইতে কোন ফলই পাওয়া যায় না। সেই জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর গাছ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলে কালোপযোগী পাটের সুবিধা হয়।

আঁটীর চারায় সাধারণতঃ ৭।৮ বৎসরে এবং কলমের চারায় ৩।৪ বৎসরে ফলন আরম্ভ হয়। কোন কোন চারায় তৎ-পূর্ব্বেও ফলন দেখা যায়। কিন্তু এরূপ ফলন আরম্ভ হইলে, মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা অপরিণত অবস্থায়, অর্থাৎ চারার ফল প্রসবের পূর্ণ সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, ফলন আরম্ভ হওয়ায় গাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। প্রথম বৎসরে, এইভাবে মুকুল ভাঙ্গিয়া দিলে, চারার ভিতরে ফল-পুষ্টির যে অপরিণত শক্তি লুক্কায়িত থাকে, তাহা অকারণে ব্যয়িত না হওয়ায়, পরবর্ত্তী বৎসরে সেই শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সুফল প্রদানে সক্ষম হয়, অথচ গাছের কোন স্বাস্থ্য-হানি ঘটে না। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, এই যুক্তির

সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ক্ষেত্রস্বামী মাত্রেই ভবিষৎ সুফলে অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

গাছ মুকুলিত হইবার অন্ততঃ ১ মাস পূর্ব্বেই গাছের সমস্ত পাট শেষ করিয়া রাখিবেন। প্রত্যেক গাছের ফলন-কাল অনুযায়ী কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত পাটের প্রশস্ত কা..। এই সময় মধ্যে পাটের কার্য্য শেষ করিয়া রাখিতে হইবে। এতদ্দেশে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস মধ্যেই গ্রীষ্ম মরসুমে ফল-প্রসবী প্রায় সমস্ত গাছেই মুকুল আসিয়া থাকে। গাছের স্বভাব বুঝিয়া মুকুল আসিবার এক মাস কাল পূর্ব্বেই গাছের গোড়া খুড়িয়া আলগা করিয়া ২।৩ সপ্তাহ রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইতে হইবে। মোটা মোটা শিকড়গুলিকে এবং ক্ষুদ্র মূলকে এই ভাবে রৌদ্র ও বাতাসের সংস্পর্শে রাখায় ইহাদের জড়তা নষ্ট হয়, জীবনে নূতন স্পন্দন জাগিয়া উঠে,—মৃত্তিকার ভিতরে নূতন উদ্ভিদ-খাদ্যের সৃষ্টি হয়,—মূলে বা মৃত্তিকায় কোন দোষ থাকিলে তাহা সংশোধিত হয়। তার পর নূতন মাটি সার-সংযুক্ত করিয়া গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। জমির আদ্র্তা লক্ষ্য করিয়া কিছু দিন জল দিতে হয়। এই সময় যদি উদ্ভিদ আবশ্যকীয় খাদ্যে বা রসে বঞ্চিত হয়, তবে মুকুলগুলি ফুটিয়াই ঝরিয়া পড়ে; রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর হইলে এবং মৃত্তিকা শুষ্ক বোধ হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত জল দান করা কর্ত্তব্য। মুকুল ধরিতে আরম্ভ করিলে কিছু দিন জল বন্ধ

রাখিতে হইবে। তারপর মুকুল কড়ায় পরিণত হইলেই আবার জল সেচন করিতে হয়। এ সময়েও মৃত্তিকার ভাব বুঝিয়া জল সেচন করিতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, আম গাছের তলায় বহু জঙ্গল জন্মিয়াছে। গাছের তলায় এইরূপ জঙ্গল জন্মিতে দেওয়া কোন-মতেই উচিত নহে। ইহাতে গাছের খাদ্যাভাব হয়—গাছের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং ফলেরও স্বাদ খারাপ হইয়া যায়; ক্ষেত্র-বিশেষে ফলে পোকাও জন্মে। ইহাদের উদ্ভব নিবারণের জন্য মাঝে মাঝে ক্ষেত্রের মাটি ওলট-পালট করিয়া দিতে হয়। ঘাস, আগাছা ইত্যাদির মূলগুলি বাছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বরং ঐগুলি নষ্ট না করিয়া উদ্যানের বাহিরে এক স্থানে জড় করিয়া পচাইলে বেশ সার প্রস্তুত হইতে পারে। জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার গোড়ায় লাঙ্গল দিয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিলে বর্ষার জল সহজেই মাটির ভিতরে বসিয়া যাইতে পারে। নতুবা মাটি কঠিন থাকিলে অনেক সময় গোড়ায় জল জমিয়া থাকে। তাহাতে গাছের ক্ষতি হয়। কিন্তু জলটা যদি উপরে না দাঁড়াইয়া, সহজেই মাটির ভিতর বসিয়া যায়, তবে ভিতরে উক্ত রস বহু দিন সঞ্চিত থাকায় তাহা দ্বারা উদ্ভিদ সম্বৎসরের খাদ্যের যোগান পাইতে পারে। গাছের গোড়ায় ৮।৯ ইঞ্চি উঁচু আল বাঁধিয়া দিলে খুবই ভাল হয়। ইহাতে ভিতরের মাটি বহু দিন পর্য্যন্ত সরস থাকে।

গাছ একটু পুরাতন হইলে অর্থাৎ স্থায়িভাবে লাগাইবার

২।৩ বৎসর পর হইতে, প্রতি বৎসর নিয়মিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পুষ্প প্রসবের মাসাধিক কাল পূর্ব্বে পাট করিবার সময় এই সার প্রয়োগ বিধেয়। গাছের বয়স, আকার ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকটী গাছে /৪ সের হইতে /৫ সের ছাই, /১ সের হইতে /৩ সের খৈল-সার চূর্ণ এবং /৮ সের হইতে ।৫ সের গোশালার আবর্জ্জনা-পচা সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি কেহ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উপরোক্ত সারগুলির পরিমাণ কিছু কিছু কমাইয়া দিয়া গাছপ্রতি /১ সের হইতে /২ সের অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করিবেন। যে সব দেশের জলবায়ু আর্দ্র, সে স্থানে প্রতি গাছে /৩ সের হইতে /৬ সের লবণ প্রয়োগ করিলে খুব ভাল হয়। গাছের শুধু গোড়ায় কখনও সার দিবেন না। সাধারণতঃ ডালপালাগুলি যত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, গাছের শিকড়গুলি তত দূর বিস্তৃতি লাভ করিয়া গাছের জন্য খাদ্য আহরণ করে। মাত্র গাছের মূলদেশে সার প্রয়োগ করিলে, উক্ত শিকড়গুলি দ্বারা তাহা আহরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শিকড়গুলি উক্ত সার ব্যবহারের কোন সুযোগ পায় না। কাজেই শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি অনুযায়ী চতুর্দ্দিকস্থ মাটি খুঁড়িয়া সার প্রয়োগ বিধেয়। গাছে জল দিবার সময় শুধু গোড়ায় জল না দিয়া, গাছের চতুর্দ্দিকে জল দিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

জাতিবিশেষে আম্রফল বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস

পর্য্যন্ত পাকিতে আরম্ভ করে। কোন কোন আম পাকিতে-আরম্ভ করিয়াই অল্প দিনের মধ্যে ফুরাইয়া যায়, কোনগুলি বা খুব ধীরে ধীরে পাকিয়া, বহু দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারে আসে। প্রত্যেক জাতির এই স্বভাব লক্ষ্য করিয়া, বেশ যত্নের সহিত ফল সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, একটী গাছে ২।৪টী আম পাকিতে আরম্ভ করিলেই ক্ষেত্রস্বামী গাছটীর সমস্ত ফল পাড়িয়া ঘরে জাগ দিয়া রাখেন। তাহাতে অনেক ফল অযথা নষ্ট হয় এবং ফলের স্বাদ ও সৌরভ বিকৃত হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় গাছে বিস্তর ফল পাকিয়া থাকে, যেটী আপনা হইতে পড়ে, সেইটী মাত্র সংগৃহীত হয়। এ প্রথাও ভাল নহে। কাকে, বাদুড়ে অনেক ফল নষ্ট করে, মাটিতে আছাড় লাগিবার জন্য অনেক ফলের স্বাদ খারাপ হয়। এ জন্য প্রত্যহ বাছিয়া বাছিয়া ফল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যে ফলটী পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইটীই মাত্র সযত্নে পাড়িতে হইবে; জালতির সাহায্যে পাড়িলে ফলে মোটেই আঘাত লাগে না, তাহাতে উহার স্বাদ অবিকৃত থাকে।

ব্যবহারের দোষে অনেক সময় আম্রের প্রকৃত স্বাদ আমরা পাই না। সদ্য-সংগৃহীত ফল কখনও খাইতে নাই। সদ্যোগৃহীত ফলে আঁঠার গন্ধ থাকে, তাহাতে ফলের স্বাদ ঠিক বোঝা যায় না। গৃহে রাখিয়া, ফলটীর অবস্থাবিশেষে ৮।১০ ঘণ্টা কাল হইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত মজাইয়া, শেষে ভক্ষণ করিলে ফলের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। খুব উৎকৃষ্টজাতীয় এমন অনেক-

আম আছে, যাহা ঠিক মজিবার একটু আগে বা পরে খাইলে বিস্বাদ লাগিয়া থাকে। এগুলির উপযুক্ত সময় নির্ণয় করিয়া করিয়া খাইলে অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইলে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর আম্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য আম্র ভক্ষণ সম্বন্ধেও সতর্ক হইতে হয়।

কাঁচা ও পাকা, উভয় অবস্থাতেই আম্র প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। কাঁচা আম হইতে মোরব্বা, আচার, আমসী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মোরব্বা ও আচার অতি মুখরোচক উপভোগ্য জিনিষ সন্দেহ নাই। অসময়ে আমসী হইতে টক্ প্রস্তুত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ মতে পুরাতন আমসী খুব উপকারী জিনিষ; ইহাতে খাদ্যপ্রাণ 'খ' যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ইহা স্কার্ভি রোগনাশক। কড়া আমের টক্ গ্রীষ্মের বেশ স্নিগ্ধকর খাদ্য। পাকা আমের রস হইতে প্রস্তুত আমসত্ব খুব তৃপ্তিকর জিনিষ। কবিরাজী মতে পুরাতন আমসত্ব বিশেষ হিতকর। ব্যবসায় হিসাবে এই সব জিনিষ প্রস্তুত করিলেও বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যায়।

ব্যবসায় হিসাবে আমের চাষ করিলে পাকা আম বাহিরে চালান দেওয়ার অথবা সম্ভব হইলে নিকটস্থ হাট বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। আমের ব্যবসায় বিশেষ লাভ-জনক সন্দেহ নাই। এই অমৃত ফলের চাহিদা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত জাতির মধ্যেই আছে। পূর্ব্বে বাহিরে আম চালান দেওয়া সম্ভব হইত না। কারণ, পাকা আম

অতি অল্পকালের মধ্যেই পচিয়া গিয়া থাকে, কিন্তু আজকাল সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। শীতল কামরায় (Refrigerating chamber) করিয়া আজকাল বহু দূরদেশেও আমের চালান যাইতেছে। সুদূর ইংল্যাণ্ডে পর্য্যন্ত আজকাল আমের চালান গিয়া থাকে। ইহাতে ফলগুলি নষ্ট হইবার ভয় নাই। বেশ তাজা অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দূর দূর দেশে চলিয়া যাই-তেছে। বাহিরে চালান দিতে হইলে অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় ফল-গুলি পাড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থায় চালান হইলে পথি-মধ্যে যে ২।৪ দিন সময় পাওয়া যায়, সেই সময়ের মধ্যেই উহারা সম্পূর্ণ তৈরী হইতে পারে। এক একটী গাছে কম পক্ষে গড়ে ১৫০০ শত ফল ধরিলেও প্রতি শত ২৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিলে ৩০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে যদি কম পক্ষে ১২টী গাছও থাকে, তবে বৎসরে প্রতি বিঘায় ৩৬০৲ টাকা পাওয়া যায়। আবশ্যকীয় খরচ বাবদ ১০০৲ শত টাকা বাদ দিলেও ২৬০৲ টাকা লাভ থাকে। ইহা অতি কম পক্ষে হিসাব দেওয়া গেল। বাস্তবিক ভালরূপে যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চাষ করিলে আরও অনেক বেশী লাভ দাঁড়ায়। প্রত্যেকটী গাছের ব্যবধান যদি ২০ হাত রাখা যায়, তাহা হইলে ১ বিঘা জমিতে ২০টী গাছ বসিতে পারে। কোন কারণে ইহার যদি ৪টী গাছের ফলনও বাদ দেওয়া যায়, তবে ১৬টী গাছের ফলন আমরা পাই। প্রতি গাছে সাধারণতঃ ২০০০ হাজার ফল ধরিয়া থাকে, আবার

গাছ একটু পুরাতন হইলে ৪।৫ হাজার ফলও পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কড়া, কাঁচা এবং আরও নানা কারণে নষ্ট বাবদ উক্ত ৪টী গাছের ফলন বাদ দেওয়া গেল। ফল যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে ৩৲।৪৲ টাকা শত দরেও বিক্রয় হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায়, সমস্ত খরচ বাদে প্রতি বিঘা জমিতে বৎসরে ৪০০৲।৫০০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইতে পারে। ফলকর গাছ স্থায়ী কৃষি। প্রথম বৎসর ইহার জন্য মোটামুটী একটা টাকা খরচ হইবে; কিন্তু পরে আর সেরূপ খরচের আবশ্যক হইবে না। সার খরিদ এবং সাময়িক ভাবে মজুর নিয়োগ ইত্যাদির জন্য প্রতি বৎসর কিছু কিছু খরচ হইবে মাত্র। বিস্তৃতভাবে আবাদ করিতে গেলে স্থায়িভাবে মজুর রাখিতে হইবে এবং তাহাতে মাসিক একটা নির্দ্দিষ্ট খরচ লাগিবে সত্য, কিন্তু বিঘা প্রতি গড়পড়তা হিসাব ধরিলে খরচের পরিমাণ কমই দাঁড়াইবে এবং লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

ফল ব্যতীত আমগাছ আরও নানা ব্যবহারে আসিয়া থাকে। পুরাতন আমগাছের তক্তা অতি উৎকৃষ্ট। চেয়ার, টেবিল, আলমারী, কবাট ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় গৃহসজ্জা ও আসবাব এই তক্তায় প্রস্তুত হয়। ডালপালা এবং অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশগুলি জ্বালানী কাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছের পাতাগুলি বৃথা নষ্ট না করিয়া, একটী গর্ত্তে মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া পচাইলে উৎকৃষ্ট পাতা-সার প্রস্তুত হয়। যাঁহারা মরশুমী ফুলের চাষ করেন, তাঁহাদের নিকট

এগুলি বিক্রয় করা চলে। বিক্রয়ের অসুবিধা থাকিলে ঐ সার গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়। সার প্রস্তুতে অসুবিধা বোধ করিলে পাতাগুলি কুড়াইয়া, এক স্থানে জড় করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিলে, জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। এক কথায়, গাছটীর প্রত্যেক অংশই কোন না কোন প্রয়োজনে লাগাইয়া অর্থ লাভ করা চলে এবং এই অর্থ দ্বারাও ক্ষেত্রের জন্য আবশ্যকীয় খরচের একটা অংশ পূর্ণ হইতে পারে।

যে কোন দ্রব্যের ব্যবসায় করিবা লাভবান্ হইতে হইলে সেই দ্রব্যের উৎকর্ষতার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। আম্রের ব্যবসায়ে সাফল্য নির্ভর করে ফলের উপর। ফলের উৎকর্ষতা নির্ভর করে বৃক্ষের স্বাস্থ্যের উপর। আমাদের দেহে যেরূপ নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপ সাধারণ ঘটনা, বৃক্ষের বেলাতেও তদ্রূপ। নানাবিধ উৎকট রোগে ইহারাও নিয়ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। রুগ্ন গাছ হইতে সুফলের আশা করা বৃথা। অসুস্থ অবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য যেরূপ সুসম্পন্ন হয় না, উদ্ভিদেরও স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে, সে তাহার কর্ত্তব্য কখনও সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারে না। এই জন্যই বৃক্ষের স্বাস্থ্যের উপর উদ্যানক মাত্রেরই প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমগাছের রোগের মধ্যে গাঁট বা অর্ব্বুদ রোগই প্রধান ও মারাত্মক। গাছের কাণ্ডে, শাখায়, প্রশাখায় এগুলি জন্মিয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। একটী গাছে একটী

গাঁটের সৃষ্টি হইলে, ক্রমেই উহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং নিকটবর্ত্তী গাছগুলিতে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে। বৃক্ষ-গাত্রে ছিদ্র উৎপাদনকারী কঠিন-পক্ষ এক প্রকার কীট (Boring beetle) এই রোগের বাহন। এগুলি এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ গাঁটের সৃষ্টি না হইলে উহাদের আক্রমণ ঠিক বোঝা যায় না। এই রোগ ধরা পড়িবামাত্র অর্থাৎ গাঁটের উৎপত্তির সূচনাতেই ইহার প্রতিকারে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদের আক্রমণে গাছ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য গাছের ফলপ্রসবিনী শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন হইলে গাছ অনেক সময় মরিয়াও যায়। কোন গাছে এইরূপ গাঁটের উৎপত্তি দেখিলেই ধারাল ছুরী দিয়া গাঁটটী কাটিয়া ফেলিবেন। তার পর যত দূর পর্য্যন্ত লালবর্ণের ক্ষত ও আবর্জ্জনা দেখা যাইবে, তত দূর উত্তমরূপে চাচিয়া ফেলিতে হইবে। পরে গর্ত্তের মধ্যে আল্‌কাতরা প্রবেশ করাইয়া দিয়া, গর্ত্তের মুখটি বেশ ভালরূপে বন্ধ করিয়া দিলে সংক্রমণ নিবারিত হইবে। কর্ত্তিত অর্ব্বুদটি ও অপরাপর ছাঁটাই অংশগুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। নতুবা উহাদের মধ্যে যে সব জীবিত কীটাণু থাকে, তাহারা অপর বৃক্ষে ঐ রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

আমের পুষ্পোৎপাদক শাখা-প্রশাখাদি এক প্রকার শোষক কীট ((Mango hoppers—Jessidae) দ্বারা আক্রান্ত হয়। উহাদের অঙ্গ হইতে আঠা নিঃসৃত হইয়া নিম্নস্থ

পত্রে পড়ে এবং তাহার উপর আবার কৃষ্ণবর্ণের ছত্রক জন্মিয়া থাকে। এই কীট ও ছত্রকের আক্রমণের ফলে পুষ্পদণ্ডাদি এত রুগ্ন হইয়া পড়ে যে, মুকুল অথবা কড়া ঝরিয়া যায়। ইহার প্রতিকার হইতেছে কেরোসিন মিশ্রণ (Kerosine emulsion) ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে কিম্বা ফল ধরিবার পর পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ। উক্ত শোষক কীটের বৈজ্ঞানিক নাম Idiocerus Clypealis.

গাছের ত্বক্ এক প্রকার চর্ম্মরোগে এবং পাতাগুলি গুটী-রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এগুলি ততটা মারাত্মক নয় বটে, কিন্তু উদ্ভিদ যে ইহাদের আক্রমণে অল্পাধিক বিব্রত হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাংশুবর্ণের এক প্রকার চাকা চাকা দাগ গাছের ছালের উপরে দেখা যায়। আমাদের দেহের দদ্রুরোগের মত উদ্ভিদদেহের ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগবিশেষ। এগুলি বৃক্ষ-ত্বকের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে এবং অধিক দিন স্থায়ী হইলে ক্রমে গাছের অভ্যন্তরেও ইহাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তখন ইহারা গাছের রস শোষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধনে তৎপর হয়। তাহাতে গাছ ক্রমশই দুর্ব্বল হইতে থাকে। এই রোগ ধরা পড়িলেই সেই স্থান উত্তমরূপে চাচিয়া, গরম জল বা ফিনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া দিবেন। পাতায় কালো কালো গুটী থাকিলে সেই পাতাগুলি ছিঁড়িয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। নতুবা ক্রমেই সমস্ত পাতা ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে ও

বৃক্ষদেহের যে প্রয়োজনীয়তা উহারা মিটাইয়া থাকে, তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হয়। পাতার স্থানবিশেষ শুকাইয়া যাইতে দেখিলেও সেই পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। পাতায় কোন রোগ ধরিলে পত্রহরিৎ নষ্ট হইয়া যায়, বৃক্ষের খাদ্য পরিপাকে বাধা জন্মে এবং তাহাতে বৃক্ষের পরিপোষণ ক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়।

আম্র ফলও নানাবিধ কীটে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ অপরিচ্ছন্নতার জন্য এই সব কীটের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এই কীটের উৎপত্তি খুবই বেশী। এই অঞ্চলে পোকাশূন্য আম খুব কমই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ফলেই উপর হইতে ছিদ্র দেখা যায়। ফলটী কাটিলে বা ছাড়াইলে পোকাগুলি পতঙ্গের মত উড়িয়া যায়। ভিতরে কালো রংএর কতকগুলি গুঁড়া পড়িয়া থাকে। আবার কোন কোন ফলে উপর হইতে ছিদ্র দেখা যায় না, কিন্তু ফলটী কাটিলে ভিতরে পোকা পাওয়া যায়। যেগুলির ছিদ্র আছে, সেগুলি সম্বন্ধে বলা যায় যে. অর্দ্ধ-পরিণত ফলে ছিদ্র করিয়া উহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যে-গুলি ছিদ্রহীন, অথচ ভিতরে পতঙ্গাকৃতি কীট বর্ত্তমান, সেগুলি মুকুল অবস্থাতেই আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন কীট বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভিতর হইতে ক্রমে ছিদ্রপথ প্রস্তুত করিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জন্য অনেক সময় ছিদ্র থাকিলেও ফলের ভিতরে কীট পাওয়া যায় না, শুধু কালো রংএর কতক-গুলি গুঁড়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ কীটের আক্রমণে আমের

মুকুল নষ্ট হয়। ইহাদের সাধারণ নাম আম-মাছি। কেহ গাছতলায় গেলে ইহারা নাকে মুখে আসিয়া পড়ে। আম্র মুকুলিত হইলে মুকুলের চতুর্দ্দিকে ইহাদের ঘুরিতে দেখা যায়। এই রকম কীটের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক। ঐ অঞ্চলের স্থানীয় আম্র ব্যতীত অন্য স্থান হইতে আনীত উৎকৃষ্টজাতীয় গাছের ফলেও কীট জন্মে। কিন্তু কোন কোন গাছের ফলে আবার সে কীট দেখা যায় না। বরিশাল জেলার রত্নপুর গ্রামের এক গৃহস্থের বাটীতে এইরূপ কতকগুলি আমগাছ আছে। এগুলি স্থানীয় আম্রের আঁটির চারা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গাছ কয়টীর ফলে আদৌ কীট দেখা যায় না। অথচ সে গাছগুলি যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থান মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় এবং তাহাদের মুক্ত আলো ও বাতাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবার পক্ষে যথেষ্ট বাধাও আছে। রত্নপুরের পার্শ্ববর্ত্তী শোলক নামক গ্রামের জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মুর্শিদাবাদ হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আম্রের চারা আনিয়া নিজ বাটীতে রোপণ করিয়াছিলেন। ঐ গাছগুলির মধ্যে কয়েকটীর ফলে পোকা নাই, আবার কয়েকটীতে পোকা আছে। কিন্তু সবগুলি ফলই খাইতে স্বাদে, গন্ধে অতি উপাদেয়। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও হয় ত অনেক পাওয়া যায়। এই সব কারণে ঠিক বোঝা যায় না যে, ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই কীটের উৎপত্তির মূল কারণ কি। ফলতঃ আম্রফল দুই জাতীয় পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১ম—চেলে

পোকা শ্রেণীর Cryptorhyncus gravis নামক কঠিনপক্ষ কীট; সদ্য নির্গমনের সময় শ্বেত এবং পরে পোকা পাটকিলে বর্ণ দেখায়। ফলের ভিতরে শ্বেতবর্ণ কৃমিবৎ কীড়া এবং পুত্তলি (Pupa) উভয়ই পাওয়া যায়। নূতন ফল ধরার সময় ইহা ফলে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাদের আক্রমণচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। ২য়—মক্ষিকা শ্রেণীয় Daucus ferrugineus; ইহা প্রধানতঃ নাবী আম্র ফসল আক্রমণ করে এবং অর্দ্ধপরিণত ফলে প্রবেশ করে ও ফল কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। উভয় কীট সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্ণদেহ পতঙ্গ ফল হইতে বাহির হইয়া কাণ্ডে, ত্বকে অথবা বৃক্ষতলে মৃত্তিকায় ডিম্ব প্রসব করে: ঐ সমুদয় ডিম্ব ক্রমশঃ কীটে পরিণত হইয়া শীতের শেষে আবার মুকুল ও ফল আক্রমণ করে। সেই জন্য বৃক্ষকাণ্ড ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে এবং অল্প মাত্রায় চূণকাম করিয়া দিলে সমধিক ফল পাওয়া যায়।

এই সব কীট পতঙ্গের উপদ্রব নিবারণের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষরূপ প্রতীকার আবশ্যক। বাগানে আবর্জ্জনাদি পচিতে না দিলে, আগাছা ইত্যাদি জন্মিতে না পারিলে, মাঝে মাঝে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে, গোড়ার মাটি আলগা করিয়া মূল ও শিকড়গুলিকে আলো বাতাস খাওয়াইলে এবং গাছের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনেক ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর সুফল পাওয়া যায়। গাছ যখন মুকুলিত হইতে থাকে, তখন গাছতলায় ধোঁয়া দিলেও উপকার হয়।

আম্র বাগ প্রস্তুতে উৎসাহী পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের পাকিবার সময় ও মোটা-মুটী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

❋ চিহ্নিত মাস পাকিবার সময়।

আম্রের নাম	পাকিবার সময়			
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ
আলফান্সো	—	❋	—	—
আলিবক্স	—	❋	❋	—
অমৃত ভোগ	—	❋	—	—
আনারসি	—	❋	—	—
কহিতুর	—	❋	—	—
কালাপাহাড়	—	—	❋	—
কিষণ ভোগ	—	❋	—	—
কো পাহাড়ী	—	—	❋	—
কুমড়া জালি	—	—	❋	—
খরমুজা	—	❋	—	—
গোপাল ভোগ	—	❋	—	—
জালিবান্ধা	—	—	—	❋
তোতাপুরী	—	—	❋	—
তোতা	—	—	❋	—
দুধিয়া	❋	—	—	—

❋ চিহ্নিত মাস পাকিবার সময়।

আম্রের নাম	পাকিবার সময়			
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ
নাজিম পছন্দ	—	❋	—	—
পেয়ারাফুলি	❋	—	—	—
ফজলী	—	—	—	❋
বাটাজোড়া	—	❋	—	—
বৃন্দাবনী	—	❋	—	—
ভাদুরিয়া	—	—	—	❋
ভূতো বোম্বাই	❋	—	—	—
মোহন ভোগ	—	❋	—	—
রাঢ়ি	—	—	—	❋
ল্যাংড়া	—	❋	—	—
লতানে	—	—	—	❋
সফেদা	—	❋	—	—
সুকুল	—	❋	—	—
সরিখাস	—	❋	—	—
সুন্দর সা	—	—	❋	—
সিপিয়া	—	—	—	❋
হিমসাগর	—	—	❋	—
ক্ষীরসাপাতী	—	❋	—	—

স্থানবিশেষের কতকগুলি উৎকৃষ্ট আম্রের নাম—

মালদহ

ফজলী,	আড়াই সেরা,	গোপাল ভোগ,
মোহন ভোগ,	মিশ্রি কন্দ,	কিষণ ভোগ,
গোলাপ গন্ধ,	হিমসাগর,	জালিবান্ধা,

মুর্শিদাবাদ

আলিবক্স,	আনারদানা,	আতাপছন্দ,
অমৃত ভোগ,	ইমামবক্স,	অনুপান
আনারসি,	এনায়েৎপছন্দ,	এলাচদানা
কালাপাহাড়,	কহিতুর,	কালমেঘা,
বেগমপছন্দ,	খরমুজা,	নাজুকবদন,
পেয়ারাফুলি,	সুলতানপছন্দ,	নবাবপছন্দ,
দাউদ ভোগ,	খাজা,	বিমলী,
ক্ষীরসাপাতী,	বড় সিন্দূরিয়া,	তোতা,
তালাবী,	সিপিয়া,	কাকাতুয়া,
আষাঢ়িয়া,	আমরূদ,	চুসনী
গোলাপজাম,	তরবুজা,	চম্পা,
বৃন্দাবনী,	ভবানী চৌরস,	মর্ত্তমান,
বাদ্সাপছন্দ,	বাতাসা,	সরবতী,
মণিয়াখাসা,	রাণীপছন্দ,	মধুবিলাস,
বাতাবী,	বড়সাহী,	সাপ্তালু;
পোঁপিয়া,	বারমেসে,	কুদ্রকখাসা,

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি উৎকৃষ্ট আম্র বিভিন্ন নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ, যথা,—

বর্দ্ধমানের—কাঁচামিঠা, দেবানন্দপুরের—ফুলি, টালিগঞ্জের—গোলাপখাস, হুগলীর—বাটাজোড়া, ফরাসডাঙ্গার—বুড়ি, বারুইপুরের—গোপালধোপা, পূর্ণিয়ার—নৌরস।

মান্দ্রাজ

আমিনা,	চিতোর,	পিটার,
হাথুডা,	রাসপুরা,	দিলপছন্দ,
তোতাপুরী,	গোভা,	রেসবেরী,
ইথাডা,	ওয়ালজাপছন্দ,	বেগুণফুলী,
	ল্যাংডা,	

যুক্তপ্রদেশ

সফেদা,	দশেরী,	জর্দ্দা,
ভাউর্গা,	তাইমুরা,	কাঁচামিঠা,
	ল্যাংড়া (কাশীর)	

বোম্বাই

রাঢ়ি,	আলফানসো,	ভূতো,
সুরট,	লতানে,	কাল বোম্বাই,
পিয়ারী	সিঙ্গা,	নাসিভোগ,
সালেমপছন্দ,	গুড়িয়া,	আমীরগোলা,
কাওয়াসজী প্যাটেল,	ফার্ণাণ্ডিণ,	মালাবার,

বিহার ও উড়িষ্যা

ল্যাংড়া (দ্বারভাঙ্গা, হাজিপুর), জর্দ্দালু,
মহারাজপছন্দ, মিঠুয়া,

মহীশূর

গোলকেরী, মঞ্জমাভূ, বদামী,
চিং কৈ, সীমাভূ, জনিমাভূ.

সিংহল (লঙ্কাদ্বীপ)

সিলোন বোম্বাই, জাফলা, মি-আম্বা, প্যারেট,

কতকগুলি উৎকৃষ্ট আম্রের বিশদ বিবরণ,—

কালাপাহাড়—ইহা অতি উৎকৃষ্ট ফল, ফলগুলি প্রায় গোল, নিম্নদেশ একটু লম্বা ধরণের, এক একটীর ওজন ৶৷৵০ হইতে ৶৷৷০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। খুব মিষ্ট, আঁশশূন্য এবং আঁটী অত্যন্ত পাতলা। খাঁটী মুর্শিদাবাদের কালাপাহাড় বাজারে প্রায় আসে না। এই আম্র পল অনুপল গণনা করিয়া খাইতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঠিক তৈয়ারী হইবার একটু পূর্ব্বে খাইলে ইহা অম্ল বোধ হইবে, আবার একটু পরে খাইলে পানসে, ঝাল বলিয়া বোধ হইবে। এগুলি পাকিলেও বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কাঁচা অবস্থায় বুঝিয়া বুঝিয়া পাড়িয়া ৫।৬ দিন ঘরে রাখিলে ঈষৎ হলদে আভা উপরে ফুটিয়া

উঠে, ঠিক এই সময় ইহা খাইলে ইহার প্রকৃত গুণ বোঝা যায়। এগুলি জ্যৈষ্ঠের শেষে পাকে।

কহিতুর—এই ফলগুলি খুব বড় হইয়া থাকে। এক একটীর ওজন প্রায় /৸৹ পোয়া পর্য্যন্ত হয়। ইহাও আঁশ-শূন্য, সুমিষ্ট, অতি উৎকৃষ্ট ফল। মুর্শিদাবাদের আম্রের মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

আলিবকস্ এগুলির ওজন প্রায় /৷৷৹ সের পর্য্যন্ত হয়। আঁশশূন্য, অম্ল মধুর রসযুক্ত ফল। এ ফলগুলি অত্যন্ত রসাল। আষাঢ় মাসে পাকে।

আনারসি—এগুলি ওজনে প্রায় /৷৷৹ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাকা ফলে আনারসের গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া এগুলিকে আনারসি বলা হয়। ফলগুলি সুমিষ্ট ও আঁশশূন্য।

পেয়ারাফুলি—এই আম তত বড় হয় না। ঈষৎ আঁশযুক্ত অতি সুমিষ্ট ফল। কাঁচা অবস্থাতেও এগুলি বিশেষ অম্লাক্ত বোধ হয় না। বৈশাখ মাসে পাকে।

ফজলী—খুব বড় ফল। মালদহের অতি প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট আম্র। এক একটীর ওজন প্রায় /২ সের পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। খাইতে অতি সুমিষ্ট। ঈষৎ আঁশযুক্ত, পাকিলে বেশী দিন ঘরে রাখা চলে না। এগুলি সাদা, কাল, লাল প্রভৃতি নানাবর্ণের দেখা

যায়। তবে কাল ফজলীই স্বাদে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রাবণ মাসে পাকিয়া থাকে।

দুধিয়া—এই ফলের বৈশিষ্ট্য এই যে, পাকিলে ইহার ভিতরের বর্ণ সাদা থাকে। আকারে ক্ষুদ্র, অল্প আঁশযুক্ত সুমিষ্ট ফল। দুগ্ধে খাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বৈশাখে পাকে।

তোতাপুরী—মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ আম। এগুলি পাকিলে বড়ই সুন্দর দেখায়। কাঁচা সোণার মত বর্ণের উপর ঈষৎ লালাভা থাকে। ফলগুলি আকারে বেশ বড় হয়। এক একটীর ওজন /।৶০ হইতে /॥০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফলগুলি একটু লম্বা ধরণের এবং নাসিকাযুক্ত। সামান্য আঁশ আছে, কিন্তু খাইতে বেশ সুমিষ্ট। আষাঢ় মাসে পাকে।

আলফানসো—উৎকৃষ্ট বোম্বাই আম্র। আকারে খুব বড়। প্রায় /১॥০ সের পর্য্যন্ত ওজনে হইয়া থাকে। এই আমের খোসা খুব পুরু, বোঁটাগুলি বিশেষ দুর্ব্বল। একটু নাড়া পাইলেই পড়িয়া যায়। খাইতে খুব উৎকৃষ্ট, জ্যৈষ্ঠের শেষে পাকে।

ভূতো বোম্বাই—এগুলির আকার তত বড় হয় না। এক একটীর ওজন কিঞ্চিদধিক /।০ পোয়া। সুমিষ্ট আঁশহীন ফল। বৈশাখে পাকে।

অমৃতভোগ—ফলগুলি আকারে বড়, খোসা পাতলা। বেশ সুমিষ্ট, আঁশহীন উৎকৃষ্ট ফল। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

কাঁচামিঠা—কাঁচা অবস্থায় খাইতে মিষ্ট। পাকিলে স্বাদ বিকৃত হয়।

জালিবান্ধা—খুব বড় ফল। প্রায় /২ সের পর্য্যন্ত ওজনে হয়। এই ফলের নাসিকা আছে। বেশ সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট ফল। শ্রাবণ মাসে পাকে।

গোপালভোগ—বিশেষ উৎকৃষ্ট ফল। ওজনে /।০ পোয়া হইতে /।৵০ পোয়া পর্য্যন্ত হয়। বেশ সুমিষ্ট, আঁশশূন্য। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

ক্ষীরসাপাতি—এগুলি ঈষৎ লম্বা ধরণের নাসিকাযুক্ত ফল, আঁশহীন, সুমিষ্ট। ওজনে /।০ পোয়া হইতে /।৵০ পোয়া পর্য্যন্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

ল্যাংড়া—বেশ বড়, আঁশশূন্য, অম্ল মধুর স্বাদযুক্ত উৎকৃষ্ট ফল। এক একটীর ওজন /।৵০ হইতে /॥০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এগুলির আকার অনেকটা লম্বা ধরণের। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

লতানে—ছোট ফল, প্রচুর ফলে। গাছগুলি ঠিক লতার মত নহে। কতকটা ঝোপের মত। ফলের স্বাদ মিষ্ট, শ্রাবণ মাসে পাকে।

বৃন্দাবনী—ফলের আকার ক্ষুদ্র। পাকিলেও সবুজ থাকে। খাইতে বেশ মিষ্ট ও সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

মোহনভোগ—এই ফলগুলি আকারে বড় হইয়া থাকে। ফলে আঁশ নাই। খাইতে বেশ সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

হিমসাগর— ফলগুলির আকার বড়। খাইতে বেশ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। আষাঢ় মাসে পাকে।

চালতা-খাস—এগুলি দেখিতে অনেকটা চালতার মত। বেশ বড় ফল। পাকিলে কাঁচা সোণার মত রং ধরে। খাইতে সুস্বাদু। আষাঢ়ে পাকে।

আঙ্গুর। (Grape)

আঙ্গুর লতানে ফলকর গাছ। ইহা শীতপ্রধান দেশেই উত্তম জন্মে। আফগানিস্থান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ইহার প্রভূত আবাদ হয়। কাবুল হইতে প্রচুর আঙ্গুর, ভারতের বিভিন্ন স্থানে চালান হইয়া আসে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইলেও, স্থানে স্থানে ইহা বেশ ভালই জন্মে। ভারতের শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে, ইহার যথেষ্ট আবাদ হয়। অন্যান্য স্থানে জন্মিলেও, কাবুলী আঙ্গুরের মত ইহা তত উৎকৃষ্ট হয় না। বাঙ্গলা দেশে, নিম্নবঙ্গ ব্যতীত পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের অনেক স্থানে ইহা বেশ ভালই জন্মে। ফলগুলি অবশ্য কিছু

টক্‌রসবিশিষ্ট হয়। তবে, উপযুক্ত সার প্রয়োগ ও প্রকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করিতে পারিলে, ইহা বেশ সুমিষ্ট ফলে পরিণত হইতে পারে।

দোআঁশ উচু জমি আঙ্গুর ক্ষেত্রের উপযুক্ত। এঁটেল প্রকৃতির মৃত্তিকা বা নাবাল জমিতে ইহা মোটেই ভাল হয় না। এই সমস্ত জমিতে যথেষ্ট সার প্রয়োগ করিতে হয়। মাটি বেশ ভালরূপে কর্ষণ করিয়া, তাহার সঙ্গে সার মিশ্রিত করিবেন। পুরাতন গোময়-সার, খৈলসার, হাড়ের গুঁড়া, আবর্জ্জনা-পচা সার ইত্যাদি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে দিলে, উত্তম হয়। ইহা ছাড়া, জীবের মৃতদেহ, রক্ত, মাছ ইত্যাদি ভালরূপে পচাইয়া, শেষে প্রয়োগ করিবেন। শেষোক্ত সারগুলি গাছকে তেজাল করে এবং ফলপ্রসবিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। যে আঙ্গুর গাছে ফল হয় না, সেই গাছ সময়-মত ছাঁটিয়া এই সার প্রয়োগ করিলে, খুব সুফল পাওয়া যায়। আঙ্গুরের ক্ষেত্রে, জল খুব বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ জন্য, ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র নালা থাকিলে সুবিধা হয়, কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে ওই সব নালা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত—নতুবা অতিরিক্ত জল সঞ্চয়ে গাছ নষ্ট হইয়া যাইবে।

আঙ্গুরের বীজ হইতে চারা হয়। কিন্তু কলমের চারাই উৎকৃষ্ট। ডাল-কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। এক বৎসরের পুরাতন শাখাই ডাল-কলমের উপযুক্ত।

অধিক পুরাতন শাখা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং নূতন শাখাও স্বাভাবিক অতিরিক্ত কোমলতার জন্য অনুপযুক্ত। অর্দ্ধপক্ক ১ বৎসরের পুরাতন শাখাই সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। যে ডালটীকে কলমের জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, তাহা যেন নীরোগ, সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান্ হয়। এই ডালখানার সুস্থতা ও অসুস্থতার উপরে কলমটীর সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ডালখানি খণ্ড খণ্ড করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন প্রত্যেক খণ্ডে ২।৩টী চোখ থাকে। চোখ বা গাঁটশূন্য খণ্ডে শিকড় উদ্গত হইবে না। ঐ চোখই কলমের জীবন। আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথম ভাগেই কলম প্রস্তুত করিতে হয়। যে স্থানে হাপোর প্রস্তুত হইবে, সেই স্থান অপেক্ষাকৃত ছায়াযুক্ত হওয়া দরকার। নতুবা অতিরিক্ত রৌদ্রে কলম শুকাইয়া যাইবে। হাপোরের মৃত্তিকা বেশ সরস ও হালকা হইবে। ঐ মাটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ বালি মিশাইয়া লইলে আরও ভাল হয়। হাপোরে ৮।৯ ইঞ্চি অন্তর এক একটী কলম বসাইয়া যাইবেন। শিকড় উদ্গত হইয়া, কলমগুলি পত্র-শোভিত হইলে, স্থানান্তরিত করিয়া অন্য হাপোরে বসাইবেন। এক বৎসর কাল উহাকে প্রতিপালন করিয়া, শেষে জমিতে স্থায়িভাবে বসাইবেন।

আঙ্গুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমির মাটি, গভীররূপে কর্ষণ করিয়া গুঁড়া করিয়া দিবেন। পূর্ব্বলিখিত মতে মাটির সঙ্গে সার মিশ্রিত করিয়া, ১০।১২ হাত অন্তর এক একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া যাইবেন। তার পর, প্রত্যেক মাদায় একটী করিয়া

কলম বসাইবেন। আঙ্গুর লতানে গাছ। লাউ কুমড়ার মত ইহাদেরও মাচা বাঁধিয়া দেওয়া এবং মাচায় উঠিবার জন্য বাঁশের বা কঞ্চির অবলম্বন দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছটী মাচার উপরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিলে, মাচার নিম্নস্থ কাণ্ডাংশে যদি কোন ডালপালা থাকে, তবে তাহা কাটিয়া দিবেন। উহাতে উপরের লতাগুলির তেজ বৃদ্ধি পায় এবং কাণ্ড অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। মাচায় যদি লতাগুলি পরস্পর জড়াইয়া যায়, তবে সেগুলিকে পৃথক্ করিয়া দিবেন। সে জন্য আবশ্যক হইলে, কতকগুলি অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা ছাঁটিয়া বাদ দিয়া দিবেন। মোট কথা, লতাগুলি পরস্পর জড়াইয়া থাকিলে, ফল প্রসবে বাধা জন্মিতে পারে।

প্রত্যেক বৎসর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া, শিকড়গুলিকে মুক্ত আলো-বাতাসের সংস্পর্শে আনিতে হইবে। দুই সপ্তাহ কাল গোড়াগুলি অনাবৃত রাখিবেন। তাহাতে পুরাতন পাতাগুলি স্বভাবতঃই ঝরিয়া পড়িবে। তখন দুর্ব্বল শাখা-প্রশাখা-গুলিকে কাটিয়া বাদ দিবেন এবং ফলপ্রসবিনী অন্যান্য পুরাতন ডালগুলিও অল্পবিস্তর ছাঁটিয়া দিবেন। নবোদ্গত ডাল-গুলি একেবারে কাটিয়া বাদ দিবেন। পুরাতন শাখাগুলি ছাঁটিবার সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন প্রত্যেকটী ডালে অন্ততঃ পক্ষে ২।৩টী করিয়া চোখ অবশিষ্ট থাকে। এই চোখ হইতেই নূতন শাখা পল্লবের সৃষ্টি হইবে। এই ছাঁটাই পদ্ধতির সাফল্যের উপর, গাছের ফলাফল নির্ভর করে।

সুতরাং বিশেষ বিবেচনার সহিত এই কার্য্যটী করিবেন। পৌষ মাস, এই গাছের পক্ষে, এই সব কার্য্যের প্রশস্ত কাল। কোন গাছ, যদি কোন কারণবশতঃ ফল প্রসবে অক্ষম হয়, তবে তাহাকে খুব বেশী করিয়া ছাঁটিয়া দিবেন। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র কাণ্ডটী ও দুএকটী মূল শাখার ২।৩টী গ্রন্থি রাখিয়া অন্য সবগুলি কাটিয়া বাদ দিবেন। ইতিমধ্যে, গাছের গোড়ায় পূর্ব্বোক্ত সার প্রয়োগ করিয়া রাখিবেন। এইরূপ ক্রিয়ার ফলে, বহু দিনের অফলা গাছেও ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে, আঙ্গুরগুলি সাধারণতঃ অম্লরসযুক্ত হয়, উহাদের গোড়ায় প্রাণিজ পচাসার, পচা রক্ত ও পাথুরে চূণ প্রয়োগে, ফলে মিষ্টত্ব জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

গাছ যতই পুরাতন হইবে, ততই ইহার পুরাতন শাখাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা, শাখা-প্রশাখায় ফল জন্মিতে বাধা পায়। আর একই শাখায় বার বার ফল হইলে, সেই শাখার ফল, স্বভাবতঃই ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে থাকে। এ জন্য, ফলপ্রসবিনী পুরাতন শাখাগুলি, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শাখা-প্রশাখার অতিরিক্ত ভার বহন করিতে না হইলে, অল্পসংখ্যক শাখায় উৎপন্ন ফল, আকারে বড় হইতে থাকে। মূল শাখাগুলি পুরাতন হইলেও কখন কাটিবেন না। ঐগুলি চির অক্ষত রাখিতে হইবে। উহারাই, অন্যান্য যাবতীয় শাখা-প্রশাখার আধারস্বরূপ। আধার কখনও নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে।

ফাল্গুন মাস হইতে আঙ্গুর গাছ ফলিতে আরম্ভ করে এবং জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ফলগুলি পাকিতে থাকে। এক একটী আঙ্গুর গাছে অপর্য্যাপ্ত ফলন হয়। কাঁচা অবস্থায়, ইহার রস অম্ল থাকে, পাকিলে বেশ সুমিষ্ট হয়। সর্দ্দিময় আব-হাওয়ায় আঙ্গুর ভালরূপ পাকিতে পারে না এবং উহার ভিতরে মিষ্টত্বও ততটা জন্মিতে পারে না। বাঙ্গলা দেশের জল বায়ু এই প্রকৃতির। এই জন্যই, এ স্থানের আঙ্গুরে তাদৃশ মিষ্টতা জন্মিতে পারে না। অবশ্য ইহার মূলে মৃত্তিকাজাত দোষও আছে। চেষ্টা ও যত্ন করিলে এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিতে পারিলে, শীতপ্রধান দেশের মত অত্যুৎকৃষ্ট না হইলেও, মোটামূটী চলন-সই আঙ্গুর, এ দেশে জন্মান যায় সন্দেহ নাই।

আঙ্গুর গাছ খুব দীর্ঘজীবী। এই গাছ সহজে মরে না। তাহা হইলেও, খুব বেশী পুরাতন গাছ ক্ষেত্রে রাখা উচিত নয়। বেশী পুরাতন হইয়া গেলে, গাছের শক্তি হ্রাস পায় এবং ফল-নের সংখ্যা কমিতে থাকে ও ফলগুলি নিকৃষ্ট হইতে থাকে। এই গাছের ফলোৎপাদিকা শক্তি লক্ষ্য করিয়া, তদনুযায়ী পুরাতন গাছ উৎপাটিত করিয়া, তৎস্থলে নূতন গাছ লাগান আবশ্যক। তবে, গাছে যে পর্য্যন্ত ফলন ও ফল উত্তমরূপে পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত সযত্নে উহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

আঙ্গুরের রস খুব বলকারক। রোগবিশেষে ইহা পীড়িত ব্যক্তির পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

আতা। (Custard Apple)

সুমিষ্ট, মুখরোচক সুস্বাদু ফলের ভিতরে আতা অন্যতম। বাঙ্গলা দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বনে জঙ্গলেও এই গাছ অনেক দেখা যায়।

আতার কলম করা যায় বটে, কিন্তু কলমের চারা অপেক্ষা বীজের চারাই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কলমে প্রস্তুত আতার চারা, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং অনেক সময়ে ফলধারণেও অক্ষম হয়। এই জন্য ইহার বীজের চারাই সমধিক প্রচলিত। হাপোরে বীজ ছড়াইয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, চারাগুলি যখন একটু বড় হইয়া উঠিবে, তখন অন্য হাপোরে, অপেক্ষাকৃত পাতলা করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। এই ভাবে বৎসর কাল পালন করিয়া, পরে নির্দ্দিষ্ট জমিতে স্থায়িভাবে বসাইবেন। চারা প্রস্তুত করিবার উত্তম সময় বর্ষাকাল।

দোআঁশ মাটি আতার পক্ষে প্রশস্ত। জমিতে ৯।১০ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে এক একটী চারা বসাইয়া যাইবেন এবং মাটির সঙ্গে পচা গোবরসার মিশ্রিত করিয়া গোড়া চাপা দিবেন। তার পর, প্রয়োজন বোধে জল-সেচন, আগাছা নিড়ান প্রভৃতি করিতে হয়। শীতকালে গাছের গোড়ায় কিঞ্চিৎ চূণ, রাবিশ ও পচা গোবর-সার মিশ্রিত করিয়া, প্রয়োগ করিলে ফল ভাল হয়।

এই গাছ খুব দ্রুত বর্দ্ধনশীল। ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই এই গাছ মুকুলিত হয়। এই ফলগুলি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ফলগুলির গাত্রদেশ খাঁজকাটা বন্ধুর। ভিতরে শাঁস অতি কোমল, এই শাঁস আবার কতকগুলি কোয়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক কোয়ার ভিতরে একটী করিয়া কাল বর্ণের বীচি থাকে। সুপক্ক আতার বীচি হইতেই উত্তম চারা প্রস্তুত হয়।

কাক, কাঠবিড়াল প্রভৃতি পাকা আতার ভয়ানক শত্রু। সময়ে সাবধান না হইলে বিস্তর ফল ইহাদের দ্বারা নষ্ট হয়। এই জন্য ফল পাকিতে আরম্ভ করিলেই জাল দিয়া গাছটী ঢাকিয়া দিতে হয়।

সহর অঞ্চলে আতা বেশ দামে বিক্রয় হয়। ইহার চাষে বিশেষ কোন খরচ নাই—অথবা এ জন্য বিশেষ বেগ পাইতেও হয় না। কলিকাতায় বাহির হইতে বিস্তর আতা আমদানী হইয়া থাকে। মুখরোচক ফল হিসাবে বাজারে আতার চাহিদা নিতান্ত কম নহে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আতা রক্তবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। দাহ, তৃষ্ণা, রক্তদুষ্টি, বাতপিত্ত ও বমন রোগে ইহা খুব উপকারী।

———

আমড়া। (Hog Plum)

(দেশী)

আমড়া আমাদের দেশের অতি সাধারণ ফল। ইহা পল্লীর আনাচে কোনাচে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলেও ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে এই ফলেরও উন্নতি সাধিত হইতে পারে। টক্‌জাতীয় খাদ্যের জন্য আমড়া একটী বিশেষ আবশ্যকীয় ফল সন্দেহ নাই। কচি আমড়ার অম্বল অতি উপাদেয় এবং উপকারী। সহর অঞ্চলে ইহার বাজারে রীতিমত ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

বীজ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয়। গুটী কলমেও ইহার চারা প্রস্তুত হইতে পারে। আবার ডাল-কলমেও তৈরী হয়। যাহা হউক, বর্ষাকালে এই চারা প্রস্তুত করা উচিত। চারা প্রস্তুত হইলে পর কিছু দিন হাপোরে প্রতিপালন করিয়া পরে জমিতে স্থায়িভাবে লাগাইবেন। ইহার জন্য বিশেষ কিছু তদ্বিরাদির আবশ্যাক হয় না।

সাধারণতঃ ৫।৬ বৎসরে আমড়া গাছ ফলিতে আরম্ভ করে। শীতকালে ইহাদের সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায় এবং ঐ অবস্থাতেই গাছ মুকুলিত হয়। পৌষ মাসেই সাধারণতঃ গাছে মুকুল দেখা দেয়। তারপর গাছে আবার নূতন পাতা গজায়। বৈশাখ মাস হইতে গাছে ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসে ফল পাকিতে থাকে।

আমড়া গাছে বিশেষ কোন সার না দিলেও চলে। তবে শীত অন্তে গোড়া খুঁড়িয়া মূলে রৌদ্র ও বাতাস কিছু দিন লাগাইয়া, শেষে পলিমাটী ও গোবর-সার মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ গোড়া চাপা দিতে হয়।

পাকা আমড়ায় টক্‌রস অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কাঁচা পাকা উভয়বিধ অবস্থাতেই আমড়া ব্যবহার করা চলে।

(বিলাতী)

বিলাতী আমড়া আমাদের দেশীয় ফল নহে। আজকাল এ দেশে উহার প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতী আমড়ার টক্-চাটনী বেশ মুখরোচক।

বীজ হইতে ইহার চারা প্রস্তুত হয়। কলমে ইহার চারা ভাল হয় না। বীজ হইতে চারা তৈরী করাই উত্তম। হাপোরে বর্ষাকালে বীজ বপন করিতে হয়। শেষে অঙ্কুরিত হইলে যথারীতি পালন কবিয়া, আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস মধ্যে স্থায়িভাবে রোপণ করিতে হয়। ১০।১২ হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়।

দেশী আমড়ার মত ইহারও বিশেষ কোন তদ্বির করিতে হয় না। গোড়ায় কোন আগাছা না জন্মে, তাহা লক্ষ্য করা উচিত এবং মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি আলগা করিয়া দেশী আমড়ার মতই সার প্রয়োগ করিতে হয়।

বিলাতী আমড়া সুপক্ক হইলে অতি ঘ্রাণবিশিষ্ট হয়।

কাঁঠাল। (Jack Fruit)

কাঁঠাল ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার, একটী সহজপ্রাপ্য, ?মিষ্ট রসাল ফল। আমাদের দেশে উৎপন্ন যাবতীয় ফলের ধ্যে, ইহাই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারত ব্যতীত ালক্কাস দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহলে ইহা প্রভূত পরিমাণে জন্মে।

ফলকর হিসাবে ইহার চাষ করিতে হইলে, ২০।২৫ হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ রোপণ করিতে হয়। এই গাছ খুব বড় হইয়া থাকে। এই জন্য, উপযুক্ত ব্যবধান না রাখিলে, ইহার শাখা-প্রশাখা প্রয়োজন মত বাড়িতে পারে না এবং আশানুরূপ ফল প্রদানেও সক্ষম হয় না।

ইহার বীজ বপন করিয়া, চারা প্রস্তুতের প্রশস্ত সময় বর্ষা-কাল। অত্যন্ত কাঠফাটা রৌদ্র না হইলে, এই ফল সাধারণতঃ পাকে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, অত্যন্ত গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে, এই ফল পাকিতে থাকে। তখনই বীজ সংগ্রহ করিয়া, সত্বর বপন করিতে হয়। এই বীজের জীবনী শক্তি অল্পকাল-স্থায়ী। বেশী দিন ঘরে রাখিয়া দিলে, ইহার জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। এই জন্যই, বর্ষাকালে এই বীজ রোপণ করা বিধেয়। কাঁঠালের কলম হয় না। তবে কাণ্ড হইতে একটু ছাল সমেত সুপুষ্ট ফেঁকড়ী তুলিয়া, হাপোরে পালন করিলে, চারা প্রস্তুত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে, ফেঁকড়ীটী অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মোটা হওয়া আবশ্যক।

কাঁঠালের কোয়ার ভিতরে যে বীজ থাকে, তাহার প্রত্যেকটী দিয়া এক একটী গাছ প্রস্তুত করা চলে, আবার সম্পূর্ণ একটী কাঁঠাল বপন করিয়া একটী গাছ তৈরী করাও চলে। এই শেষোক্ত প্রকারের গাছ খুব তেজাল হয় এবং প্রচুর ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই ভাবে একটী কাঁঠাল বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, ফলটী বেশ সুপক্ক হওয়া প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে, ফলটীর আয়তন অনুযায়ী একটী বড় গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতরে কাঁঠালটী পুঁতিয়া দিতে হয়। কাঁঠালের বোঁটাটী কিন্তু গর্ত্তের উপরে থাকিবে। এই সময় শৃগাল যাহাতে পাকা কাঁঠালের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, উহা তুলিয়া ফেলিতে না পারে, তজ্জন্য অস্থায়িভাবে তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া রাখিবেন। ১৫।১৬ দিন পরে যখন কাঁঠালটী পচিয়া যাইবে, তখন ঐ বোঁটাটী ধরিয়া, আস্তে আস্তে ভূতিটী টানিয়া তুলিবেন। ভূতিটী উঠিয়া গেলে ভিতরে যে ফাঁক হইবে, ঐ ফাঁক দিয়া সমস্তগুলি বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকিবে, উপরে উঠিলে সমস্ত চারা একত্র করিয়া কলার ছোটা বা পাট দিয়া বেশ ভালরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবেন। চারাগুলি পরস্পর দৃঢ়-সংলগ্ন থাকায় ক্রমে সবগুলি এক হইয়া একটী পুষ্ট কাণ্ডে পরিণত হইবে।

কাঁঠালের কাঠ বেশ মূল্যবান্। উহা হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র প্রস্তুত হয়। এ জন্য উহার কাণ্ড

যতই সরল হইবে, ততই ভাল। কাণ্ডকে সরল করিবার জন্য একটী বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। বীজটী মাটিতে বপন করিয়া, একটী লম্বা ফাঁপাল বাঁশের চোঙ দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। চোঙটী দুই তিন হাত লম্বা হওয়া দরকার। ঐ চোঙ ভেদ করিয়া চারার মাথা যখন উপরে জাগিয়া উঠিবে, তখন সাবধানে চোঙটী তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভাবে প্রস্তুত করিলে চারার গতি ঊর্দ্ধদিকে সরল ভাবে থাকে, কাণ্ড কোনরূপে বাঁকা হইতে পারে না। বীজ বপন করিবার সময় কাঁঠালের কিছু ভুতুড়ি সমেত বপন করিলে ভাল হয়। কারণ, ঐ ভুতুড়ি উহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার।

৫।৬ বৎসরের মধ্যেই কাঁঠাল ফলিতে আরম্ভ করে। তবে এই সময়ে উহাকে ফলিতে না দিয়া, ফুল আসিলেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৎসর হইতে প্রচুর ফলন পাওয়া যায়। যে কোন গাছ হউক না কেন, অল্প বয়সে ফলিতে দিলে, উহারা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কাজেই যদি প্রথম বৎসরের ফলপ্রসবিনী শক্তিকে বাধা দিয়া বৃক্ষদেহের পরিপোষণের দিকে পরিচালিত করা যায়, তবে সে পরের বৎসর দ্বিগুণ তেজে ফল দানে সক্ষম হয় এবং বয়স ক্রমেই পরিণত হওয়ার ফলে ঐ শক্তি অব্যাহত থাকে।

শরতের শেষে বা হেমন্তের প্রথম ভাগে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই ফলোন্মুখী কাঁঠালের পরিচর্য্যা আরম্ভ করিতে হয়। এই সময়ে গাছের গোড়া বিস্তৃত ভাবে খনন করিয়া

গোয়ালের আবর্জ্জনা-পচা, খৈলসার ইত্যাদি নূতন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গোড়ায় প্রয়োগ করিতে হয়। গাছের তেজের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে সারের মাত্রার পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। গাছ আপনা হইতেই বেশ তেজাল দেখিলে আদৌ সার প্রয়োগ করিবেন না। গোড়া খুঁড়িয়া নূতন মাটি দিবার সময় মাটি বেশ ভালরূপে গুঁড়া করিয়া তার পর সার মিশ্রিত করিবেন।

কাঁঠাল গাছে শীতের প্রথম হইতেই ফুল ধরিতে আরম্ভ করে। ফাল্গুনের শেষ হইতেই প্রচুর কাঁচা কাঁঠাল বাজারে আমদানী হয়। কাঁচা কাঁঠাল হইতে উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহাকে চলিত কথায় এঁচোড় বলে। বৈশাখ মাস হইতে কাঁঠাল পাকিতে আরম্ভ করে। সুপক্ক কাঁঠাল অতি সৌরভ-ময়। এই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে শৃগাল কাঁঠাল ভক্ষণের জন্য আসিয়া থাকে। অন্যান্য গাছের মত ইহার ফল শুধু শাখাতেই হয় না--কাণ্ডে, এমন কি, মাটির নীচে মূল-দেশে পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। কাজেই শৃগাল বা চোরের পক্ষে কাঁঠাল অপহরণ করা মোটেই আয়াসসাধ্য নহে। মাটির নীচে যে ফল হয়, তাহা পাকিবার পূর্ব্বে জানা যায় না। পাকিলেই উহার উপরকার মাটি ফাটিয়া যায় এবং সদ্গন্ধ বাহির হয়। তখন সাবধানে মাটি খুঁড়িয়া উহা বাহির করিয়া লইতে হয়। স্বাদে ও গন্ধে এই কাঁঠাল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কাঁঠাল আবার দুই রকম হইয়া থাকে।—একরূপ কাঁঠা-

লের কোয়াগুলি বেশ শক্ত, চিবাইয়া খাইতে হয়। এগুলিকে খাজা কাঁঠাল বলে। অপর জাতীয়ের কোয়াগুলি অতি কোমল, মোলায়েম এবং খুব রসাল। ইহাকে নোয়া কাঁঠাল বলে। এই কোয়াগুলিকে নিষ্পিষ্ট করিলে বেশ ঘন রস বাহির হয়। ঐ রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে অতি উপাদেয়।

কাঁঠাল অত্যন্ত গুরুপাক ও পুষ্টিকর ফল। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা হজম করা প্রায়শঃই দুষ্কর হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা খাইয়া হজম করিতে পারিলে দেহে যে বিশেষ বলাধান হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সহ্যানুযায়ী ইহা খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত খাইলে পেটের পীড়ার সৃষ্টি হইতে পারে।

কাঁঠালের বীচিও অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহা শুকাইয়া রাখিলে তরকারীরূপে ব্যবহার করা যায়। ইহা গুঁড়া করিয়া এক প্রকার ময়দা তৈরী করিয়া, তদ্দ্বারা পিষ্টক, পায়স ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য তৈরী হয়। ইহাও খুব পুষ্টিকর। কাঁঠাল-বীচি পোড়া, ভাতে ইত্যাদিও মুখরোচক। ইহার ময়দা হইতে প্রস্তুত রুটী রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কাঁঠাল গাছের নানারূপ শত্রু আছে। এক প্রকার পতঙ্গ-জাতীয় কীট উহার কাণ্ড ভেদ করিয়া ভিতরে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং ক্রমে ভিতর হইতে কুরিয়া খাইয়া সমস্ত কাণ্ডটাকে ফাঁপাল করিয়া ফেলে। এই কীট বৃক্ষদেহে প্রবেশ করিলেই

এক প্রকার লালাভ আঠা বাহির হয়। উহা দেখিলেই বুঝিবেন, ভিতরে কীট প্রবেশ করিয়াছে। তখনই ঐ ক্ষতমুখ একটু বড় করিয়া, পিচকারী দিয়া গরম জল ভিতরে ছিটাইয়া দিবেন। তাহাতে পোকা মরিয়া যাইবে। কিন্তু উহারা একবার অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে পারিলে উহাদের বিনাশ করা প্রায়ই সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। এই কীটের আক্রমণে গাছ প্রায়ই মারা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, ফলগুলি বড় হইলেই ফাটিতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ গাছে অতিরিক্ত তেজ সঞ্চয়। তখন উহার তেজ হ্রাস করিবার জন্য গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েকটী বাজে শিকড় কাটিয়া দিতে হয়। অবশ্য বর্ষাকালে এই প্রথা অবলম্বন করিলে গাছের গোড়ায় জল জমিয়া গাছ মারা যাইতে পারে। কাজেই বর্ষাকালে এরূপ করিবেন না। এ সময়ে বরং গাছের কাণ্ডে ও মোটা মোটা শাখায় স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাত করিবেন। তাহাতে অনেক রস নিঃসৃত হইয়া গাছের অতিবৃদ্ধিকে সংযত করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে এঁচোড় বায়ুবর্দ্ধক, গুরুপাক, কফ ও মেদবর্দ্ধক। পাকা কাঁঠাল পুষ্টিকর, গুরুপাক, মাংসবর্দ্ধক, বায়ুপিত্তনাশক। কাঁঠালের বীচি খুব পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু গুরুপাক ও মলরেচক।

———

কলা। (Banana)

কলা ভারতের নিজস্ব ফল। ভারত এবং ভারতমহাসাগরস্থ কতিপয় দ্বীপ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। ভারতের যাবতীয় ফলের মধ্যে কলার মত পুষ্টিকর উপাদেয় ফল আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে বনে জঙ্গলে আপনা হইতেই এই গাছ প্রচুর জন্মে; কিন্তু তাহা মানুষের পক্ষে অখাদ্য। সাধারণতঃ বন্য পশু পক্ষী ঐগুলি খাইয়া থাকে। পূর্ব্ব-হিমালয় এবং বিহার, আসাম ও মণিপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বনজ কদলী দেখিতে পাওয়া যায়। উন্নত প্রণালীতে চাষের ফলে ইহাই যে মানবের প্রিয় খাদ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশে কলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বিনা চেষ্টায় এবং বিনা যত্নে পল্লীর আনাচে কানাচেও ইহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অযত্ন-সম্ভূত গাছের ফল তাদৃশ সুস্বাদু হয় না। অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জাতীয় কদলীও বীজপূর্ণ নিকৃষ্ট-শ্রেণীর কদলীতে পরিণত হয়। বিশেষ যত্নের সহিত আবাদ করিতে পারিলে ইহা দ্বারা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে। আজকাল ইউরোপে কলা, আম প্রভৃতি চালান দেওয়া একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। ইউরোপীয়গণ

কলার খুব ভক্ত। কিন্তু ইউরোপের জল বায়ুতে এ গাছ জন্মে না।

কলাগাছ সম্বন্ধে বিদুষী খনাদেবী বলিয়া গিয়াছেন,--

"তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে।
থাকগে চাষী ঘরে শুয়ে॥
তোলো গেঁড়, না কেটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥"

এই উক্তির মর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একটী ছোটখাট গৃহস্থের ৩৬০ ঝাড় কলা থাকিলে, তাহার আয় হইতেই সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। মৃত গাছের গেঁড় তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং গাছের পাতা কখনও কাটিবে না; তাহা হইলেই গাছগুলি সুস্থ সবল থাকিয়া দীর্ঘকাল উৎকৃষ্ট ফলদান করিবে।

আমাদের দেশে হিন্দুমতে এমন কোন পর্ব্ব নাই, যাহাতে কলা আবশ্যক হয় না। মাত্র /৫টী পয়সা খরচ করিয়া কোন পূজা করিতে হইলেও, ৫ পয়সার কলা তন্মধ্যে প্রধান উপকরণ হইবে। ইহা ছাড়া ভোগের জন্য, কত কলাই যে নিত্য ব্যবহৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান ও খাদ্য-প্রাণ নিহিত আছে। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, তৃষ্ণানাশক এবং শরীরের ক্ষয়পূরক। কিন্তু ইহা গুরুপাক বলিয়া অত্যধিক খাওয়া ঠিক নহে। সহ্যানুযায়ী নিয়মিত ভক্ষণে ইহা দেহের শক্তি বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই।

কলাগাছের পক্ষে সরস জমি আবশ্যক। কিন্তু সে জন্য ভিজা স্যাঁতসেঁতে নিম্নভূমি ইহার পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। নিম্নভূমিতে সাধারণতঃ বর্ষার জল দাঁড়ায়। কলা-গাছের গোড়ায় জল জমিলে গোড়া পচিয়া যাইবে। পলি মাটিতে খুব ভাল কলা জন্মে। উত্তরবঙ্গে একরূপ লাল মাটি আছে, উহা শুষ্ক হইলে ইষ্টকের মত ভয়ানক শক্ত হয়। এই মাটি কলা চাষের উপযোগী নহে। নীরস অনুর্ব্বরা জমিকে সরস করিবার জন্য প্রথমে কলাগাছ রোপণের বিধি আছে। কিন্তু কলার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে জমি নির্ব্বাচন করিতে হইলে কখনও নীরস জমি নির্ব্বাচন করা যুক্তিযুক্ত নহে। কলা গাছ জমিকে সরস রাখে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের শক্তির অপচয় ঘটে। আপন শক্তি পরি-চালিত করিয়া সে অপরের জন্য জমি প্রস্তুত করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই জমিতে, সে নিজের প্রয়োজন বেশী দিন মিটাইতে পারে না, সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জন্যই সরস উর্ব্বরা জমি, কলা চাষের জন্য নির্ব্বাচন করা দরকার। নিজ দেহ পরিপোষণের জন্য, নীরস জমিতে তাহাকে অধিক শক্তি নিয়োগ করিতে হয়। কাজে কাজেই, উৎকৃষ্ট ফল-ধারণ করা, তাহার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়া উঠে না। কিন্তু জমি যদি আপনা হইতেই উর্ব্বরা এবং সরস হয়, তবে তাহার শক্তি নিজ শরীরে সঞ্চিত থাকে এবং সে উৎকৃষ্টতর ফল ধারণে সক্ষম হয়। বর্ষার জল দাঁড়াইতে না পারে, এই-

রূপ ভাবে অপেক্ষাকৃত ঢালু প্রকৃতির জমি হইলে ভাল হয়। জল নিকাশের জন্য জমির সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় নালার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

কদলী রোপণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি—নূতন কাটা পুষ্করিণীর পাড়। এই মাটি নূতন এবং অপেক্ষাকৃত সরস। মৃত্তিকার বহু নিম্নস্তর হইতে উত্থিত বলিয়া, ইহার ভিতরে যথেষ্ট টাটকা উদ্ভিদ-খাদ্য নিহিত থাকে। এই জন্য পুকুর-পাড়ের কলাগাছ খুব ভাল হয় এবং উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। পুকুর-পাড় না হইলেও, নির্ব্বাচিত জমি কয়েকবার উত্তমরূপে চাষ দিয়া, আগাছা ইত্যাদি তুলিয়া ফেলিয়া, উপরিভাগে পুকুর বা ডোবার মাটি ছড়াইয়া দিলেও ভাল হয়। পুকুর বা কোন জলাশয়ের তীরে কলাগাছ ভাল হইবার আরও একটী কারণ এই যে, ঐ মৃত্তিকা সব সময়েই আর্দ্র থাকে, উহাতে রসাভাব কখনও ঘটে না। মৃত্তিকা হইতে কলা খুব বেশী পরিমাণে রস গ্রহণ করিয়া থাকে। কলাগাছের সমস্ত দেহে জলীয় অংশই প্রধান। গেঁড়, কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফল, সমস্তই জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। দেহের এই জলীয় ভাব পরিপোষণের জন্য তাহার প্রচুর জল আবশ্যক। জমি শুষ্ক ও নীরস হইলে প্রয়োজনীয় জলের অভাবে একদিকে যেমন গাছের পোষণে ব্যাঘাত জন্মে, অপর দিকে ফলও সেরূপ উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। সেই জন্য কলাচাষের সময় সর্ব্বদাই জমির আর্দ্রতার উপর বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

দেশভেদে কলাগাছ রোপণের বিভিন্ন সময় আছে। জল বায়ুর বিভিন্নতাই ইহার কারণ। যে দেশের মৃত্তিকা স্বভাবতঃই আর্দ্র, সেই দেশে ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহা রোপণ করা চলে। যে দেশের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ একটু শুষ্ক প্রকৃতির, তথায় বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত রোপণ-কাল। পূর্ব্ববঙ্গের স্বাভাবিক আর্দ্র মাটিতে আষাঢ় শ্রাবণে গাছ রোপণ করিলে অতিরিক্ত রস সঞ্চয়ে গাছের গোড়া পচিয়া যায় অথবা কেঁচোতে নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া এ সময়ে গাছ অতিরিক্ত তেজ সঞ্চয় করার ফলে ফল ধারণে অক্ষমতাও জন্মিতে পারে। ইহাকে চলতি কথায় গাছের "ফুলিয়া যাওয়া" বলে। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের মাটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকায় বর্ষাকালেই এই গাছ রোপণ করা উচিত। বর্ষার দরুণ পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত প্রতি-কূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, পশ্চিমবঙ্গে তাহা প্রায়শঃই হয় না। তবে খুব বেশী বর্ষার সময় না লাগানই ভাল। বর্ষার প্রথম ভাগ ও শেষভাগই রোপণের উৎকৃষ্ট কাল।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে গাছ রোপণ করিলে তীব্র রৌদ্রে গাছ শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন উহাকে মৃত মনে করিয়া নষ্ট করিলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যতই শুষ্ক হউক না কেন, দু এক পশলা বৃষ্টির জল পাইলেই উহাদের গোড়া হইতে নূতন তেউড় বাহির হইবে। এই তেউড় বর্ষায় নূতন জলে বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তখন

শুষ্কপ্রায় মূল গাছটীকে একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া দিবেন। ইহা কাটিবার সময়ে লক্ষ্য রাখিবেন, যেন চারা-গাছটী কোনরূপে আহত না হয়।

জমিতে কলাগাছ কত হাত অন্তর রোপণ করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধেও খনাদেবী বলিয়া গিয়াছেন,—

"আট হাত অন্তর দুই হাত খাই।
কলা রোপ চাষী ভাই॥"

জমিতে আট হাত অন্তর দুই হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে এক একটী তেউড় বসাইয়া যাইতে হইবে। স্থানবিশেষে ছয় হাত অন্তরও বসান যাইতে পারে। কোন ঝাড়েই তিনটীর অধিক গাছ রাখিবেন না। উহাদের গোড়া হইতে অনেক তেউড় জন্মিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বড় গাছ-গুলি ফলবান্ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ তেউড়গুলির মাথা কাটিয়া মুগুর দিয়া মারিয়া দিবেন। তাহাতে উহাদের বৃদ্ধি আপাততঃ স্থগিত থাকিবে এবং বড় গাছগুলিরও বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হইবে। ফল কাটিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলিকেও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইতিমধ্যে উক্ত তেউড়গুলি আবার মাথা জাগাইয়া উঠিবে। তখন উহাদের মধ্য হইতে সবল চারা তিনটী রাখিয়া, বাকীগুলি একেবারে তুলিয়া অন্যত্র বসাইয়া দিতে হয়। বড় গাছগুলিকে এঁটে সমেত তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ঐগুলি না তুলিয়া ফেলিলে গোড়ায় কেঁচো জন্মিয়া ঝাড় নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। ঐগুলি তুলিয়া

খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জমিতে ছড়াইয়া দিলে সারের কার্য্যও হইতে পারে।

কলাগাছ বিনা সারে ও বিনা তদ্বিরেও ফল দেয় বলিয়া আমাদের দেশের অনেকের ধারণা যে, উহার পক্ষে সার অথবা তদ্বিরাদি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ ধারণা করা মহা ভুল। অবজ্ঞায় পালিত অনাথ মানবশিশু ও যত্নে পালিত নধর-কান্তি মানবশিশুর ভিতরে যে পার্থক্য, অযত্নে বর্দ্ধিত ও যত্নে পালিত উদ্ভিদের ভিতরেও সেইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। বাঁচে উভয়েই, কিন্তু জীবনের গতি উভয়েরই বিভিন্নমুখী হইয়া পড়ে। এই জন্য চাষে সুফল পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ ও তদ্বিরাদির ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কলাগাছের তদ্বিরাদির সময়। এই সময় সার প্রয়োগ- -গোড়ার মাটি কোপাইয়া উঁচু করিয়া দেওয়া প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য বছরের মধ্যে মাত্র একবার সার প্রয়োগ করিলেই চলিবে, কিন্তু গাছের তত্ত্বাবধান করা বার মাসই দরকার। প্রত্যেক মাসে জমির মাটি আলগা করিয়া, আগাছা বাছাই করিয়া ফেলিতে হয়। শুষ্ক পাতা বা ফেঁকড়ীগুলি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে।

কলাগাছের পক্ষে খইল-সার, ক্ষার, পটাস্ ইত্যাদি উপযোগী। কলাগাছের শুষ্ক পাতা ও ফেঁকড়ীগুলি পোড়াইলে উহার ছাই দ্বারা ক্ষারজাতীয় সার প্রস্তুত হইবে। পুরাতন রাবিশের গুঁড়া, পুকুর বা ডোবার পাঁকমাটি উত্তম

সার। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মাটি কোপাইয়া উক্ত সার প্রয়োগ করিতে হয়।

একই জমিতে খুব বেশী দিন কলার চাষ করিতে নাই; তাহাতে মৃত্তিকা খারাপ হইয়া যায়, জমিতে দোষ জন্মে এবং ভাল কলাতেও বীচি জন্মিয়া থাকে ও ফলগুলিও ক্রমে আকারে ক্ষুদ্র হইতে থাকে। এই জন্য অন্ততঃ তিন বৎসর অন্তর জমি হইতে সমস্ত গাছ তুলিয়া ফেলিয়া, খুব ভালরূপে লাঙ্গল দিয়া কিছু দিন ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। উহাতে জমি বিশ্রাম পায়, মুক্ত আলো বাতাসে জমির আভ্যন্তরীণ দোষ সংশোধিত হয়। তাহার পর আবার নূতন তেউড় বসাইয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছগুলি সবল ও সতেজ হয় এবং মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। কলাগাছ মৃত্তিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে রস শোষণ করিয়া থাকে। উহার মূলগুলি মৃত্তিকার গভীর স্তরে প্রবেশ না করিয়া, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকার গভীর স্তর হইতে রস গ্রহণে সে অক্ষম হয় না। ইহাদের রস-শোষকতার আধিক্যে মৃত্তিকার নিম্নস্তরস্থ উদ্ভিদ-খাদ্য বিগলিত হইয়া ঊর্দ্ধে আকর্ষিত হয় এবং মূলের সাহায্যে উদ্ভিদদেহে প্রবিষ্ট হয়। এই জন্য ইহার জমি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উদ্ভিদ-খাদ্য-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে না পারিলে উহারা একাদিক্রমে তিন বৎসর কালও একই জমিতে উৎকৃষ্ট ফল দানে সক্ষম হয় না। এই জন্যই অন্ততঃ প্রতি তিন বৎসর

অন্তর জমিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়া, কর্ষণে ও সার প্রয়োগে নূতন ভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার।

একই বাগানে কলার সঙ্গে অপর বৃক্ষের স্থান দিতে নাই। উহাতে প্রথম প্রথম রস ও ছায়া পাইলেও ক্রমেই কদলীর শোষকতার আধিক্যে অন্য বৃক্ষ খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয়। জমিকে সরস করিবার জন্য অস্থায়িভাবে বৎসর কালের জন্য কদলীকে উদ্যানে রাখা যাইতে পারে। কিন্তু তার পরেই উহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হয়।

কলাগাছের পাতা, বাকলা ইত্যাদি আমাদের নানা প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সুফলের উদ্দেশ্যে রোপিত বৃক্ষ হইতে কদাচ পাতা বা বাকলা কাটা উচিত নয়। উহাতে গাছগুলি যে শুধু শ্রীহীন হয়, তাহা নহে—গাছের জীবনী শক্তিও অল্পবিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সুফল প্রসবে বাধা পায়। পাতা ও বাকলের জন্য নিকৃষ্টজাতীয় বীচেকলার গাছ রোপণ করিতে হয়। এই জাতীয় গাছ খুব বড় এবং পাতাগুলিও বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইয়া থাকে।

কলার থোড়, বিশেষতঃ মোচা অতি উৎকৃষ্ট উপকারী খাদ্য। দুই প্রকারের মোচা সাধারণতঃ বাজারে আইসে। প্রথম, আবরণী পরিচ্ছদ সহ অপরিণত পুষ্পদণ্ড এবং দ্বিতীয়, কদলির নিম্নপ্রান্তস্থিত পুষ্পগুচ্ছ। বলা বাহুল্য যে, পুষ্টিকারিতা হিসাবে প্রথমোক্ত মোচাই উৎকৃষ্ট। মোচা বেশী দিন গাছে রাখিতে নাই। ছড়াগুলি বাহির হইয়া গেলেই মোচা কাটিয়া

ফেলিতে হইবে। গাছে মোচা ধরিবার সময় হইলেই মাঝে মাঝে জল দিবেন। তাহাতে ফলগুলি সুমিষ্ট ও পুষ্ট হয়। কিন্তু বর্ষাকালে কাঁদি নামিলে জল দেওয়া অনাবশ্যক, বরং তাহাতে ক্ষতিই হইয়া থাকে।

তরকারী হিসাবে একমাত্র কাঁচা কলাই ব্যবহৃত হয়। কাঁচা কলা খুব পুষ্টিকর খাদ্য। উহা হইতে প্রস্তুত আটা বেশ উপাদেয়। কাঁচা কলা সুপক্ক অবস্থাতেও খাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ততটা সুস্বাদু হয় না।

ফল কাটিয়া লওয়ার সময়ে গাছটীও কাটিয়া ফেলা এবং মূলটী পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলা দরকার। গাছের কাণ্ড, পাতা, এঁটে প্রভৃতি স্থানান্তরিত না করিয়া, কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। উহাতে ক্ষেত্র উর্ব্বরা হইয়া থাকে। কলাগাছের এই সব পরিত্যক্ত অংশ অন্য গাছের গোড়ায় দিলেও উত্তম সারের কার্য্য করে। বাড়ীর গৃহপালিত গো-মহিষাদি পশুর খাদ্যের নিমিত্ত ব্যবহার করাও ভাল। একটী কলা-বাগানের পরিত্যক্ত এঁটে, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি দ্বারা সম্বৎসর গৃহ-পালিত পশ্বাদি পালন করা চলে।

অন্যান্য উদ্ভিদের মত কলাগাছেরও অনেক শত্রু আছে। বানর, হনুমান্, কাক, বাদুড় এবং আরও নানারূপ পাখী পাকা কলার ভয়ানক শত্রু। কলা পাকিতে আরম্ভ করিলেই ইহারা ফল নষ্ট করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের কবল হইতে

ফল রক্ষা করিতে হইলে বাগানে কড়া পাহারার দরকার। কলা পাকিতে আরম্ভ করিলে চট দিয়া কাঁদিটী ঢাকিয়া দেওয়ারও রীতি আছে। ইহাতে পাখী দ্বারা ফল আর নষ্ট হইতে পারিবে না। কিন্তু বানর বা হনুমানের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একমাত্র কড়া পাহারা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কোন উপদ্রব না থাকিলেও কলার কাঁদী ঢাকিয়া দিবার প্রথা খুব ভাল। ফলগুলি ঢাকা থাকিলে শাঁস অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল ও মিষ্ট হয়। গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বাগানের চারি ধারে ঘন কাঁটাযুক্ত বেড়া দেওয়া আবশ্যক।

উল্লিখিত শত্রু ব্যতীত এক প্রকার কীট কলাগাছের বিষম অনিষ্ট করে। ইহারা কাণ্ড ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং অন্তর হইতে গাছটীকে কুরিয়া খাইয়া ফেলে। ইহাতে গাছের কাণ্ড ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গাছের গায়ে ছিদ্র দেখিলে প্রথমেই উহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইবেন। অনেক সময় কদলীফলের গাত্রে কাল ছিট্ ছিট্ দাগ দেখা যায়। উহা একরূপ ছত্রকের (gloesporum spp) ক্রিয়া। পাতায় এবং গাছের কাণ্ডেও নানারূপ দাগ দেখা যায়। একরূপ কীট, গাছের গোড়া আক্রমণ করিয়া মূল দ্বারা আহৃত রস দূষিত করিয়া দেয়। ঐ রস সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হইয়া পাতায়, কাণ্ডে, ফলে নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে। আমাদের দেহস্থ চর্ম্মরোগের মত উহাও কলাগাছের

এক প্রকার চর্ম্মরোগ। এইরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলেই, গাছটার গোড়া খুঁড়িয়া, কাটের বাসা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। শেষে কয়েক দিন গোড়া খোলা রাখিয়া, আলো বাতাস খাওয়াইয়া নূতন মাটি চাপা দিতে হইবে।

কীট-দষ্ট গাছ ঝাড়ে কখনও রাখিবেন না। উহাতে ঝাড়ের সুস্থ গাছগুলি, ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। গাছে কীট প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে পারিলেই, কীট বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি সে চেষ্টা সফল না হয়, তবে গাছটীকে সমূলে তুলিয়া ফেলিবেন এবং গোড়ার মাটি ওলট-পালট করিয়া—আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে আনিবেন। তার পর সে স্থানে একটী সতেজ তেউড় বসাইয়া দিবেন। নূতন তেউড় বসাইবার সময়, প্রথমতঃ রৌদ্রে তিন দিন শুকাইয়া পরে বসাইবেন। তাহা না হইলে, অধিক রসস্থ হইয়া গাছ ফুলিয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া. অনেক সময় পাতায় এবং গাছে হলদে রং ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং ক্রমে গাছগুলি মৃতপ্রায় হইয়া যায়। প্রত্যেকবার তেউড় বসাইবার সময় উহাদের গোড়াগুলি বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া লইবেন। যে সমস্ত শিকড় থেঁতলাইয়া গিয়াছে দেখিবেন, সেগুলি সাবধানে বাদ দিবেন। তার পর গোড়াটী খুব পাতলা গোবর-জলে ডুবাইয়া রোপণ করিবেন। উক্ত তরল গোবর-জলের সঙ্গে, কিছু বালি মিশ্রিত করিয়া লইলে, আরও ভাল হয়। তাহাতে গাছের তেজ বাড়ে।

শুধু ফল হিসাবে কলার চাষ অপেক্ষা, নানারূপ শিল্প দ্রব্য প্রস্তুতার্থে কলার চাষে অধিকতর লাভবান্ হওয়া যায়। প্রথমতঃ ফল হইতেই নানাপ্রকার স্থায়ী সুখাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। কলা হইতে অতি পুষ্টিকর উৎকৃষ্ট আটা প্রস্তুত হয়। কাঁচা কলা ও বীচে-কলা হইতেই আটা ভাল হয়। কারণ, এই কলাগুলি অন্যান্য কলা অপেক্ষা অধিকতর বড় ও পুষ্ট হইয়া থাকে। কলাগুলি যখন বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখন ঈষৎ উষ্ণ জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া, খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। উহা বেশ ভালরূপে শুকাইলে ঢেঁকীতে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে, কাপড়ে চালিয়া লইতে হইবে। চালের গুঁড়া করিবার যে পদ্ধতি, এগুলি প্রস্তুত করিবার প্রথাও সেইরূপ। বাজারে এই আটার চাহিদা খুব বেশী। সামান্য পরিমাণে গোধূম আটা মিশ্রিত করিলে ইহা হইতে উত্তম রুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাজারে এই আটা বেনানা ফুড নামে প্রচলিত। বেরী বেরী, শোথ, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। কাঁচা কলা বা বীচে-কলা পাকিলে বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয়, এইরূপ আটা প্রস্তুত করিলে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভবান্ হওয়া যায়।

মৌচাক হইতে যেরূপ উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়, কলা হইতেও সেইরূপ চমৎকার মধু প্রস্তুত হইতে পারে। বীচেকলা সাধারণতঃ মিষ্ট বেশী এবং রসভাগও উহাতে অধিক।

কাজেই এই কলাই মধু সংগ্রহের পক্ষে প্রশস্ত। এ কলায় প্রচুর বীজ থাকে বলিয়া সাধারণতঃ অনেকেই ইহা পছন্দ করেন না। কিন্তু ইহা হইতে প্রস্তুত মধু, ধনী দরিদ্র সকলেরই আদরের সামগ্রী হইয়া থাকে। বেশ সুপক্ক ফলগুলি, ঘরে কয়েক দিন রাখার পর, যখন খোসাটীতে কাল রং ধরিবে, তখন খোসা ছাড়াইয়া, সবগুলি কলা একত্রে বেশ ভালরূপে চটকাইয়া, কাপড়ে বাঁধিয়া টানাইয়া রাখিতে হইবে। ভালরূপে রস নিষ্কাষিত হইবার জন্য ঐ কলার যত ওজন, তদনুসারে প্রতি সেরে দুই কাঁচ্চা পরিমাণ চূণ মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। তারপর উহার নীচে একটী পরিষ্কার পাথরের পাত্র রাখিয়া দিবেন। কলা মজিয়া ঐ পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িবে। ঐ রসই মধু। উহাকে সুগন্ধি করিবার জন্য কয়েক ফোঁটা এসেন্স অব বেনানা মিশ্রিত করা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট এক কান্দি কলায় প্রায় ৩ বোতল মধু পাওয়া যায়। ঐ মধু বিক্রয় করিলে কলা অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্য পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া কলার জেলী অতি মুখরোচক খাদ্য। টিনে বা বোতলে বদ্ধ করিয়া বিদেশে চালান দিতে পারিলে খুব লাভ হইতে পারে। কলা হইতে প্রস্তুত কালি, বাতি প্রভৃতিও বাজারে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক হইতেছে কদলী হইতে সূত্র প্রস্তুত করণ। কদলীর সূতায় অতি চমৎকার বস্ত্রাদি

প্রস্তুত হয়। মোটা দড়ি, কাছি প্রভৃতিও এই সূতা হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। দক্ষিণ-ভারতের অনেক স্থানে, বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে কদলী হইতে সূত্র উৎপন্ন হয়।

কলা দ্বারা নানাবিধ শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত বাদ দিলেও একমাত্র ফল বিক্রয় করিয়াও লাভবান্ হওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক হাট আছে, যেখানে প্রতি হাটে ১৫।২০ হাজার টাকার কলাই বিক্রয় হয়। কলিকাতা বা অন্য কোন সহরে রপ্তানী করিতে পারা যায়, এরূপ কোন স্থানে বাগান করিলে ভাল হয়। মোট কথা, যেখানেই বাগান হউক না কেন, তাহার নিকটে বড় হাট বা বাজার থাকা দরকার। স্থানবিশেষে এবং হাটবিশেষে দ্রব্যবিশেষের চাহিদা বেশী হয়। এই চাহিদা লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী বাগান করিতে পারিলে চাষে সাফল্য অনিবার্য্য।

নিম্নে কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় কলার বিবরণ দেওয়া গেল।—

কানাই বাঁশী—বেশ বড়জাতীয় কলা। ফলগুলি ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। শাঁস মাখমের মত অতি কোমল এবং খুব সুস্বাদু। ইহা সুগোল নহে, পলযুক্ত।

মর্ত্তমান (ঢাকাই)—এই ফলের গন্ধ অতি মনোহর। ফল বেশ বড় হয়। খাইতে অতি সুস্বাদু।

কাবুলী—ইহার গাছগুলি বেঁটে রকমের, কিন্তু কলার কাঁদী খুব বড় হইয়া থাকে। ফলগুলি ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা

হয়। প্রত্যেকটী ফল খুব পুষ্ট হইয়া থাকে। খাইতে অতি উপাদেয়।

রাজভোগ (সিঙ্গাপুরী)--অতি বৃহৎজাতীয় কলা। সিঙ্গাপুর ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। এ দেশের জল বায়ু ইহার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া, এ দেশে ইহার প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা প্রকৃতই রাজার ভোগ। একটি ফল খাইলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। শাঁস অতি মোলায়েম এবং রসাল। এক একটী ফল প্রায় ১ হাত লম্বা হয়। ইহার মোচা এত ক্ষুদ্র যে, নাই বলিলেই চলে।

রামকলা—ইহা বৃহজ্জাতীয় ফল নহে। এই ফলগুলির বর্ণ-বৈশিষ্ট্যই বিশেষ আদরের জিনিষ। কাঁচা অবস্থায় ফল-গুলির রং মেটে সিন্দূদের মত, কিন্তু পাকিলে রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ উহার উপরে ফুটিয়া ওঠে। ফল বেশ সুগন্ধি ও সুমিষ্ট।

বোম্বাই—খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল। ফলগুলি বেশ পুষ্ট ও ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই ইহার খোসা সবুজ থাকে। খাইতে বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধি।

বীটজবা—বেশ বড় জাতীয় ফল। গাছের কাণ্ড, ডাঁটা প্রভৃতি লালবর্ণের। ফলগুলি পাকিলে সিন্দূরের মত লাল হইয়া থাকে। শাঁস বেশ রসাল, সুমিষ্ট ও মোলায়েম।

ইহা ছাড়া—অমৃতমান, অনুপম, চাঁপা, অগ্নিশ্বর, ঘৃত-কাঞ্চন,

ইত্যাদি নানা রকমের উৎকৃষ্ট কলা আছে। বাঙ্গালা দেশে রামপালের কলা খুব প্রসিদ্ধ।

কলার চাষ অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়। এক বিঘা জমিতে ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে বৎসরে কলা, মোচা, থোড় ও পাতা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ১২৫৲ টাকার বেশী লাভ করা যাইতে পারে। কলা-বাগানের চারি দিকে শক্ত কাঁটাযুক্ত বেড়া দেওয়া দরকার। এ জন্য, লেবুগাছের বেড়ার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। লেবু-গাছে বেড়ার কাজও চলে, উপরন্তু ফল বিক্রয় করিয়া দু পয়সা বেশী আয়ও হইতে পারে। তার পর বেড়ার পাশ দিয়া শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে এক সারি পেঁপে গাছ লাগাইয়া গেলে পেঁপে বিক্রয় দ্বারাও ২৫৲।৩০৲ টাকা অতিরিক্ত আয় হইতে পারে। অথচ পেঁপেগাছ ঝাড়াল নহে—ইহার জন্য বেশী জায়গার দরকার হয় না; উহা বাগানের অতি সামান্য স্থানই দখল করিয়া থাকে। বেড়া ও কদলীগাছের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, সেই স্থানটুকুর মধ্যেই চারি দিক্ ঘুরাইয়া এক সার পেঁপেগাছ লাগাইয়া যাইবেন। উহাতে মূল আবাদের কোনই ক্ষতি হয় না। মোট কথা, কোন ব্যক্তি যদি একত্রে ৫ বিঘা জমি লইয়া উপরোক্ত উপায়ে উৎকৃষ্টজাতীয় কদলীর চাষ করিতে পারে, তবে তাহার সমস্ত খরচ বাদে মাসিক ৬০৲ টাকারও বেশী আয় হইতে পারে। এই ভয়াবহ বেকার-সমস্যার দিনে শিক্ষিত যুবকগণের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কয়েৎ বেল। (Wood apple)

কয়েৎ বেল ছোট ফল, ব্যাটবলের একটী বল অপেক্ষা ইহার আকার বড় নহে। ইহা জঙ্গলী গাছের মধ্যেই গণ্য। কিন্তু তাহা হইলেও এই ফলের যে আদর মোটেই নাই, তাহা নহে। ইহার স্বাদ অম্ল। ইহা দ্বারা উত্তম চাটনী প্রস্তুত হয়। চিনি সংযোগে ইহা খাইতে মন্দ নহে।

এই গাছের কলম প্রস্তুত হইতে পারে। বীজ হইতেও চারা প্রস্তুত করা চলে। শাখা-কলমে ইহার চারা তৈরী করিতে হয়। এই গাছগুলি খুব বড় হয়। এই জন্য এবং ফলগুলি তাদৃশ উপভোগ্য নয় বলিয়াও বটে—অনেকেই উদ্যানে এই গাছকে স্থান দিতে চাহেন না।

বর্ষাকাল এই গাছ রোপণের প্রকৃষ্ট সময়। এই গাছের বিশেষ কোন পাট নাই। সাধারণ গোবর-সারই ইহার পক্ষে প্রযোজ্য। ভাদ্র মাস হইতে মাঘ ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত পাকা কয়েৎ বেল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পাকা কয়েৎ বেল কণ্ঠশোষক, হিক্কা নিবারক, ধারক ও বায়ুনাশক। এই ফল বিশেষ দুষ্পাচ্য, কাজেই পরিপাক-শক্তির অবস্থা অনুযায়ী ইহা খাওয়া উচিত।

———

কামরাঙ্গা (Averrhoa Carambola)

কামরাঙ্গা অত্যন্ত রসাল ফল। ইহার স্বাদ অম্ল বলিয়া ইহাকে লোকে ততটা আদরের চক্ষে দেখে না। কিন্তু উত্তমরূপে চাষ করিলে এবং যত্ন লইলে ইহার স্বাদও বেশ মিষ্ট হয়। কাঁচা অবস্থায় এই ফল যতটা টক থাকে ভালরূপে পাকিলে টকের তীব্রতা কিছু হ্রাস পায়। এই ফলের ঘ্রাণ খুবই চিত্তাকর্ষক এবং গাছের ঘনবিন্যস্ত পত্রসম্ভারও উদ্যানের শ্রীবর্দ্ধক।

ইহার কলম হইতেই চারা প্রস্তুত করিতে হয়। গুটীকলমই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত। বীজেরও চারা জন্মে। তবে বীজোৎপন্ন চারার ফল তাদৃশ সুবিধাজনক হয় না এবং ফলনও হয় দেরীতে। আষাঢ় মাসে এই কলম করা কর্ত্তব্য। কলম কাটা হইলে হাপোরে এক বৎসর কাল প্রতিপালন করিয়া, শেষে পরবর্ত্তী বর্ষায় জমিতে স্থায়িভাবে লাগাইয়া যাইতে হইবে। এই গাছ খুব প্রকাণ্ড হইয়া থাকে। উচ্চতায় ২০।২৫ হাত হয় এবং তদনুযায়ী ঝাড়াল হইয়া থাকে। ১৫।২০ হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ লাগাইয়া যাইতে হয়।

নাবাল জমিতে ইহা সাধারণতঃ ভাল জন্মে না। অপেক্ষা-

কৃত উচ্চ সরস জমিতেই ইহা ভাল হয়। দোআঁশ প্রকৃতির মৃত্তিকা ইহার উপযোগী।

কার্ত্তিক মাসে এই গাছের গোড়া খনন করিয়া, নূতন মাটি ও সার প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার পক্ষে গোশালার আবর্জ্জনা-পচা সার, গোময়সার ইত্যাদি প্রয়োগ করিলেই চলে। গাছে ফুল আসিলে জল সেচন করা দরকার। তবে মাটির যো বুঝিয়া প্রয়োজনমত জল দিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। ফলের মিস্টতা বৃদ্ধির জন্য সারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। চূর্ণ প্রয়োগে অত্যন্ত টক রসযুক্ত ফলেরও টকের তীব্রতা হ্রাস পায়।

কামরাঙ্গা ফুলের বর্ণ অতি মনোহর। যখন রাশি রাশি দুধে গোলাপী বর্ণের ফুল ঘনশ্যাম পত্ররাজির ভিতরে ফুটিয়া থাকে, তখন উদ্যানের শোভা বড়ই মনোহর হয়। ফলগুলি যখন পাকিয়া হরিদ্রাভ লালবর্ণ ধারণ করে, তখন গাছটী দেখিতে অতি সুন্দর হইয়া থাকে। এই ফলগুলির আকার লম্বা ও গভীর খাঁজবিশিষ্ট।

চীনে কামরাঙ্গা নামক এক জাতীয় কামরাঙ্গা আছে, যাহার পাকা ফলের বর্ণ ঘোর সবুজ থাকে। দেশী কামরাঙ্গা অপেক্ষা ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তুলনায় অম্ল রস ইহার ভিতরে কম থাকে। কিন্তু দেশী কামরাঙ্গার মত উহা সৌরভময় নহে।

অত্যন্ত টক বলিয়া কাঁচা অবস্থায় ইহা খাওয়া মোটেই উচিত নহে। খাইলে পীড়া জন্মিতে পারে। সুপক্ক কামরাঙ্গায় উৎকৃষ্ট চাটনী প্রস্তুত হয়।

করমচা (Caranda)

করমচা অতি সাধারণ ফল। ফলগুলি অম্লরসযুক্ত, চাটনী প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। এই গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে।

করমচা-ফলগুলি অতি ক্ষুদ্র। সুপক্ক হইলে ফলগুলি লাল, সাদা বা কালোবর্ণের হয়। আবার লাল কালো বা লাল সাদা মিশ্রিত বর্ণেরও হইয়া থাকে। এই বর্ণ-বৈচিত্র্যই এই ফলের বৈশিষ্ট্য। এক একটী গাছে ইহার অফুরন্ত ফলন দেখা যায়। সেই সময় গাছগুলি বড়ই সুন্দর দেখায়। বাগানের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে করমচা বিশেষ উপযোগী।

বীজ হইতেই ইহার চারা জন্মে। বর্ষাকালে চারা প্রস্তুত করিয়া কিছুদিন হাপোরে প্রতিপালন করতঃ পরে স্থায়িভাবে বসাইতে হয়। এই গাছ বেশী উচ্চ হয় না, কিন্তু খুব ঝাড়াল হইয়া থাকে। এই গাছকে ছাঁটিয়া ইচ্ছামত আকার দেওয়া যাইতে পারে। বাগানের চারি দিকে বেড়া দিবার উদ্দেশ্যে করমচা লাগাইলে মন্দ হয় না। গাছে ঘন কাঁটা থাকায় এই

বেড়া সকলের পক্ষেই দুর্ভেদ্য হয়। তার পর ইহা যখন ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে, তখন উদ্যান অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পাকা করমচা পাওয়া যায়।

কুল (Plum)

(দেশী)

ভারতে নানা জাতীয় কুল দেখিতে পাওয়া যায়। এক বঙ্গদেশেই কুলের আকার ও গুণানুসারে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। বঙ্গদেশজাত সাধারণ কুলগাছগুলি সহজেই জন্মিয়া থাকে, পল্লীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই অযত্নসম্ভূত গাছের ফল তত সুবিধার হয় না। যত্ন করিয়া উদ্যানে স্থান দিলে এগুলি হইতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। গাছের শাখা প্রশাখায় কাঁটা থাকে। ইহার পাতাগুলি গোল ও ক্ষুদ্র।

বীজ হইতে এবং জোড় ও চোক-কলমে ইহার চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাল-কলমেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে। বর্ষাকালে সারবান্ মাটিতে অর্দ্ধপক্ক সুপুষ্ট ডাল পুঁতিয়া রাখিলে ১৫।২০ দিনের ভিতরেই শিকড় উদ্গত হয়। তার পর আরও কিছু দিন হাপোরে প্রতিপালন করিয়া, শেষে স্থায়িভাবে জমিতে বসাইতে হয়।

কার্ত্তিক মাস হইতেই কুলগাছ মুকুলিত হয় এবং পৌষ মাস হইতেই ফল পাওয়া যায়। ইহার স্বাদ অম্ল। ইহা হইতে উত্তম চাটনী, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কুলের অম্বলও অতি চমৎকার।

কুলগাছ খুব বড় হয় এবং শীঘ্রই বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার ফলগুলিরও বোঁটা দৃঢ় নহে। একটু নাড়া পাইলেই সহজে ঝরিয়া পড়ে।

এ দেশে একরূপ কুল জন্মে, তাহা কাঁচা অবস্থায় খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু পাকিলে বিস্বাদ হইয়া থাকে। এইগুলির শাঁস খুব কোমল এবং বেলে প্রকৃতির। ইহাদের আকারও সাধারণ কুল অপেক্ষা বড়।

কুলের কাষ্ঠ খুব শক্ত। ইহা দ্বারা দরজা জানালার কপাট প্রস্তুত হইতে পারে।

দেশী কুলের পক্ষে প্রায় সকল রকম মৃত্তিকাই উপযোগী। ইহার বিশেষ কোন তদ্বিরাদি নাই। ফল আসিবার পূর্ব্বে জল সেচন এবং ফলন শেষ হইলে শাখা প্রশাখাগুলি ছাঁটাই করিলেই চলে। গাছগুলি ক্ষেত্রে ১০।১২ হাত অন্তর বসাইতে হয়।

কুল (নারিকেলী)

নারিকেলী কুল আকারে নারিকেলের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ-বিশেষ। আকারের এই বৈশিষ্ট্যই ইহাকে নারিকেলী কুল নাম দিয়াছে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই কুলের চাষ প্রশস্ত।

বীজ হইতে এই কুলের চারা প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কলমের চারাই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশী কুলের চারার সহিত ইহার চোক, চোঙ ও জোড়-কলম বাঁধিতে হয়।

এই কুল আমাদের দেশে বেশ জন্মে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের মত এ দেশে ইহার বিস্তৃত আবাদ নাই। পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রচুর নারিকেলী কুল এ দেশে আসিয়া থাকে। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালে হাপোরে বীজ পাত দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। হাপোরের মাটি বেশ সারবান্ হওয়া দরকার। বীজ অঙ্কুরিত হইলে চারাগুলিকে এক বৎসর কাল অন্য হাপোরে পালন করিয়া, শেষে বর্ষার প্রারম্ভে স্থায়িভাবে জমিতে লাগাইয়া দিবেন।

কুলের পক্ষে সাধারণ দোআঁশ মৃত্তিকাই উত্তম। পুকুরের পাঁকমাটি, পচা গোময়-সার ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া বেশ উত্তমরূপে জমিটি চাষ করিয়া দিবেন। জমির আগাছা ইত্যাদি বাছিয়া ফেলিবেন। তার পর ১০।১২ হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ রোপণ করিয়া যাইবেন। চারা দুই বৎসরের পুরাতন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়িভাবে বসাইবেন না। চারাগুলিকে জমিতে বসাইয়া, যে পর্য্যন্ত না শিকড়গুলি মাটির সঙ্গে ভালরূপে দৃঢ় বদ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে জল সেচন করিতে হইবে। প্রখর রৌদ্রের সময় ছায়া দানের ব্যবস্থা করিবেন।

সাধারণতঃ কলমের গাছে ৩।৪ বৎসরেই ফল ধরে। ফল

প্রসব করিতে আরম্ভ করিলে গাছের একটু বিশেষ তদ্বির করিবেন। প্রতি বৎসর ফল ধারণ করিবার দুই মাস পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে গাছের পাট আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ২।৩ সপ্তাহ অনাবৃত রাখিবেন। তার পর গোময়-সার পাঁকমাটি ইত্যাদির সহিত নূতন মাটি মিশ্রিত করিয়া গোড়া ঢাকিয়া দিবেন। ফলন শেষ হইয়া গেলে গাছগুলিকে ছাঁটিয়া দিবেন।

বর্ষাকালে এই গাছ মুকুলিত হয়। আশ্বিনের শেষ বা কার্ত্তিকের প্রথম হইতেই, এই ফল খাইবার উপযুক্ত হয়। এই ফলের স্বাদ অম্লমধুর, তবে অম্লের ভাগ খুব কম। কোন কোন ফলে অম্ল রস মোটেই থাকে না। সুপক্ক হইলে এ জাতীয় কোন ফলেই অম্ল ভাগ প্রায় থাকে না।

নারিকেলী কুল সকলের নিকটেই অতিমাত্রায় আদৃত হইয়া থাকে। এই কুলের চাষ করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হওয়া যায়।

কুল (কাশীর)

কাশীর কুল প্রায় নারিকেলী কুলের মত। ইহার আকার ঢোলকের মত উভয় পার্শ্ব কিঞ্চিৎ চাপা। স্বাদে নারিকেলী কুল অপেক্ষা ইহা নিকৃষ্ট।

দেশী কুলের চারার সঙ্গে ইহার কলম বাঁধিতে হয়। চোক এবং চোঙ-কলমই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। যুক্ত প্রদেশেই

এই কুল ভাল জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশেও এই কুল জন্মে এবং উৎকৃষ্ট হয় ; কিন্তু তুলনায় যুক্তপ্রদেশের কুলই শ্রেষ্ঠ। ইহার চাষপ্রণালী নারিকেলী কুলের মতই। তবে ইহার কলম বাঁধিবার প্রশস্ত সময় ফাল্গুন মাস।

বঙ্গদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতায় কাশীর কুল প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। কাশীর কুলের চাষও বিশেষ লাভজনক। ইহা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটেই বিশেষরূপে আদৃত।

কাল জাম। (Black Berry)

কাল জাম যেমন মুখরোচক, তেমনি উপকারী ফল। কাঁচা অবস্থায় ফলগুলি গাঢ় সবুজ থাকে। একটু পরিণত হইলে লাল হয় এবং সুপক্ক হইলে ঘোর নীলবর্ণ ধারণ করে।

বীজ হইতে ইহার চারা হয়। গুটী ও শাখা-কলমেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু শাখা-কলমের চারা প্রায়ই মারা পড়ে। কাজেই গুটী-কলমে বা বীজে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। গাছতলায় অনেক ফল পড়িয়া অযথা নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা হইতে অনেক চারা আপনা হইতে প্রস্তুত হয়। ঐগুলি তুলিয়া আনিয়া সযত্নে বসাইয়া দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু ঐ গাছ হইতে ফল পাইতে খুব বিলম্ব ঘটে। এই জন্য কলমে প্রস্তুত চারা রোপণ করাই বিধেয়। সকল রকম

মাটিতেই ইহা জন্মিয়া থাকে। কোনরূপ পরিচর্য্যার আবশ্যক হয় না। সাধারণ গোময়-সারই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। প্রত্যেক বৎসর ফল আসিবার পূর্ব্বে গাছের গোড়া খনন করিয়া, ঐ সার সহ নূতন মাটি দ্বারা গোড়া চাপা দিলেই চলিতে পারে।

এই গাছ খুব বৃহৎ হয়। ইহার কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা বড় বড় আমগাছের মতই স্থূল হইয়া থাকে। এই জন্য এই গাছ ২০।২৫ হাত ব্যবধানে বসান উচিত।

ফাল্গুন চৈত্র মাসেই এই গাছ মুকুলিত হয়। এক একটী বোঁটার সঙ্গে বহুসংখ্যক ফল ফলিয়া থাকে। ফলগুলি এক সময়ে সব পাকে না। ইহাদের বোঁটাগুলি খুব হাল্‌কা। একটু বাতাসেই ফলগুলি ঝরিয়া পড়ে। বর্ষার প্রারম্ভেই এই ফল পাকিতে আরম্ভ করে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে জামের ফল, পাতা, আঁটী, ছাল প্রভৃতির রোগনাশিনী অসীম শক্তি আছে। জাম গুরুপাক, বলকারক ও রক্তশোধক। জামের বীচি বহুমূত্র রোগের মহৌষধ।

খেজুর (Date)

খেজুর আমাদের দেশে সাধারণ বৃক্ষমধ্যে গণ্য। ফলকর হিসাবে ইহার চাষ বিশেষ হয় না। কিন্তু সুনিয়মে যত্নপূর্ব্বক চাষ করিতে পারিলে ইহা দ্বারাও যথেষ্ট আয় হইতে পারে।

ফল হিসাবে আমাদের দেশীয় খেজুর অতি নিকৃষ্ট সন্দেহ নাই। ইহার বীচি অত্যন্ত বড় এবং শাঁস খুব অল্প। কিন্তু খেজুরের রস অতি চমৎকার। এই রসের জন্যই ইহার চাষ করা কর্ত্তব্য। খেজুরের রস হইতে উৎপন্ন গুড় ও চিনি অতি উপাদেয় খাদ্য। নলেন খেজুর গুড়ের তুলনা নাই বলিলেও চলে। স্বাদে গন্ধে ইহা অতি অনুপম। খেজুরের চাষ করিয়া, রস হইতে উৎপন্ন গুড়ের ব্যবসায় করিতে পারিলে, বেশ লাভবান্ হওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বরিশাল, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের খেজুরী গুড় অতি প্রসিদ্ধ। বরিশাল জিলায় কলসীতে ভরা একরূপ গুড় প্রস্তুত হয়, উহা উপরে দেখিতে বেশ কঠিন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হাতে লইলেই উহা চিনির মত গুঁড়া হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত সৌরভময়। উৎকৃষ্ট সন্দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে এই গুড়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা এত অল্প প্রস্তুত হয় যে, স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটাইয়া, বাহিরে চালান হইতে পারে না। বোধ হয়, ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাববশতঃই বাহিরে চালান দিবার মত প্রচুর পরিমাণে উহা প্রস্তুত হয় না। উহা দীর্ঘকাল কলসীর ভিতরে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। যশোহর হইতে প্রচুর খেজুরী গুড় বাহিরে চালান হয়। যশোহর জিলায় কোটচাঁদপুরে খেজুরী গুড় ও চিনির বড় কারখানা আছে। বাঙ্গালা দেশের যে সমস্ত জিলায় খেজুর গাছ প্রচুর জন্মে, সেই সমস্ত স্থানে যদি সজ্ঞ-

বদ্ধ ভাবে কারখানা স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা করা যায়, তবে বর্ত্তমান ভয়াবহ বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে সন্দেহ নাই।

বীজ হইতেই এই গাছ উৎপন্ন হয়। কলমে ইহা প্রস্তুত হয় না। তবে কখনও কখনও উহার গোড়ায় তেউড় জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা খুব বিরল। বর্ষাকাল এই গাছ রোপ-ণের প্রশস্ত কাল। উৎপন্ন চারাগুলিকে বর্ষাকালেই স্থায়ি-ভাবে বাগানে রোপণ করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেকটী চারা ৫।৬ হাত ব্যবধানে রোপণ করা কর্ত্তব্য। পাঁক মাটি খেজুর গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। গাছের গোড়ায় কোনরূপ আগাছা জন্মিতে দিবেন না। গাছের মূলদেশ উপরে জাগিয়া উঠিলে সারমাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিবেন। এ ছাড়া প্রত্যেক বৎসরই গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া কিছু কিছু সার প্রয়োগ করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু জমিই খেজুরের পক্ষে উপযোগী। গোড়ায় জল না দাঁড়ায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

৭।৮ বৎসরের ভিতরেই খেজুর গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। গাছটীর বয়স ৫।৬ বৎসর হইলেই রসের জন্য গাছ কাটা যাইতে পারে। কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত যে রস পাওয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট। ফাল্গুন চৈত্র মাসেও কোন কোন স্থানে রস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা অতি নিকৃষ্ট। শীত যত দিন তীব্র থাকিবে, সুমিষ্ট উত্তম রসও

তত দিন পাওয়া যাইবে। এই জন্য মেঘলা বা কোয়াসাচ্ছন্ন রাত্রির রস তত ভাল হয় না। দিনের বেলায় এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহা দিয়া—নানা মশলা-সংযোগে তাড়ি প্রস্তুত হয়। ঐ রসে স্বভাবতঃই একটা মাদকতা আছে—আবার মশলা সংযোগে ঐ মাদকতা আরও তীব্র হইয়া থাকে।

এক বিঘা জমিতে ২০০ হইতে ২২৫টী পর্য্যন্ত খেজুর গাছ বসান যাইতে পারে। প্রত্যেকটী গাছ হইতে পূর্ণ ৩ মাস কাল প্রত্যহ গড়ে /৩/৪ সের রস পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশীয় খেজুর অপেক্ষা আরবদেশীয় খেজুর শতগুণে ভাল। ফল হিসাবে আরবীয় খেজুরের চাহিদা সর্ব্বত্রই বেশী। কিন্তু আমাদের দেশের জল বায়ুতে উহা উৎকৃষ্ট হয় না।

খেজুর গুরুপাক, পুষ্টিকর ও সারক খাদ্য। খেজুরের পাতা হইতে উত্তম চাটাই প্রস্তুত হয়।

———

গোলাপ জাম (Rose Apple)

এই ফল একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ইহার গাছ হইলেও কোন স্থানে ফল দিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। দাক্ষিণাত্যে

হায়দ্রাবাদে কিছু কিছু ফল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু উহা বঙ্গদেশের ফলের মত সুগন্ধি ও রসাল নহে।

গোলাপ জামের জন্য বিশেষ উৎকৃষ্ট জমির প্রয়োজন নাই। জমি বিশেষ উঁচু ও নীরস না হইলেই ভাল হয়।

বীজ হইতে ইহার চারা প্রস্তুত করা যায়। কলম করিতে গেলে গুটী-কলমই উত্তম। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ইহার কলম বাঁধিতে আরম্ভ করা উচিত। ইহার গুটী সর্ব্বদা ভিজা রাখিতে হইবে। এই জন্য বর্ষার অভাব ঘটিলেই অন্য উপায়ে গুটী ভিজা রাখিবেন। ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যেই গুটীতে শিকড় উদ্গত হয়। তারপর উহা কাটিয়া আনিয়া, কিছু দিন হাপোরে প্রতিপালন করিয়া, শেষে ৮।৯ হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ লাগাইয়া যাইতে হয়। এই চারা, বাগানে বসাইবার প্রশস্ত সময় আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত। বীজোৎপন্ন চারাও কিছু দিন হাপোরে প্রতিপালন করিয়া শেষে স্থায়িভাবে বাগানে বসাইবেন।

এই গাছগুলি খুব বড় হয় না। ৭।৮ হাত উচ্চ হয় এবং তদনুযায়ী ঝাড়াল হইয়া থাকে। গোলাপ জামের পক্ষে পুকুর বা ডোবার পাঁকমাটি ও পচা গোবর-সার উৎকৃষ্ট। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার গোড়া খুঁড়িয়া সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পাট করিতে হয়। এই সময়ে সামান্য পরিমাণে জল সেচন করিয়া কিছু দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখিতে হইবে। এই ভাবে জল বন্ধ না করিলে গাছ মুকুলিত হইতে বাধা পায়।

পরে যখন গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করিবে, তখন মাঝে মাঝে অধিক পরিমাণে জল দিতে হইবে। এই সময় গাছে রসাভাব হওয়া বড়ই অনিষ্টজনক। কাজেই প্রয়োজন বুঝিয়া—অর্থাৎ মাটির রসভাব লক্ষ্য করিয়া নিয়মিত জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

গ্রীষ্মকালে এই ফল পাকিতে থাকে। এই ফল হইতে গোলাপ জলের মত একটা সুঘ্রাণ আসে এবং পাকিলে ইহার বর্ণ ঈষৎ গোলাপী হইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয়, ইহার নাম হইয়াছে "গোলাপ জাম"। সুপক্ক গোলাপ জাম অতি উপাদেয় রসনা-তৃপ্তিকর ফল। এই ফল খুব বেশী দিন থাকে না। পাকিতে আরম্ভ করিলে ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। এই ফল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই বিশেষ প্রিয়।

অনেক সময় শীতকালেও ইহার পাকা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই অকালের ফলে গ্রীষ্মের ফলের মত সৌরভ ও রস থাকে না।

গ্রেপফ্রুট (Grape fruit)

গ্রেপফ্রুট বিদেশী ফল। ভারতে পূর্ব্বে ইহার প্রচলন মোটেই ছিল না। বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় জনসাধা-

রণের ভিতরে ইহার প্রচলনও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকায় ইহা বিশেষভাবে আদৃত।

ইহা আমাদের দেশীয় বাতাবী লেবুর মত এক প্রকার ফল-বিশেষ। বাতাবী লেবুর মত ইহার ভিতরও জাতিবিশেষে লাল ও সাদা হইয়া থাকে। এই ফল খুব রসাল ও মধুর স্বাদবিশিষ্ট। ইহার ভিতরে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে বলিয়া ইহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রচলন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

বর্ষাকাল ও শীতকাল এই চারা রোপণের সময়। বীজে এবং কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করা যায়। চোক এবং গুল-কলমই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত। দোআঁশ প্রকৃতির জমি ইহার পক্ষে উপযোগী। ক্ষেত্রে ১৫ হাত অন্তর দুই হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া, সারযুক্ত মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া, শেষে এক একটা চারা বসাইয়া যাইতে হয়। চারা লাগাইয়া, মাটির রসভাব অনুযায়ী ইহাতে জল সেচন করা কর্ত্তব্য। এই গাছ ফলবান্ হইতে প্রায় ৬।৭ বৎসর কাল লাগিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে এই গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে।

বিস্তৃতভাবে চাষ করিয়া সহর অঞ্চলে চালান দিতে পারিলে ইহা দ্বারা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করা চলে।

———

চালতা (Delinia speciosa)

অম্লরসযুক্ত ফলের ভিতরে চালতা অন্যতম। পশ্চিম বা উত্তরবঙ্গে চালতার ব্যবহার খুব কম, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ইহার প্রচলন খুব বেশী। পল্লীর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ইহার দুই একটী গাছ আছে। বাস্তবিক পক্ষে অম্লরসযুক্ত হইলেও চালতা অতি মুখরোচক ফল। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে এই গাছ ভাল জন্মে এবং ফলও দেয় প্রচুর। কোন কোন গাছে বার মাস ফল পাওয়া যায়। ইহার আচার, মোরব্বা, চাটনী অতি উপাদেয়। পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাগণ ইহা হইতে একরূপ উত্তম নাড়ু প্রস্তুত করেন। উহা অতি মুখ-রোচক ও তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে।

বাগানের সাধারণ মাটিই ইহার উপযুক্ত। ইহা খুব সহ-জেই জন্মে। বীজ হইতে ইহার চারা প্রস্তুত হয়। বর্ষা-কালই চারা রোপণের এবং চারা প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। এ গাছের পক্ষে বিশেষ কোন সার বা পরিচর্য্যার দরকার হয় না। এই গাছ খুব বড় হইয়া থাকে। ফলগুলি অত্যন্ত ভারী ও আকারে বড় হয়। চালতায় বেশ একটা সৌরভ আছে। শীতকালে অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসে ইহা পাকিতে আরম্ভ করে।

শীতের দিনে খেজুরের রস সহ পাকা চালতার অম্বল অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। পাকা চালতায় টক রস সাধারণতঃ

কম থাকে। কোন কোন গাছের ফলে টকের লেশমাত্র থাকে না। কাঁচা অবস্থায় কচি চালতার অম্বল বেশ রুচিকর ও উপকারী।

জলপাই (Olive)

ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই জলপাই গাছ সহজে জন্মিলেও ইহা ভারতের নিজস্ব ফল নহে। ইউ-রোপেই ইহা প্রথমে জন্মে এবং ক্রমে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত অনেক স্থানেরই মৃত্তিকা ও জল বায়ু ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই গাছ খুব উচ্চ হইয়া থাকে।

কলমে ও বীজে, উভয় প্রকারেই ইহার চারা প্রস্তুত হইতে পারে; চারা প্রস্তুতের উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। এক একটী গাছে প্রচুর জলপাই ফলিয়া থাকে। ফলগুলির আকার অনেকটা নারিকেলী কুলের মত। ইহার স্বাদ অম্ল। ফল-গুলি পাকিলেও ইহার বর্ণের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে না।

জলপাই হইতে প্রস্তুত আচার ও চাটনী বেশ মুখরোচক খাদ্য। ইহা অপর বিশেষ কোন প্রয়োজনে আসে না। জলপাইর বীজ হইতে প্রস্তুত 'অলিভ-অয়েল' বিশেষ মূল্য-বান্ জিনিষ।

জামরুল। (Star Apple)

জামরুল অত্যন্ত রসাল ফল। ইহা তৃষ্ণানিবারক। জামরুল সাধারণতঃ দুই রকমের দেখা যায়; এক রকম লাল এবং অন্য রকম সাদা। তুলনায় সাদা জামরুলই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

অনেকের মতে সাদা জামরুলের জন্মস্থান ভারতবর্ষ নহে। লাল জাতীয় জামরুলই ভারতে প্রথম জন্মে, কিন্তু তাহা হইলেও লাল অপেক্ষা সাদা জামরুলই এ দেশে অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ইহারও বীজ হইতে চারা তৈরী করা হয়। তবে শীঘ্র ফল পাইবার জন্য লোকে কলমেই চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলমের চারায় ২ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরিয়া থাকে। বীজের চারায় ফল ধরিতে খুব বিলম্ব হয় এবং তুলনায় কলমের ফল অপেক্ষা এই গাছের ফল নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। গুটী-কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

জামরুলের পক্ষে সাধারণ জমিই উপযোগী। শরতের শেষে বা হেমন্তের প্রথমেই ইহার পাট করিতে হয়। গাছের গোড়া খনন করিয়া, ছাই ও পচা গোবর-সার মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হয়। তার পর ২।১ বার জল দিয়া, জল বন্ধ রাখিতে হয়। শেষে ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন ফল ধরিতে

আরম্ভ করে, সেই সময়ে নিয়মিত ভাবে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ থাকে বলিয়া গোড়ায় প্রচুর জল দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলেও বর্ষার জল পাইলে ফলের স্বাদ অপেক্ষাকৃত বিকৃত হইয়া পড়ে। একটু ঠাণ্ডা জায়গায় গাছ রোপণ করিয়া, গোড়ায় নিয়মিত জল দিতে পারিলে ফল বড় হয়। একই সময়ে এই গাছে দুই বার ফল হয়। প্রথম বারের ফল কিছু বড় হইলেই গাছে আবার ফুল ধরিতে আরম্ভ করে এবং ঐ প্রথম বারের ফল শেষ হইতে না হইতেই দ্বিতীয় বারের ফল তৈরী হইয়া উঠে। বারমেসে এক জাতীয় জামরুল আছে। শীত-কালে মাঘ মাসেও ইহার পাকা ফল পাওয়া যায়।

জামরুল গাছ বেশ বড় হয়। ইহার শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই জন্য এই গাছের ব্যবধান একটু বেশী রাখিতে হয়। ১৫।২০ হাত অন্তর এক একটী গাছ রোপণ করিতে হয়।,

বাঙ্গালা দেশে এই ফল প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া থাকে। দারুণ গ্রীষ্মে এই ফলের প্রয়োজনীয়তা সকলের কাছেই সমান। এই কারণে জামরুলের চাষ বিশেষ লাভজনক সন্দেহ নাই।

কেগ্ ও মালক্কা জাতীয় জামরুল বেশ বড় ও উৎকৃষ্ট।

———

ডালিম (Pomegranate)

ডালিমের বিশুদ্ধ নাম দাড়িম্ব। ডালিম বেশ পুষ্টিকর রসাল ফল। বাঙ্গালা দেশে ডালিম তত উৎকৃষ্ট হয় না। ইহাদের দানাগুলিতে শাঁসের অংশ খুব কম থাকে। বীজগুলি বড় হয়, স্বাদ ও রসেরও ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। পেশোয়ার, কাশ্মীর, কাবুল, আরব প্রভৃতি অঞ্চলের ডালিম অতি উৎকৃষ্ট। এগুলিকে বেদানা বলা হয়। বেদানা, ডালিমেরই অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ। তুলনায় কাবুল ও আরব দেশের বেদানাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এগুলি আকারে যেমন বড়; তেমনি রসাল ও সুমিষ্ট। জল বায়ুর তারতম্যই এই বিভিন্নতার কারণ। বাঙ্গালা দেশের মাটি খুব সরস, কিন্তু জল বায়ু খুব আর্দ্র। জল বায়ুর এই আর্দ্রতার এবং মাটির রসস্থতার জন্যই বঙ্গদেশের ডালিম এত নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। জমিতে রসাভাব ঘটে না বলিয়া এ দেশে গাছ বেশ বড় ও ঝাড়াল হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট ডালিম জন্মাইতে যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন, তাহা এই মৃত্তিকায় নাই বা যেটুকু আছে, তাহার পরিমাণ খুবই কম।

বঙ্গদেশে ডালিম গাছ রোপণ কালে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে। যে স্থানে গাছটী রোপণ করিবেন, সেই জায়গার ৩।৪ হাত পরিমিত

স্থান গভীর গর্ত্ত করিয়া রাবিশ, পোড়ামাটি ইত্যাদি প্রথমে দিয়া, পরে তদুপরি গাছ রোপণ করিবেন। ইহাতে জমির আর্দ্রতা গাছে লাগিবে না। শিকড়গুলিও মৃত্তিকার গভীর স্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিকড় যত মাটির নীচে যাইবে, ফল তত খারাপ হইবে; আর উপরে যত ভাসমান থাকিবে, ততই গাছ ঝাড়াল হইবে এবং ফল ভাল হইবে।

ভিজা স্যাঁতসেঁতে জমিতে এই গাছ রোপণ করিলে ফলে কীট দেখা দেয়। তাহাতে ফলগুলি অনেক সময় অকালে ঝরিয়া পড়ে এবং যেগুলি গাছে থাকে, সেগুলিও অখাদ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য অপেক্ষাকৃত শুষ্ক উচ্চ জমিতে ডালিম গাছ রোপণ করা বিধেয়। জমিটী এরূপ স্থানে নির্ব্বাচন করিবেন, যেন বর্ষার জল কোন ক্রমে না দাঁড়াইতে পারে।

বীজ হইতে ডালিমের চারা হয়। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যে ২।১টী গাছ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বীজেরই চারা। গুটী-কলম, দাবা-কলম ও ডাল-কলমে ইহার চারা প্রস্তুত হয়। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ক ফলের পরিপুষ্ট বীজ সংগ্রহ করা সমীচীন। বীজের চারাকে খাসী করিয়া, শেষে স্থায়িভাবে রোপণ করিলে ভাল হয়। চারাটী তুলিয়া উহার মূল শিকড়টী বিশেষ সতর্কতার সহিত ছাঁটিয়া দেওয়াকে খাসী করা বলে।

চারা প্রস্তুতের উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। এই সময়ে গুটী ও দাবা-কলম তৈরী করিতে হয়। অর্দ্ধপরিপক্ক সুপুষ্ট ডাল

চোক সহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, হাপোরে বসাইয়া ডাল-কলম প্রস্তুত করিতে হয়। আষাঢ় শ্রাবণ হইতে পৌষ মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই গাছ স্থায়িভাবে জমিতে রোপণ করা চলে।

জমিতে চারা রোপণ করিবার সময় গোড়ায় যে সমস্ত ফেঁকড়ী বা দুর্ব্বল শাখা প্রশাখা জন্মে, সেগুলিকে কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। যে কোন সময়ে ঐ সব ফেঁকড়ী উদ্গত হইতে দেখিবেন, সেই সময়েই উহা কাটিয়া ফেলিবেন। উহারা গাছের অনাবশ্যক ভারবিশেষ। উহাদের দ্বারা গাছের কোনই উপকার হয় না, বরং উহাদের পরিপোষণের জন্য গাছকে অযথা শক্তি ব্যয় করিতে হয়। এগুলি গাছের পক্ষে সময়বিশেষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মরা, শুকনা অথবা কীটাক্রান্ত ডাল ও পাতাগুলি কাটিয়া ফেলিবেন। গাছের যে অংশে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিবেন, তৎক্ষণাৎ সেই অংশ তুলিয়া ফেলিয়া, আগুনে পোড়াইয়া দিবেন। তুলিয়া ফেলিলে গাছের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইবে বুঝিলে অন্য উপায়ে তৎপ্রতীকারে যত্নবান্ হইবেন।

এই গাছের বিশেষ পরিচর্য্যা করা দরকার। একেই ত এ দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা ইহার প্রতিকূল, তার উপর যদি উপযুক্ত পরিচর্য্যাও না পায়, তবে যে ফল অতি নিকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। অগ্রহায়ণ মাসে ইহার গোড়া খুঁড়িয়া শিকড়গুলিকে বাহিরের আলো ও বাতাস খাওয়াইতে হইবে। অন্ততঃ দুই সপ্তাহ কাল এই ভাবে

অনাবৃত অবস্থায় গোড়াটী রাখিয়া দিবেন। শেষে পুরাতন রাবিশ গুঁড়া করিয়া সমপরিমাণ গোময়-সার ও মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ ঢাকিয়া দিবেন। ইহাতে ফল অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে।

পৌষ মাসেই এই গাছ মুকুলিত হইয়া উঠে। এই সময় নানারূপ পোকা আসিয়া ঐ ফুলে বাস করিতে থাকে। ঐ ফুল ফলে পরিণত হইলেও উহারা ফলের ভিতরেই থাকিয়া যায় এবং তন্মধ্যে বংশ বিস্তার করিয়া, ক্রমে ফলটীকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। জল বায়ু ও মৃত্তিকার আর্দ্রতার জন্যই ঐ সব কীট সৃষ্ট হয়। ভূমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক প্রকৃতির হইলে এবং মুক্ত আলো ও বাতাসের সংস্পর্শ পাইলে পোকার আক্রমণ হ্রাস পায়। নতুবা ছায়া-শীতল স্থানের গাছ হইলে উহারা খুবই বৃদ্ধি পায়। গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলেই মাঝে মাঝে গাছতলায় ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ ধোঁয়ায় কীটগুলি ফুলে থাকিতে পারে না। ফলগুলি একটু বড় হইলে আল্‌গা ভাবে চট বা পুরু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলে উত্তম হয়। ইহাতে ফলের রস ও গন্ধের উৎকর্ষতা জন্মে। মাঘ মাস হইতেই এই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। কাঁচা অবস্থায় ইহার দানায় একটু কষায় ভাব থাকে এবং একটু অম্লরসও থাকে। কিন্তু পাকিলে বেশ মিষ্ট হয়।

আফগানিস্থান, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর বেদানা এতদঞ্চলে বিক্রয়ার্থে চালান হইয়া এ দেশে আসিয়া

থাকে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ডালিমের চাষ করিতে পারিলে বেশ লাভবান্ হওয়া যায় সন্দেহ নাই। ইহা রোগী, ভোগী উভয়েরই তুল্য আদরের।

ডুরিয়ান (Durian)

ডুরিয়ান ভারতীয় ফল নহে। মালয় উপদ্বীপে ইহা প্রথমে জন্মে। নূতন টাটকা বীজ বপন করিয়া ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। দো-আঁশ জমি ইহার পক্ষে উপযোগী। এই গাছ আকারে খুব বড় হয় বলিয়া প্রায় ২৫ হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ রোপণ করিতে হয়। ডুরিয়ান ফল দেখিতে অনেকটা কাঁঠালের মত, কিন্তু খাইতে ইহা কাঁঠালের মত প্রীতিকর নহে, বরং ইহার গন্ধ অনেকের নিকটেই অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। এই জন্য এতদ্দেশে এই ফলের চাহিদা বিশেষ নাই। তবে ইউরোপীয় মহলে ইহার কাট্‌তি নিতান্ত মন্দ নহে।

মাঘ মাসে এই গাছে ফুল হয় এবং ভাদ্র মাসে এই ফল পাকিয়া থাকে। এই ফলের চাষ করিয়া ইউরোপীয়বহুল স্থানে চালান দিতে পারিলে ভাল হয়।

তাল। (Palm)

সুখাদ্য ফলের জন্য তালের চাষ কেহ বিশেষ করে না। ইহা অতি সাধারণ বৃক্ষমধ্যে গণ্য। এই গাছগুলি খুব সরল ও উচ্চ হইয়া থাকে। তালগাছকে অনেকেই অমঙ্গলজনক বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন এবং তজ্জন্য বাড়ীর সীমানার ভিতরে বা উদ্যানবিশেষে ইহার স্থান নাই বলিলেও চলে। তালের প্রতি এতটা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলেও তালগাছ আমাদের অনেক উপকারে আসিয়া থাকে এবং ব্যবসায় হিসাবে চাষ করিলে ইহা দ্বারাও যথেষ্ট লাভবান্ হওয়া যায়।

তালগাছ বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়। একটী সুপক্ক ফল বপন করিলে ২৫।৩০ দিনের ভিতরেই অঙ্কুর বাহির হয়। শেষে কিছু দিন পরে উহাকে তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট জমিতে রোপণ করিতে হয়। ৮।১০ হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ লাগাইয়া যাইতে হয়। সাধারণ মাটিতেই ইহা বেশ জন্মে। পাঁকমাটি ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। এ গাছের জন্য তদ্বিরাদি বিশেষ কিছুই করিতে হয় না। গোড়া মাটির উপর জাগিয়া উঠিলে পাঁকমাটি বা নূতন মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

তালগাছ ফলিতে অনেক দিন লাগে। কিন্তু ইহা বাঁচেও দীর্ঘকাল। একটী তালগাছ রোপণ করিলে ২।৩ পুরুষ উহার ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারে।

ফাল্গুন মাস হইতেই তাল ফলিতে আরম্ভ করে। সুপক্ক তাল অপেক্ষা, কচি তালই অধিক আদরণীয়। পাকা তাল অনেকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দুরন্ত রৌদ্রে তাপিত হইয়া, কচি তালের শাঁস ও জল পান, অত্যন্ত আরামদায়ক। কচি অবস্থায়, ইহার ভিতরে কোমল সুস্বাদু শাঁস ও জল থাকে। দারুণ পিপাসায় ইহা অতি উত্তম পানীয় এবং খাদ্যও বটে। ইহার জল খুব উপকারী। চৈত্র মাস হইতেই, প্রচুর পরিমাণে কচি তাল বাজারে আমদানী হইতে থাকে। ইহাকে চলিত কথায় তালশাঁস কহে। তালশাঁসের জল হিক্কা রোগের মহৌষধ।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই তাল পাকিতে আরম্ভ করে এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত উহা পাওয়া যায়। পাকা তালে ছিবড়ে জন্মে। ঐ ছিবড়ে নিংড়াইলে, খুব ঘন মিষ্ট রস নির্গত হয়। ঐ রস দিয়া—পিষ্টক, বরফি বা তক্তি প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। তালের ভিতরে একাধিক আঁটি থাকে। উপরের রস নিংড়াইয়া, আঁটিগুলি ছাই গাদার ভিতরে রাখিয়া দিলে, নারিকেলের ফোঁপলের মত এক প্রকার শাঁস জন্মে। উহা খুব স্নিগ্ধ, শীতল ও তৃপ্তিদায়ক।

খেজুর গাছের মত, তাল গাছ হইতেও সুমিষ্ট রস পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ খেজুরের মত ঐ রস সকলের নিকট আদরণীয় নহে। তালের রসে স্বাভাবিক একটা মাদকতা আছে। যাহারা ঐ রস সংগ্রহ করে, তাহারা নানাবিধ মশলা

সংযোগে, উহার মাদকতা আরও তীব্র করিয়া দেয়। সেই-জন্য উহা তাড়ি নামেই অভিহিত। ইতর শ্রেণীর লোকেরা তাড়ি পান করিয়া নেশা করে। কিন্তু বিশুদ্ধ তালের রস খুব উপকারী। বিশুদ্ধ তালের রস হইতে, উত্তম তালপাটালী, গুড়, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তালমিশ্রি অনেক রোগের মহৌষধ এবং রোগী বিশেষের পথ্য।

তাল গাছের পাতা হইতে পাখা তৈরী হয়। গরমের দিনে, ভারতের সর্ব্বত্র এই পাখার আদর অত্যন্ত বেশী। আজকাল সহর অঞ্চলে বিজলী পাখার চলন হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস, তাল পাখার বাতাসের মত স্নিগ্ধ-শীতল নহে।

তালের কাণ্ড খুব দৃঢ় ও লম্বা। ইহা দ্বারা বড় বড় ঘরের খুঁটী, আড়া প্রভৃতি তৈরী হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে তালের কাণ্ড দ্বারা এক প্রকার ডোঙ্গা-নৌকা প্রস্তুত হয়।

প্রাচীন কালে তালপাতায় পুস্তক রচনা করা হইত। এখনও বহু প্রাচীন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তালপাতায় লেখা দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিদ্যারম্ভের সময়, তালপাতায় অক্ষর পরিচয় করাইবার প্রথা, এখনও বাঙ্গালার অনেক পল্লীতে রহিয়াছে। ইহাতে কাগজ, পেন্সিল শ্লেট ইত্যাদির দরুণ অর্থব্যয়ের সাশ্রয় ত হয়ই, উপরন্তু শিক্ষাও সহজে সুন্দররূপে হইয়া থাকে। তালপাতা দ্বারা একরূপ সুন্দর চাটাই প্রস্তুত হয়।

ব্যবসায় বুদ্ধি লইয়া এই নগণ্য বৃক্ষের চাষ করিলে, ইহা দ্বারাও লোকে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পাকা তাল পিত্ত বর্দ্ধক, কফজনক ও রক্ত বর্দ্ধক। ইহা একটু গুরুপাক, তন্দ্রাজনক ও মূত্রজনক। তালশাঁস কফবর্দ্ধক বটে কিন্তু বাতঘ্ন ও পিত্তনাশক।

তুঁত (Mulberry)

তুঁত ভারতীয় ফল। এ দেশে রেশমের ব্যবসায় যখন খুব বিস্তৃত ছিল, তখন তুঁত ফলের চাষও বিশেষ বিস্তৃতভাবে হইত। কারণ পলু নামক রেশমকীট প্রতিপালনের জন্য, তুঁত পাতা বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। এই গাছের পাতা রেশমকীটের অতি প্রিয় খাদ্য। অধুনা উক্ত কীটের চাষ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া, তুঁতের চাষও কমিয়া যাইতেছে। সিংহলের অনেক বিদ্যালয়ে এই গাছ রোপণ করা হইয়া থাকে। পলু-পালকগণ উক্ত গাছ হইতে পাতা ক্রয় করিয়া লইয়া থাকেন।

ইহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মিতে পারে, তবে দোআঁশ জমিই এ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রশস্ত। এই গাছ প্রায় ২৫ ফিট উচ্চ এবং বেশ ঝাড়াল হয়। ইহার বীজ এবং খণ্ড শাখা হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। বর্ষাকালই এই চারা প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট সময়। জমিতে ১৪ হাত অন্তর এক একটী

গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে গোশালার আবর্জ্জনা পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিবেন। তারপর প্রত্যেক গর্ত্তে, এক একটী চারা বসাইয়া যাইবেন। চারা রোপণ করিয়া, জমির রসভাব অনু-যায়ী নিয়মিত ভাবে জল সেচন করিতে হয়।

এই গাছের বিশেষ কোন পাট নাই। গাছের ফল নিঃশেষ হইয়া গেলে পর, জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরাতন মোটা মোটা ডালগুলি উপরের দিক হইতে কতকাংশ কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং গোড়ার মাটি উত্তমরূপে ওলট পালট করিয়া সার প্রয়োগ করিতে হয়।

ফাল্গুন মাস হইতেই এই গাছ মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই গাছের ফল ফুরাইয়া যায়। তুঁত ফল আকারে পিপুলের মত, তবে পিপুল অপেক্ষা ইহা কিছু পুষ্ট ও লম্বা হইয়া থাকে। ইহার স্বাদ অম্লমধুর। বঙ্গদেশের তুঁত ফল অপেক্ষা পঞ্জাব বা যুক্তপ্রদেশের তুঁত ফল উৎকৃষ্ট। এই ফলের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতি আছে। তন্মধ্যে এমিণ তুঁতই উৎকৃষ্ট। ইহার ফল বেশ মিষ্ট, বড় ও সুস্বাদু। দেশী তুঁত ফলে খুব বেশী কিন্তু ফলগুলি ছোট ও খাইতে এমিণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ব্যবসায় হিসাবে এমিণ তুঁতের চাষ বেশ লাভজনক।

নোনা (Anona Reticulata)

নোনা আতা জাতীয় ফল, কিন্তু গুণে ইহা আতা হইতে নিকৃষ্ট। ইহারও বীজ হইতে চারা জন্মে। বর্ষাকালে হাপোরে চারা প্রস্তুত করিয়া, পৃথক্ হাপোরে কিছু দিন প্রতি-পালন করিতে হয়। শেষে পরবর্ত্তী বর্ষায় ইহা স্থায়িভাবে বসাইতে হয়।

দোআঁশ কর্দ্দমাক্ত জমি এই গাছের পক্ষে প্রশস্ত। গাছ লাগাইয়া, মাঝে মাঝে গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে কোনরূপ আগাছা না জন্মে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে নূতন মাটী চাপা দিতে হইবে। আবশ্যক মত জল সেচন করাও কর্ত্তব্য।

ইহা গ্রীষ্মের ফল। বৈশাখ মাস হইতেই পাকা নোনা পাওয়া যায়। ইহা আতার মত অত রসাল ও সুগন্ধি নহে। আতা হইতে নিকৃষ্ট হইলেও, খাইতে এ ফলও বিশেষ সুস্বাদু। এ ফলগুলির উপরিভাগে আতার মত খাঁজ নাই। ইহা পাকিলে পীতাভ লালবর্ণ হয়।

বানর এবং নানারূপ পক্ষী এই ফল নষ্ট করে। এই ফল পাকিতে আরম্ভ করিলেই গাছটী জাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

নোনা গাছের ছাল হইতে উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত হয়। এই

ছাল জলে কাচিয়া লইলে যে আঁশ বাহির হয়, তাহা দ্বারাই দড়ি প্রস্তুত হয়। নোনা গাছের এই আঁশ, কাগজ প্রস্তুতের অন্যতম উপাদান।

ন্যাসপাতি (Pear)

ন্যাসপাতি শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল। এ দেশে পূর্ব্বে ইহা একটু দুষ্প্রাপ্য ছিল। আফগানিস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশ হইতে এই ফল প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। আজকাল ভারতের অনেক স্থানে এবং বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে এই ফল জন্মিতেছে। নিম্নবঙ্গের নাবাল জমিতে ইহা ফলে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে আজকাল ইহা বেশ ফলিতেছে। তবে স্থানবিশেষে ইহার স্বাদ ও আকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কাবুলী ন্যাসপাতির শাঁস অতি কোমল এবং তাহাতে একটা সুঘ্রাণ আছে। এ দেশীয় ফল অতটা কোমল ও ঘ্রাণযুক্ত না হইলেও, বেশ রসাল ও মুখরোচক হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন বাঙ্গালা দেশে ইহা ফলে না, তাঁহারা মহাভ্রম করিয়া থাকেন। আমি স্বচক্ষে অনেক বাগানে ইহা ফলিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় আজকাল যে আশাতীত কম দরে ইহা বিক্রয় হয়, তাহারও কারণ এ দেশে ইহার প্রচুর ফলন। সুদূর শীতপ্রধান অঞ্চল হইতে

আমদানী করিতে হইলে, এত সুবিধাদরে ন্যাসপাতী বিক্রয় হইতে পারিত না।

ইহার দাবা ও গুল কলমে চারা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার জমি অপেক্ষাকৃত সরস হওয়া দরকার। কর্দ্দমপ্রবণ ও দোআঁশ জমিই ইহার পক্ষে উপযোগী। ইহার চাষে, মাটি খুব ভালরূপে কর্ষণ করিতে হয়। তারপর গোবর সার, খইল সার ও হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া, জমিটীকে পাট করিতে হয়। এ দেশে এই গাছের খুব পরিচর্য্যা করা দরকার। আট হাত ব্যবধানে এই গাছ লাগাইতে হয়।

আশ্বিন মাস হইতে এই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে ইহা একটী লাভজনক ব্যবসায় হইতে পারে সন্দেহ নাই। কলিকাতায় এই ফলের প্রাচুর্য্য থাকিলেও, মফঃস্বলে এখন পর্য্যন্ত ইহা তত প্রসার লাভ করে নাই। মফঃস্বলে এই ফলের বিস্তৃত বাজার পড়িয়া রহিয়াছে।

নারিকেল (Cocoanut)

আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় ফলের মধ্যে, নারিকেলের স্থান সর্ব্বোচ্চে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শীত-গ্রীষ্ম বার মাস নিত্য ব্যবহারে, পূজা-পার্ব্বণে, এই ফলের আবশ্যকতা আমরা

যতটা অনুভব করি, অন্য কোন ফল সম্বন্ধে সেরূপ করি না। অন্যান্য ফল আমাদের ভোগের সামগ্রী কিন্তু নারিকেল শুধু ভোগের নয়,—যে কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে হিন্দুজগতের সর্ব্বত্রই ইহা সমভাবে আদৃত। আমাদের জীবন যাত্রার সঙ্গে, এই ফলটী এরূপ ওতঃপ্রতঃভাবে জড়িত হইবার মূলে, অনায়াসলব্ধ প্রাচুর্য্যই বোধ হয় বেশী। সমুদ্রমেখলা ভারতের বিস্তীর্ণ উপকুল বিভাগে, নদীমাতৃকা বাঙ্গালার নদী-কূলে, স্বভাবজাত সংখ্যাতীত শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল কুঞ্জ বিদ্যমান। নিম্নবঙ্গ, মান্দ্রাজ, সিংহল প্রভৃতি দেশে ইহার প্রাচুর্য্য এত অধিক যে, নিত্য ব্যবহার্য্য অন্ন ব্যঞ্জনের মত, নারিকেলও তথা-কার অধিবাসীদের নিকট নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর ভিতরে অন্যতম হইয়া পড়িয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে নারিকেল উৎপন্ন হয়, স্থানীয় অধিবাসীদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন মিটাইয়াও, তাহা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ফল বাহিরে চালান হইয়া থাকে। এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় ফলের চাষ যে অত্যন্ত লাভ-জনক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ইহার বিস্তৃত আবাদ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেরূপ বহু বিস্তৃত চা বাগান (Tea Estate) প্রস্তুত হওয়ায়, বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আমদানী হই-তেছে, সেইরূপভাবে যদি উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বিস্তৃত ভাবে নারিকেল বাগান (Cocoanut Estate) প্রতিষ্ঠা

করা যায় তবে দেশবাসী, চা বাগান অপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইবেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপগুলিতে এইরূপ বহু নারিকেল বাগান (Cocoanut Estate) আছে এবং তদ্বারা বহু বেকার প্রতিপালিত হইতেছে ও দেশেরও সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমুদ্রোপকূলই নারিকেল চাষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। সাগরের লবণাক্ত জল বায়ু, সরস লবণাক্ত মৃত্তিকা, নারিকেলের পক্ষে অতি উপকারী। সমুদ্র হইতে যতই দূরে যাওয়া যাইবে, ততই গাছের আকৃতি খর্ব্ব হইবে, ফলন কমিতে থাকিবে এবং মিষ্টত্বও হ্রাস পাইবে। এই জন্যই নিম্নবঙ্গে যেরূপ নারিকেল জন্মে, উত্তরবঙ্গে সেরূপ জন্মে না—অনেক সময়ে ফলই ধরে না। আবার মান্দ্রাজ বা সিংহলেব উপকূল বিভাগ, বাঙ্গালার উপকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, সেই সেই দেশের গাছ ও ফল, এ দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলের মত বড় বড় নদীর তীরেও উত্তম নারিকেল জন্মে। সমুদ্রোপকূলে নারিকেল তাহার স্বভাবের অনুকুল আবহাওয়া ও খাদ্যাদি যতটা পাইতে পারে, নদীকূলে ততটা না পাইলেও প্রতিকুল কোন অবস্থার সঙ্গে ইহাকে যুদ্ধ করিতে হয় না।

শুধু সমুদ্রোপকূল বা বড় নদীকূল হইলেই যে তথাকার সর্ব্বত্র নারিকেলের আবাদ চলিতে পারে তাহা নহে। স্থান ভেদে, মৃত্তিকার তারতম্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার পক্ষে বালুকাময় অতি উচ্চ বা অতি নীচু জমি মোটেই উপযোগী নহে। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্করময় ভূভাগও বিশেষভাবে পরিত্যজ্য।

দোআঁশ মাটীতে ইহা জন্মিলেও, এঁটেল মাটিই ইহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে বেলে মাটি-তেই ইহার আবাদ করিতে হয়, তবে প্রচুর পরিমাণে পুকুর বা ডোবার পাঁকমাটী উহাতে মিশ্রিত করিয়া, ভালরূপে চাষ দিয়া লইতে হইবে। তারপর ঐ জমিতে কিছু দিন কলার চাষ করিয়া কলার এঁটে, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি তথায় পচাইতে হইবে। এইভাবে মৃত্তিকার দোষ সংশোধিত করিয়া, পরে নারিকেল চারা বসাইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারি-কেলের পক্ষে আর্দ্র রসাল জমির প্রয়োজন। বালুকাপ্রধান ভূভাগ কখনও রসাল হইতে পারে না। রৌদ্রে উহা সহজেই তপ্ত হইয়া গাছের মূলকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এঁটেল মাটীও অবশ্য শুকাইলে অত্যন্ত নীরস ও কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু নদী বা সমুদ্রোপকূলে থাকায় উহা সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলীয় আবহাওয়ায়, মাটি সহজে শুষ্ক হইতে পারে না। উহার ধারকগুণ থাকায়, উহার ভিতরে রস বহু-দিন সঞ্চিত থাকিতে পারে।

নারিকেল বাগানে পুকুরের অত্যন্ত প্রয়োজন। পুকুর-পাড়ের নারিকেল খুব ভাল হইয়া থাকে। পুকুর কাটায়, নূতন মাটি উঠিয়া পাড়গুলিকে স্বভাবতঃই উর্ব্বরা করিয়া তোলে। তদুপরি উহার শিকড়গুলি চতুর্দ্দিকে গভীর ভাবে বিস্তৃত থাকিয়া, পুকুর হইতে অনায়াসে জলীয় রস আকর্ষণ করিয়া নিজ পুষ্টি সাধনে সক্ষম হয়। পুরাতন কোন জলা-

শয়ের তীরেও যদি নারিকেল গাছ থাকে, তবে মৃত্তিকা অপেক্ষা-কৃত বালুকাপ্রধান ও অনুর্ব্বরা হইলেও, উহার অসংখ্য শিকড় গভীর ভাবে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, উক্ত জলাশয় হইতে অপর্য্যাপ্ত রস সংগ্রহ করিয়া নিজের পুষ্টি সাধন করিতে পারে। উক্ত জলাশয়ের জন্য মৃত্তিকাস্থিত বালুকাও সহজে উত্তপ্ত হইয়া সহসা গাছের কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় না। নিম্নবঙ্গের পুকুরবহুল পল্লীগ্রামে পুকুর পাড়ে প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়। অন্যান্য স্থানে রোপিত নারিকেল অপেক্ষা, পুকুর পাড়ের ফল ও ফলন উভয়ই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

নারিকেলের জমি ঈষৎ ঢালু ও সমতল হইবে। মৃত্তিকা প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হইলে খুব ভাল হয়। এই জন্যই প্রবাল কীটোৎপন্ন দ্বীপগুলিতে নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট হয়। কীট দেহের স্তূপের উপরে পুঞ্জিভূত পলিমাটী জমাট বাঁধিয়া অতি উর্ব্বর ভূভাগের সৃষ্টি হয়। আফ্রিকার পূর্ব্বোপ-কূলে এইরূপ অনেক দ্বীপ আছে।

সকল সময়ে সকলের পক্ষে সব দিক দিয়া সুবিধাজনক জমি নির্ব্বাচন করা সম্ভব হইয়া উঠে না। তবে আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মৃত্তিকা অনুপযোগী হইলে তাহার দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারা যায় কিন্তু আবহাওয়া জনিত দোষের সংশোধন করা মানুষের সাধ্যাতীত। সেই জন্যই সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে যে আবহাওয়া এই চাষের

উপযোগী কি না। ইহা নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট সন্ধান লইয়া এবং জমির পারি-পার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়াই, এই বিষয় অনুধাবন করা চলে। মৃত্তিকা যদি চাষের অনুপযুক্ত হয়, তবে বিভিন্ন সার প্রয়োগে মৃত্তিকাকে শোধন করিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশীয় মতে শোধন প্রণালী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য সার প্রয়োগ প্রণালী—পরিশেষে দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে উপযুক্ত বীজ সংগ্রহ করা একটী দুরূহ ব্যাপার। নারিকেলের স্বতন্ত্র কোন বীজ হয় না। একটী আস্ত ফলই একটী বীজ। ঐ ফলটী যে প্রকৃতির হইবে, তদুৎপন্ন গাছেও ঐ প্রকৃতির ফল হইবে। এই জন্য বিশেষ ধীরতা ও বিবে-চনার সহিত বীজ সংগ্রহে মন দিতে হইবে। এই কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ বলিয়াই, সাধারণতঃ বীজ ব্যবসায়ীর সততার উপর নির্ভর করিতে হয়। যাঁহারা নিজেদের বিবেচনার উপর আস্থা রাখিয়া বীজ সংগ্রহে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

যে গাছ হইতে বীজের ফল সংগৃহীত হইবে, সেই গাছের আপাদ মস্তক ভালরূপে চিনিয়া লইতে হইবে। গাছের বয়স কত তাহা প্রথমেই জানা কর্ত্তব্য। অপরিণত গাছের ফলে উত্তম বীজ হয় না। নারিকেল গাছ ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে পরিণত হয়। এইরূপ পরিণত গাছ হইতে বীজ-ফল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। নূতন চারা হইতে বীজ-ফল সংগ্রহ

করিলে, সেই বীজের চারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে। গাছের কোনরূপ রোগ আছে কি না, কি প্রকার মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া গাছটী পুষ্ট হইতেছে, গাছের শাখা প্রশাখা-গুলি সুস্থ সবল কি না ইত্যাদি বিবেচনা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গাছে যদি কোন রোগ থাকে, তবে সেই রোগ ফলেও সংক্রামিত হইতে পারে। যে মাটি হইতে গাছ রস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মৃত্তিকার দোষগুণে মিশ্রিত রসেই ফলের পরিপুষ্টি হইতেছে। গাছের শাখা ও পত্রগুলিতে কোনরূপ বিকার ভাব থাকিলে, ঐ ফলোৎপন্ন গাছেও সেইরূপ বিকারগ্রস্থ শাখার উদ্ভব হইতে পারে। তারপর লক্ষ্য করিতে হইবে গাছের ফলন। ইহার ফলন যেরূপ হইবে, ঐ বীজোৎ-পন্ন গাছেও সেইরূপ ফলন হইবারই আশা করা যায়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও পরিচর্য্যা প্রণালীতে গাছের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন আনা যায় কিন্তু তাহা একটু সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তারপর দেখিতে হইবে ফলের আকার বড় কি ছোট। কাঁচা, পাকা সর্ব্ব অবস্থায় উহার আকারগত কি তারতম্য আছে। ফলের অভ্যন্তরস্থ জল ও শাঁসের পরিমাণ, স্বাদ ইত্যাদিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, সেই বৃক্ষ হইতে বীজ-ফল সংগ্রহ করিতে হয়। যে ফলটী বীজের জন্য সংগ্রহ করিবেন তাহা সুঠাম, সুগোল ও উপরিভাগ মসৃণ হওয়া দরকার। ফলটীর উপরি-ভাগে যেন খাঁজকাটা না থাকে—কোনরূপ অস্বাভাবিক দাগ

না থাকে, এগুলিও লক্ষ্যের বিষয়। ফলটী বেশ সুপক্ক হওয়া চাই। নারিকেল পাকিলে তামাটে বর্ণ ধারণ করে, উপরের খোলা শক্ত হয় এবং অঙ্গুলী দিয়া আঘাত করিলে স্পষ্ট ঝন্ ঝন্ শব্দ (clear high tone) বাহির হয়। যদি আঘাতের ফলে ঢেব ঢেব শব্দ (dull hollow sound) হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহা এখনও সুপক্ক হয় নাই। ফলটী পরিণত কি অপরিণত তাহা এই ভাবে বুঝিতে হইবে। উত্তম বীজে উত্তম বৃক্ষ এবং উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল, ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত। উপরোক্ত উপায়ে সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলে পর সেই বীজ সংগ্রহ করিবেন। অবশ্য ইহাতে হয় ত কিছু বেশী খরচ লাগিতে পারে। তাহা হইলেও এই অতিরিক্ত ব্যয় হইতেই ভবিষ্যতে অতিরিক্ত লাভ পাওয়া যাইবে। ভাল ব্যয় না করিলে ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতি-যোগীতায় জয়ী হইতে হইলে বা পরিশ্রমকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে, এইরূপ প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য করিলে, পরিণামে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

বীজের ফল সংগ্রহ করিবার সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়েকটী ফল সংগ্রহ করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সবগুলি বীজেরই যে কল্ বাহির হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার কল্ বাহির হইলেও তন্মধ্যে ২।১টী চারা যে দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হইবে না, তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। এমতা-বস্থায় প্রথমাবধি কিছু অতিরিক্ত বীজ পাত দিয়া রাখিলে

দৈবাৎ কোন বীজ বা চারা নষ্ট হইয়া গেলে, ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা হইতে অভাব পূরণ করা যাইবে। নতুবা শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে—কখন বা তাহা আর পূর্ণ ই হইবে না।

এইরূপে উত্তম বীজ-ফল সংগৃহীত হইলে, বর্ষার প্রাক্কালে উহাদিগকে হাপোরে বসাইয়া দিতে হয়। বাগানের এক নিভৃত ছায়াসঙ্কুল স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিবেন। ছায়া-সঙ্কুল বলিয়া যে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে স্থান তাহা নহে। মুক্ত আলো ও বাতাস ইহাদের পক্ষেও দরকারী কিন্তু মধ্যাহ্নের তীব্র রৌদ্র সহ্য করা ইহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। এই জন্য এরূপ স্থানে হাপোর তৈরী হইবে, যে সকাল ও বৈকালের প্রথম ও শেষ রৌদ্র উহারা ভোগ করিতে পারে। কোন বড় গাছের আওতায় হাপোর প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু গাছের ঠিক নীচে না করাই ভাল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাপোরের উপরে গাছটীর বিস্তৃত ছায়া পড়ে এবং বেলা শেষের সঙ্গেই ছায়া সরিয়া যায়, এইরূপ আওতায় স্থান নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। একেবারে গাছের ঠিক তলায় হাপোর থাকিলে, বর্ষাকালে গাছের টেপানি পড়িয়া হাপোরের ক্ষতি হইতে পারে। প্রথম হাপোরে বীজ-ফল পাত দিবার সময়, ব্যবধান কিছু কম রাখিলে কোনই ক্ষতি হয় না কিন্তু চারা বাহির হইলে, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত দ্বিতীয় হাপোরে স্থানান্তরিত করি-বার সময়, ব্যবধানের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হইবে। প্রথমতঃ

বীজ-ফলটী পাত দিবার সময়, বোঁটাটী উপর দিকে রাখিবেন এবং ঈষৎ হেলাইয়া বাঁকাভাবে ফলের অর্দ্ধেকটা পরিমাণ মাটির ভিতরে বসাইয়া দিবেন। মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস থাকিলে, এক মাসের মধ্যেই কল্ বাহির হইবে। কল্ বাহির হইলে, কিছু দিন অন্য হাপোরে প্রতিপালন করিয়া, শেষে স্থায়িভাবে জমিতে বসাইয়া দিবেন।

হাপোরে বসাইবার মত, স্থায়িভাবে জমিতে বসাইবারও প্রশস্ত সময় বর্ষাকাল। সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত, এই চারা বসান যাইতে পারে। আট হাত হইতে দশ হাত অন্তর লাইনবন্দী করিয়া, জমির সর্ব্বত্র এক হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া যাইবেন। গর্ত্তের উত্তোলিত মৃত্তিকার সঙ্গে, কিঞ্চিৎ লবণ ও ছাই মিশ্রিত করিয়া লইবেন। গর্ত্তের ভিতরে চারাটী ঈষৎ বক্রভাবে বসাইয়া, ঐ মাটী দ্বারা বেশ ভালরূপে গর্ত্তটী ভরাট করিয়া দিবেন। ছাই এবং লবণ মিশ্রিত থাকায়, মাটিতে সহজে উইপোকা ধরিতে পারে না। নতুবা অনেক সময় মাটিতে উই লাগিয়া চারাটী নষ্ট করিয়া ফেলে।

বর্ষায় চারা রোপণ করিলে চারাগুলি স্থানান্তরজনিত কষ্ট সহজেই সামলাইয়া লইতে পারে। বর্ষার জলে শিকড়গুলি খুব শীঘ্র মাটিতে দৃঢ়রূপে লাগিয়া যায়। অন্য সময়ে রোপণ করিলে, প্রকৃতির সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া, ইহারা মানবের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। নিয়মিত জল সেচন ও পরিচর্য্যা না

করিলে, চারাগুলির শিকড় সহজে মৃত্তিকালগ্ন হইতে পারে না। এ গাছ সহজে মারা যায় না সত্য, কিন্তু মারা না গেলেও, প্রয়োজনীয় সেবায় বঞ্চিত হইলে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অনেক সময় মারাও যায়। ইহার সেবা অর্থে গোড়া পরিষ্কার রাখা, নিয়মিত জল সেচন করা, কীট পতঙ্গের কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি বুঝায়। নবরোপিত সুকুমার চারা প্রখর রৌদ্রে ঝামরাইয়া না যায়, সে জন্য অল্প বিস্তর ছায়াদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ছায়াদানের জন্য অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করা অপেক্ষা, চারার নিকটে কলাগাছ রোপণ করিলে ভাল হয়। কলাগাছ যে শুধু ছায়াই প্রদান করে তাহা নহে, উহা মৃত্তিকাকে সরস রাখে; এঁটে, পাতা প্রভৃতি পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভূমি উর্ব্বরা করে এবং ঐ কলাগাছ হইতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া নারিকেলের দরুণ প্রাথমিক ব্যয়ের অনেকাংশ পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন। যে স্থানে নারিকেল চারাটী লাগাইবেন, তাহার উভয় পার্শ্বে ১ বৎসর পূর্ব্বেই ১টী করিয়া কলার তেউড় বসাইবেন। এই এক বৎসরের ভিতরেই, কলাগাছগুলি বেশ ঝাড়াল হইয়া উঠিবে। তখন উহাদের আওতায়, নারিকেল চারাগুলি বসাইয়া যাইবেন। কলাগাছের ছায়াতলে থাকিয়াও চারাগুলি মুক্ত আলো ও বাতাস পাইবে। শেষে যখন দেখিবেন নারিকেল চারাগুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, তখন কলাগাছগুলি কাটিয়া

ফেলিবেন। এই সময় কলাগাছ না কাটিলে, মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদ—খাদ্যের অভাব ঘটিতে পারে। তাহাতে নারিকেলের চারাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে। সুতরাং কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া, এ সময় সমস্ত কলাগাছ কাটিয়া ফেলিবেন। তেউড়গুলি তুলিয়া অন্যত্র বসাইবেন। নারিকেলের জমি যদি বেলে প্রকৃতির হয়, তবে এইরূপে কলাগাছ রোপণ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

নারিকেল গাছে সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসরেই ফলন আরম্ভ হয়। জমিতে স্থায়িভাবে বসাইবার পর, অন্ততঃ দুই বৎসর কাল উহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত, অপর সময়ে নিয়মিত জল সেচন দ্বারা, গোড়ার মাটি সর্ব্বদা সরস রাখিতে হয়। অত্যন্ত রৌদ্রের সময় গাছের গোড়া ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য, পুকুরের পানা তুলিয়া গোড়া ঢাকিয়া রাখিলে উত্তম হয়। শেষে ঐ পানা পচিয়া আবার গোড়ায় সারের কার্য্যও করিয়া থাকে। জমিতে কোনরূপ আগাছা না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উহাদের কাণ্ডে, শাখায়, পত্রে কেহ কোন আঘাত না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরই কিছু লবণ, খইল, পচাগাছ সার, পুকুর বা ডোবার পাঁকমাটি, শ্যাওলা, পানাপচা মাটি ইত্যাদি গোড়ায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এই গাছ যতই বড় হইতে থাকিবে, কাণ্ড ততই মৃত্তিকার উপরে জাগিয়া উঠিবে। তখন প্রত্যেক বৎসরই, পূর্ব্বোক্ত সার মাটি দ্বারা

গোড়া ঢাকিয়া দিবেন। মাঘ ফাল্গুন মাসে এই ভাবে গোড়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। নতুবা গোড়ায় অতিরিক্ত তাপ লাগিয়া ফলের আকার ক্ষুদ্র হয় এবং ফলগুলি সংখ্যায় হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু এইভাবে ঢাকা থাকিলে ফল বড় হয়, ফলন প্রচুর হয় এবং শাঁসে ও জলে মিষ্টতা জন্মে।

প্রকৃতির নিয়মে যদিও ৬৷৭ বৎসরের মধ্যেই গাছে ফল ধরা উচিত, কিন্তু অনেক সময় গাছ অত্যধিক তেজাল হওয়ায় ফল ধরিতে বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রে, গাছের তেজ হ্রাস করা প্রয়োজন। অন্যান্য গাছের তেজ কমাইবার জন্য যেরূপ ডাল ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া এবং শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়, নারিকেলের কিন্তু তাহা কিছুই করিতে হয় না। ইহাদের তেজ হ্রাস করিতে হইলে, কাণ্ডে ৩৷৪টী গর্ত্ত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন, ঐ গর্ত্ত যেন কাণ্ডের এক দিক ভেদ করিয়া অপর দিকে চলিয়া না যায়। তাহাতে গাছটী গুরুতর জখম হইবে এবং কাণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, এইভাবে গাছের তেজ হ্রাস হইলে গাছে ফল ধরিবে। গাছের শিরোদেশ যদি নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা না হয়, তাহাতেও অনেক সময় ফলধারণে বিলম্ব ঘটে। এই জন্য প্রত্যেক বৎসরই, উহাদের মাথা ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। এই গাছের মাথায় অনেক পাখী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ জঞ্জাল আনিয়া জড় করে। ঐ বাসাগুলি ভাঙ্গিয়া, জঞ্জালাদি ফেলিয়া দিয়া, পুরাতন শাখা, মোচা

ইত্যাদি কাটিয়া, বেশ ভালরূপে সব পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

কোন কোন গাছে যেরূপ আদৌ ফল হয় না, সেইরূপ আবার কোন কোন গাছে ফল হইলেও তাহা কোন কাজে লাগে না। সেই ফলে শাঁস বা জল কিছুই থাকে না বা কোন কোনটায় থাকিলেও, অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। এইরূপ ফলকে সাধারণ কথায় ভূয়াফল বলা হয়। প্রায়শঃই পাকা ঝুনা নারিকেল এইরূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে। 'ভূয়া' ফল, ডাব অবস্থায় অনেক সময় ভাল থাকে। তাহা হইলে উহা ডাব অবস্থাতেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি প্রথম অবস্থা হইতেই উহা 'ভূয়া' হইতে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে বিশেষ তদ্বিরাদি করা আবশ্যক। মোচা হইতে কাঁদি বাহির হইলেই তাহা ২।১ বৎসর কাটিয়া দিবেন। গাছের গোড়ার চারিদিক খুঁড়িয়া প্রতি গাছে অন্ততঃ /৫ সের খাঁড়ি লবণ, তুষ, গোয়ালের আবর্জ্জনাদি, খড় এবং বাড়ীর জঞ্জাল ইত্যাদি পোড়াইয়া সেই ছাই, এবং কম পক্ষে ৫ পাউণ্ড হাড়ের গুঁড়া, চামড়ার গুঁড়া, চামড়া পচা ইত্যাদি প্রয়োগ করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

ডাব অবস্থায় নারিকেল পাড়িয়া লইলে গাছে ফলন বৃদ্ধি পায়। বিদ্যার সম্বন্ধে যেরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" নারিকেলের বেলায় এ প্রবাদটী বেশ খাটে। ইহার কারণ এই যে, ফলটীকে সুপক্ক করিতে

গাছের যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়, ডাব অবস্থায় ফলগুলি কাটিয়া লইলে, উহার সেই শক্তি ভিতরে অক্ষুণ্ণ থাকে। তারই ফলে আবার নূতন মোচা বাহির হইয়া, গাছটীকে ফলশালী করিয়া তোলে। কিন্তু পাকাইয়া ঝুনা করিতে গেলে, ফলটী বহুদিন গাছে থাকে এবং গাছের পূর্ণ শক্তি তাহাতে ব্যয়িত হয়। ফলগুলিকে গাছ হইতে না তোলা পর্য্যন্ত, গাছে নূতন মোচা হইবারও সুযোগ পায় না।

নারিকেল গাছ সময় সময় নানারূপ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি ব্যাধি আবার ভয়ানক সংক্রামক। টের পাওয়া মাত্রই, এইরূপ ব্যাধিগ্রস্থ গাছগুলিকে সমূলে বিনাশ কবিয়া অগ্নিদগ্ধ না করিলে, উদ্যানের প্রায় সমস্ত বৃক্ষই নষ্ট হইতে পারে।

নারিকেলের ব্যাধির ভিতরে ছত্রক ব্যাধিই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। ইহা খুব দ্রুত সংক্রামিত হইয়া বৃক্ষের পর বৃক্ষ ধ্বংস করিয়া ফেলে। প্রথমতঃ গাছের শিরোদেশের অন্তঃস্থলে এই রোগের সূত্রপাত হয়। তখন গাছের শাখা পীতবর্ণ ধারণ করে এবং পাতাগুলি ক্রমেই বিবর্ণ হইয়া পড়ে। ফলধারণোপযোগী মোচাগুলি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলগুলি ক্রমেই বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। তখন অনেকে শুধু আক্রান্ত স্থানবিশেষকে কাটিয়া বাদ দিয়া থাকেন। তাহাতে বিশেষ কোনই ফল পাওয়া যায় না, উক্ত রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া গাছের সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে

এবং উহার বিষক্রিয়া বৃক্ষদেহের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত গাছটীর উপরিভাগ কাটিয়া—শাখা, মোচা প্রভৃতি সহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। গাছটীকে যদি শুধু কাটিয়া ফেলিয়া রাখেন, তবে ঐ রোগ বাতাসের সাহায্যে অন্য বৃক্ষে সংক্রামিত হইয়া পড়িবে।

এই রোগোৎপত্তির মূলে নানা কারণ আছে। মৃত্তিকা ও জল বায়ুর দোষে এই রোগ সৃষ্ট হইতে পারে। কাহারও মতে, বাতাসে সঞ্চরণশীল নানা রোগজীবাণুর ভিতরে ইহাও একরূপ জীবাণু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় এই ব্যাধিগ্রস্থ গাছের মূলদেশও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। মূলে রোগ আক্রমণ করিলে, শিকড়ের ছালগুলি বিবর্ণ হইয়া যায় এবং কাণ্ড ও শাখায় লাল লাল বিবর্ণ গোলাকার বেষ্টনী চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। যদি উদ্যানস্বামী বুঝিয়া থাকেন যে মূলদেশও রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তবে গাছটীর শুধু উপরিভাগ নষ্ট করিলেই চলিবে না; ইহার মূলদেশও উৎপাটিত করিয়া অগ্নিদগ্ধ করিতে হইবে।

অনেক সময় বৃক্ষত্বকে ফাটা ফাটা চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং ঐ ক্ষত স্থান হইতে একরূপ তরল রস নির্গত হইতে থাকে। ঐ গাছ কাটিলে দেখা যাইবে যে উহার অভ্যন্তর ভাগ পচিবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ স্থান নরম এবং এক প্রকার রসে পরিপূর্ণ থাকে। অনেক সময় বৃক্ষত্বকের স্থানবিশেষ ধ্বসিয়া পড়ে এবং সেখানে একটী গোলাকার গর্ত্তের সৃষ্টি হয়। ঐ

গর্ত্ত ক্রমেই গভীর স্তরে পরিচালিত হইবার উপক্রম করে। এই রোগ চিনিবার কয়েকটী সহজ লক্ষণ দেওয়া গেল।

১। লৌহ পাত্রের কলঙ্ক ধৌত করিলে যে বর্ণ হয়, সেই বর্ণের এক প্রকার তরল রস, বৃক্ষ কাণ্ড হইতে নির্গত হইতে থাকে।

২। বৃক্ষ কাণ্ডে স্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান থাকে।

৩। ২।৩ বৎসরের মধ্যে, কাণ্ড হইতে ত্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

৪। গাছের ঊর্দ্ধাংশ ক্রমেই সরু হইতে থাকে।

৫। ৩।৪ ফুট গভীরভাবে, কখনও বা সম্পূর্ণ ভাবে মূলদেশের অভ্যন্তর ভাগ ক্রমশঃই শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে থাকে।

বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরে পচন ক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত, এই রোগ বাহিরে প্রকাশ পায় না। পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই, ঐরূপ রস নিঃসৃত হইতে থাকে। এই লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাওয়া মাত্রই, ঐ স্থান কাটিয়া পচনশীল দেহাংশকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং ঐ স্থানটুকুমাত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া, শেষে ক্ষত স্থানে কয়লার আলকাতরা দিয়া পুরু প্রলেপ দিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে রোগের জীবাণু ধ্বংস করিয়া না ফেলিলে, রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া ৬।৭ বৎসরের মধ্যেই গাছটীকে মারিয়া ফেলিবে।

Oryctes Rhinoceros নামক এক প্রকার কীট

নারিকেল গাছের মহাশত্রু। ইহারা বীজ-ফলের ভিতরে প্রথমেই প্রবেশ করে এবং তথায় পরিপুষ্টিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করিয়া ক্রমে বৃক্ষ কাণ্ডে প্রবেশ করে এবং ভিতর হইতে গাছটীকে কুরিয়া খাইতে থাকে। ইহাদের আক্রমণে কাণ্ড সমধিক দুর্ব্বল ও ক্রমে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে। ইহারা সময় সময় ডাল ও পাতা আক্রমণ করে। পাতাগুলিকে ছাঁটিয়া দিলে যেরূপ দেখা যায়, ইহাদের আক্রমণে পাতাগুলি ক্রমে তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহারা কাণ্ডের উপরিভাগে যে ছিদ্র করে তদ্দারা ইহাদের ভিতরে অবস্থিতির কথা জানিতে পারা যায়। তখন গরম জল, অথবা সাবান মিশ্রিত গরম জল, ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পিচকারী যোগে ঐ ছিদ্র পথ দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে, পোকা মরিয়া যাইতে পারে। ঐ ছিদ্র পথে শেষে গন্ধকের গুঁড়া ও চূণ সমপরিমাণে মিশাইয়া প্রলেপ দিয়া রাখিতে হয়। অবশ্য এই কীটের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া খুবই দুষ্কর। মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া, ইহাদের কার্য্য যেরূপ অবাধে চলিতে থাকে, তাহাতে ইহাদের ধ্বংস করার প্রচেষ্টা প্রায়শঃই ব্যর্থ হয়। গাছটীকে একেবারে না কাটিয়া ফেলিলে, অন্য উপায়ে ইহাদের বাহির করা প্রায়শঃই সম্ভব হয় না। পচা গোবর বা অন্যান্য আবর্জ্জনা-স্তুপের ভিতরেই ইহাদের জন্ম। বাগান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং সারের জন্য সঞ্চিত গোমহিষাদির মল-মূত্র উদ্যানের বাহিরে দূরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলে, ইহারা

সহসা কোন গাছকে আক্রমণ করিতে পারে না। ইহাদের জন্মিতে না দেওয়াই ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের উপায়। ইহা ছাড়া আরও নানারূপ কীট পতঙ্গ ঐভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া উদ্যানের সর্ব্বনাশ করে। সুতরাং উদ্যানের সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অনেক সময় দেখা যায় যে গাছের পাতাগুলির অগ্রভাগ বিবর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহাও গাছের 'ছত্রক' জাতীয় অন্য এক প্রকার রোগ। এই রোগও বিশেষ সংক্রামক। অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত পাতাটীই ঢলিয়া পড়ে। পাতা হইতে ইহা বৃক্ষের সমস্ত দেহেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এক প্রকার জীবাণুই এই রোগের বাহন। জলবায়ু, মৃত্তিকা, চাষপ্রণালী, সার প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদির ত্রুটী হইতেই এই রোগ জীবাণুর আক্রমণ আসিয়া থাকে। পাতার নিম্নভাগে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ছিদ্র পথ আছে, তাহার ভিতর দিয়া ইহারা পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। অনেক সময় পাতার উপরে একরূপ ফুস্কুড়ি দেখা দেয়, উহাও ঐ জীবাণুসৃষ্ট রোগের বহিঃপ্রকাশ। পাতা রুগ্ন হইলে, বৃক্ষদেহকে সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাতে বৃক্ষও দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তারপর ঐ রোগজীবাণু পত্র হইতে ক্রমে শিরোদেশে, কাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং গাছটীকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে রোগের প্রাবল্য বুঝিলে সম্পূর্ণ গাছটীকে কাটিয়া অগ্নি-

দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি পত্রবিশেষে এই রোগ দেখা দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা ছিঁড়িয়া আগুণে পোড়াইয়া ফেলিবেন। রোগ জীবাণু অন্য কোন পত্রে আছে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। যদি কোন পত্রাংশেও উহার একটুমাত্র অস্তিত্বও রহিয়া যায়, তবে কিন্তু সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। গাছটিকেই সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইলে, উহার গোড়াসমেত তুলিয়া ফেলিয়া, মাটি ওলট পালট করিয়া জীবাণুনাশক সার ছড়াইয়া দিবেন। পার্শ্ববর্ত্তী গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক তরল পদার্থবিশেষ দ্বারা স্প্রে করিয়া দিবেন। সমস্ত পাতা, শিরোভাগ, কাণ্ড ও মূল পর্য্যন্ত উক্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিলে ইহাদের সংক্রমণ বন্ধ হইতে পারে।

৬ পাউণ্ড তুঁতে, ৪ পাউণ্ড বাখারী চূণ ও ৫০ গ্যালন জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া স্প্রে দিলে জীবাণু ধ্বংস হয়। প্রথমতঃ ২৫ গ্যালন জলে তুঁতেটা একটা কাঠের পাত্রে ভালরূপে মিশ্রিত করিবেন। অপর একটী পাত্রে আবার ২৫ গ্যালন জল সহ বাখারী চূণ মিশাইবেন। তারপর বড় একটী পাত্রে, আস্তে আস্তে ঐ দুটী মিশ্রণকে একত্রে মিশাইয়া ফেলিবেন। শেষে ধীরে ধীরে জলটা নাড়িতে থাকিবেন। এই মিশ্রণ ঠিক হইল কি না তাহা বুঝিতে হইলে, একখানা পরিষ্কার ছুরীর ফলা, এক মিনিট কাল ঐ জলে ডুবাইয়া তুলিবেন। তাহাতে যদি ছুরীখানার বর্ণ অবিকৃত থাকে, তবে বুঝিবেন মিশ্রণ ঠিক আছে। আর যদি উহার বর্ণ লালাভ হইয়া বিকৃত

হয়, তবে আরও কিছু বাখারী চূণ (শামুক বা ঝিনুক পোড়া চূণ) মিশ্রিত জল মিশাইবেন। মোট কথা, ঐ জলে ডুবাইলে ছুরীর ফলাখানার বর্ণ পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল থাকা চাই। এই ভাবে জল প্রস্তুত হইলে, উহা দ্বারা সমস্ত গাছে স্প্রে করিবেন।

নারিকেলের যে সব ব্যাধির উল্লেখ করা গেল, ইহাদের উৎপত্তি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জীবাণু হইতে হইলেও, ক্ষেত্রস্বামীর অসতর্কতা ও অনভিজ্ঞতাও ইহার জন্য আংশিক ভাবে দায়ী। জমির আভ্যন্তরীণ অবস্থা, জলবায়ুর প্রকৃতি ও উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবেই গাছগুলি আপনা হইতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জীবাণু ঘটিত রোগের আক্রমণ নির্ভর করে জীবনীশক্তির উপর। আকাশে, বাতাসে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কত রকম বিচিত্র রোগের জীবাণু যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারা প্রতিনিয়ত জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করিতেছে কিন্তু জীবনীশক্তির সবল বিরোধীতায় প্রতিহত হইয়া তাহাদের আক্রমণ বার বার ব্যর্থ হইতেছে। কিন্তু জীবনীশক্তি যখনই কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন সেই দুর্ব্বলতার রন্ধ্রপথে উহারা দেহে প্রবেশ করিয়া, স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য, সর্ব্ব প্রথমই উদ্যানস্বামীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য উদ্ভিদের জীবনীশক্তির উপর। কোন্ মৃত্তিকায়, কোন্ আবহাওয়ায়, কিরূপ অবস্থায় কোন্ সার প্রয়োগে, কিরূপ পরিচর্য্যায় তাহার সেই জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন থাকিতে পারে, সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, সেই ভাবে সমস্ত কার্য্য

সম্পন্ন করা দরকার। রোগ আক্রমণ করিলে পর তাহার প্রতীকারে যত্নবান হওয়া অপেক্ষা, রোগ যাহাতে আদৌ আক্রমণ করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করাই বিজ্ঞের লক্ষণ। প্রত্যেক বৎসর গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ মাটি ভালরূপে ওলট পালট করিয়া, রৌদ্র খাওয়াইতে হইবে। তারপর তাহাতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিতে হইবে। নারিকেলের পক্ষে জল খুব বেশী প্রয়োজন। এই জন্য মাটি যাহাতে শুষ্ক না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জল বেশী প্রয়োজন হইলেও, আবার মাত্রা ছাড়াইয়া অতিরিক্ত জল প্রয়োগে জমি যেন স্যাঁতসেঁতে হইয়া না যায়, তাহাও দেখিতে হইবে। অতিরিক্ত জল যাহাতে ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, সে জন্য উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী রাখিতে হইবে। গাছগুলির শিরোভাগ প্রত্যেক বৎসর পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ গাছগুলির অবস্থা ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইতে হইবে। কোন গাছে অপ্রাকৃতিক কোন ভাব দেখি-লেই, তাহার প্রতীকারে যত্নবান হইতে হইবে। এইরূপে তদ্বিরাদি করিলে সাধারণতঃ গাছ রুগ্ন হইতে পারে না।

ব্যাধি ব্যতীত নানারূপ পাখী, ইন্দুর, কাঠবিড়াল প্রভৃতিও এই গাছের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কাঠঠোকরা নামক পক্ষী ইহার কাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। উহাদের কখনও গাছে বসিতে দিবেন না। যদি দৈবাৎ কখনও গর্ত্ত করিয়া ফেলে, তবে ঐ গর্ত্তে মাটি

ভরাট করিয়া দিবেন এবং উপরে কয়েক টুকরা কাঁচ বসাইয়া দিবেন। তাহা হইলে আর উহা ঐ গর্ত্তের নিকট যাইতে পারিবে না। ভবিষ্যতে যাহাতে আর গর্ত্ত না করে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিবেন। অন্যান্য জন্তুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, সুবিধানুযায়ী সহজ উপায় অবলম্বন করিবেন।

খৈল সার, পচামাছ, সোরা বা খাঁড়ি লবণ, গোমহিষাদির মল পচা সার ইত্যাদি নারিকেলের পক্ষে প্রশস্ত। প্রত্যেক বৎসরই গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা উচিত। জমির মৃত্তিকাভেদে এবং গাছের বয়ঃক্রমভেদে বিভিন্ন সার প্রয়োগে অনেক সময় আশাতীত উপকার পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে H. Hamel Smith এবং F. A. G. Papeএর "Cocoanuts, The Consols of the East" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মাটির প্রকৃতি	প্রতি গাছে বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণ		
	১—৬ বৎসর পর্য্যন্ত	৭—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত	১৬ বৎসর এবং তদূর্দ্ধে।
১। বেলেমাটি			
প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ বর্জ্জিত হইলে—			
বেসিক্ শ্লাগ	১—৩ পাউণ্ড	৪ পাউণ্ড	৫ পাউণ্ড
মিউরিয়েট অব পটাশ	$\frac{১}{২}$—১ ,,	১$\frac{১}{৪}$,,	১$\frac{১}{২}$,,
নাইট্রেট অব সোডা	$\frac{৩}{৪}$—১$\frac{৩}{৪}$,,	২ ,,	২$\frac{১}{২}$,,

মাটির প্রকৃতি	প্রতি গাছে বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণ		
	১—৬ বৎসর পর্য্যন্ত	৭—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত	১৬ বৎসর এবং তদূর্দ্ধে।
প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হইলে—			
বেসিক্ স্লাগ	৩/৪—২ পাউণ্ড	৩ পাউণ্ড	৪ পাউণ্ড
মিউরিয়েট অব পটাশ	১/২—১ ,,	১ ১/৪ ,,	১ ১/২ ,,
নাইট্রেট অব সোডা	১/২—১ ,,	১ ১/৪ ,,	২ ,,
২। বেলে পাঁক মাটি			
প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ বর্জ্জিত হইলে—			
বেসিক্ স্লাগ	১—৩ ১/২ পাউণ্ড	৪ পাউণ্ড	৫ পাউণ্ড
মিউরিয়েট অব পটাশ	১/৪—১/২ ,,	৩/৪ ,,	১ ,,
নাইট্রেট অব সোডা	৩/৪—১ ৩/৪ ,,	২ ,,	২ ১/২ ,,
প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হইলে—			
বেসিক্ স্লাগ	১—৩ পাউণ্ড	৪ পাউণ্ড	৫ পাউণ্ড
মিউরিয়েট অব পটাশ	১/৩—১/২ ,,	৩/৪ ,,	১ ,,
নাইট্রেট অব সোডা	১/২—১ ,,	১ ১/৪ ,,	২ ,,
৩। এঁটেল মাটি			
প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ বর্জ্জিত হইলে—			
বেসিক্ স্লাগ	১ ১/২—৪ পাউণ্ড	৫ পাউণ্ড	৭ পাউণ্ড
মিউরিয়েট অব পটাশ	১/৩—১/২ ,,	৩/৪ ,,	১ ,,
নাইট্রেট অব সোডা	৩/৪—১ ৩/৪ ,,	৩/৪—১ ১/৪ ,,	২ ১/২ ,,

প্রতি গাছে বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণ

মাটির প্রকৃতি	১—৬ বৎসর পর্য্যন্ত	৭—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত	১৬ বৎসর এবং তদূর্দ্ধে।
প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হইলে—			
বেসিক্ শ্লাগ	১—৩½ পাউণ্ড	৪ পাউণ্ড	৬ পাউণ্ড
মিউরিয়েট অব পটাশ	¼—½ ,,	¾ ,,	১ ,,
নাইট্রেট অব সোডা	½—১ ,,	১½ ,,	২ ,,

নারিকেল গাছের প্রত্যেকটী অংশ আমাদের প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। ইহার কাণ্ড খুব দৃঢ় মজবুত। ইহা দ্বারা ঘরের খুঁটী, আড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। জ্বালানী কাষ্ঠ হিসাবে ইহার প্রচলন নিতান্ত মন্দ নহে। নারিকেলের পাতা দিয়া বাঁশী, ছোট ছোট খেলনা, বাস্কেট, মাদুর প্রভৃতি নানারূপ কুটিরশিল্প প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাতার কাটি দ্বারা ঝাঁটা তৈরী হয়। তবে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা পাই ফল হইতে। ডাব অবস্থায় ইহার জল শুধু শ্রান্তিই দূর করে না—স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। বাংলার সর্ব্বত্র নারিকেল জন্মে না। যে সব অঞ্চলে উহা জন্মে না, সেই সব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ডাব চালান দিতে পারিলে, তাহাতে প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে। গরমের দিনে ডাবের সরবৎ উৎকৃষ্ট পানীয় এবং সকলের নিকটই ইহা বিশেষ আদরণীয়। ঝুনা নারিকেলের চাহিদা

বাজারে আরও বেশী। ডাব অবস্থায় শুধু জলটুকুই আমাদের প্রয়োজনে আসে কিন্তু ঝুনা অবস্থায় ইহার প্রত্যেকটী অংশ আমরা কাজে লাগাইয়া থাকি। ছোবড়া দ্বারা দড়ি প্রস্তুত হয়। নারিকেলের দড়ির বাজার সমস্ত পৃথিবীব্যাপী। গদি, তোষক, বালিশ ইত্যাদি প্রস্তুতে নারিকেলের ছোবড়া, তুলার স্থান অধিকার করিয়াছে। জ্বালানী হিসাবে ছোবড়া এবং ছোবড়ার উপরিভাগের কঠিন আবরণটীর প্রয়োজন, বাংলার পল্লীতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। নারিকেলের খোল না হইলে হুঁকা প্রস্তুত হয় না। নানারূপ কারুকার্য্য খচিত করিয়া, খোল বা মালা দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর পাত্র প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের শাঁসই আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। চিনি বা গুড় প্রভৃতি সংযোগে ইহা খাইতে অতি চমৎকার। এই শাঁস দ্বারা নানারূপ নাড়ু পিষ্টক ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলিয়া, তথায় নারিকেল হইতে নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুতের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার শাঁস কোরাইয়া ডাল, ব্যঞ্জন ইত্যাদিতে ব্যবহার করিলে স্বাদ অতি চমৎকার হইয়া থাকে। নারিকেল হইতে উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক কিন্তু গায়ে মাখিলে বাতরোগের আক্রমণ আসিতে পারে। নারিকেলে চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। টাটকা নারিকেল তৈল, ঘৃতের মত ভাতের সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। মান্দ্রাজ

অঞ্চলে সরিষার তৈলের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। সে স্থানে রন্ধনে এই তৈল সরিষার তৈলের মতই ব্যবহৃত হয়। সাবান, নানাবিধ সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, নারিকেল তৈল একটী প্রধান উপাদান। সিংহল, মালয়, ফিলিপাইন প্রভৃতি অঞ্চলে, নারিকেলের শাঁস হইতে 'Copra' প্রস্তুত হইয়া, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইতেছে। এই copra'র চাহিদা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই নারিকেলের আবাদ একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। চা বাগানের মত সিংহল, মালয়, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে বিস্তৃত নারিকেল বাগান (Cocoanut Estate) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান ব্যবসায়ী এই কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া প্রভূত ধনশালী হইতেছেন। নারিকেল হইতে এক প্রকার মাখম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা স্বাদে, গন্ধে এবং উপকারীতায়, দুগ্ধের মাখম অপেক্ষা কোনমতেই নিকৃষ্ট নহে।

আমাদের দেশের যে সব স্থানে নারিকেল ভালরূপে জন্মে,—সেই সব স্থানে যদি যৌথভাবেও নারিকেলের বিস্তৃত আবাদ করা যায়, তবে বর্ত্তমান ভয়াবহ বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। একমাত্র ফল বিক্রয় করিয়াই, নারিকেল চাষে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

পীচ (Peach)

পীচ গ্রীষ্মের অতি উপাদেয় ফল। কিন্তু ইহা ভারতীয় ফল নহে। এ দেশে ইহার প্রচলন এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী নহে। এখন পর্য্যন্তও ইহার প্রচলন সৌখীন সমাজের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইউরোপীয়গণ এই ফলের অত্যন্ত ভক্ত। অম্ল, কষায়, তিক্ত ও মিষ্টরসের সংমিশ্রণে, ইহার স্বাদে একটা বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বিচিত্র স্বাদই ইহার বৈশিষ্ট্য এবং সেই জন্যই ইহা এত মুখরোচক। উৎকৃষ্ট ফল হিসাবে এ দেশে ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

উচ্চ সরস দোআঁশ মৃত্তিকা ইহার পক্ষে উপযোগী। ইহার জমি নীরস বেলে প্রকৃতির হইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা কম। জমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইতে না পারে, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বীজ হইতে পীচের চারা প্রস্তুত করা চলে। কিন্তু তাহাতে ফলের স্বাদের বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, কলম করাই প্রশস্ত। বীজের চারা হইতেও উৎকৃষ্টতর ফল যে না পাওয়া যায় তাহা নহে। তবে এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই বলিয়া লোকে কলম করিয়া থাকে। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, ভালরূপে গাছপাকা ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। উত্তম সারাল মাটিতে

প্রস্তুত হাপোরে বীজ পাত দিয়া রাখিতে হইবে। এই বীজের আবরণ অত্যন্ত কঠিন। ঐ কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মাথা জাগান, কোমল অঙ্কুরের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। এই জন্য বীজের এক পার্শ্ব একটু ফাটাইয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু শুধু আবরণটীর এক পার্শ্বই ফাটাইবেন। শাঁস যেন কোনমতে একটুও আহত না হয়। শাঁস আহত হইলে ঐ বীজে আর অঙ্কুর বাহির হইবে না। যাহা হউক, চারাগুলি একটু বড় হইলে পর অন্য হাপোরে স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। চারা দুই বৎসরের পুরাতন হইলে জমিতে স্থায়িভাবে লাগাইবেন।

কলমে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে জোড়, শাখা ও চোক কলম বাঁধিতে হইবে। জোড় ও চোক কলম বাঁধিতে হইলে বীজের চারা আবশ্যক হয়। দুই বৎসরের পুরাতন সুপুষ্ট চারায় কলম বাঁধা উচিত। কলমে চারা প্রস্তুত হইলে, ঐ গুলিকে কিছু দিন হাপোরে রাখিয়া বিশ্রাম দিয়া, পরিশেষে জমিতে স্থায়িভাবে লাগাইবেন। ১২ হইতে ১৬ হাত ব্যব-ধানে পীচ গাছ বসাইতে হয়। বর্ষাকালই এই চারা বা কলম প্রস্তুতের সময়। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই গাছ জমিতে রোপণ করিতে হয়।

ফলকর গাছের গতি ঊর্দ্ধমুখী হইলে সাধারণতঃ ফলন কম হয় কিন্তু ছত্রাকারে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে অধিক ফল হয়। গাছের শিকড়ের গতি যদি নিম্নাভিমুখী হয়, তবে

গাছও উর্দ্ধগতি সম্পন্ন হইয়া লম্বা হইয়া থাকে। এই জন্য, চারা বা কলম হাপোর হইতে তুলিয়া বসাইবার সময়, মূল শিকড়টী সাবধানে ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহাতে শিকড়গুলি মাটীর নীচে না যাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়।

প্রত্যেক বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া, মোটা মোটা শিকড়গুলিকে মুক্ত আলো ও বাতাস খাওয়াইতে হয়। ১৫।২০ দিন শিকড়গুলিকে এই ভাবে অনাবৃত রাখিয়া, গোড়াগুলি আবার সারমাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। খইল সার, পচা গোময় সার, ভেড়ীর নাদি সার, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি এই গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

মাঘ মাসে এই গাছ মুকুলিত হয়। এই সময় গাছে নিয়মিত ভাবে অল্প অল্প জল দিতে হয়। এই সময় গাছে রসাভাব ঘটিলে, মুকুল বা ছোট ছোট ফলগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। মুকুলগুলি ফলে পরিণত হইলে, জলের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হইবে। এই জলে ফলের আকার বৃদ্ধি করে এবং স্বাদও উপাদেয় করিয়া তোলে।

এক একটী পীচ গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে। ফলগুলি একটু বড় হইলে, কাপড় বা চট দিয়া প্রত্যেকটী ফল ঈষৎ আলগা ভাবে বাঁধিয়া দিলে, ফলগুলি বেশ নরম ও সুতার হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ফল পাকে। সম্পূর্ণ সুপক্ক অবস্থায় না খাইয়া একটু শক্ত থাকিতে এই ফল খাওয়া উচিত।

পীচ গাছের নানারূপ শত্রু আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার কীট আছে, যাহারা গাছের কাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভিতর হইতে গাছটীকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। ইহাদের আক্রমণ হইলেই, আক্রান্ত স্থান হইতে এক প্রকার আঠা নিঃসৃত হইতে থাকে। ঐরূপ আঠা দেখিলেই ঐ স্থান কর্ত্তন করিয়া, কীট বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন। কাটিলে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে বোধ হইলে, ঐ ছিদ্রপথে তামাক বা সাবান মিশ্রিত জল, পিচকারী সাহায্যে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তাহাতে পোকা মরিয়া যাইবে নতুবা বাহির হইয়া আসিবে। তখন ছিদ্রপথ কোন বস্তু দিয়া বন্ধ করিয়া, উপরে আলকাতরা লাগাইয়া দিবেন।

ব্যবসায় হিসাবে পীচের চাষ করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

পেয়ারা। (Guava)

পেয়ারার স্বাভাবিক জন্মস্থান ভারতবর্ষ না হইলেও, অধুনা সমগ্র ভারতে ইহা যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে ভারতীয় ফল বলিয়া মনে করা বিশেষ অসঙ্গত নয়। বনে, জঙ্গলে, বাড়ীর আনাচে কোনাচে, অযত্নে অনেক পেয়ারা গাছ জন্মিয়া থাকে কিন্তু এই সব গাছের ফল বিশেষ উৎকৃষ্ট

হয় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে এগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থানের পেয়ারা অতি সুস্বাদু ও সৌরভময়। এই জন্য কাশী ও এলাহাবাদে পেয়ারার বিস্তৃত আবাদ দেখা যায় এবং ঐ সমস্ত স্থান হইতে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট ফল বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে চালান হইয়া আসে।

বীজ হইতেও পেয়ারার চারা জন্মে। তাহাতে ফল ধরিতে কিছু বিলম্ব হয়। তথাপি বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, বর্ষাকালে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। বেশ হালকা মাটীতে সার সংযোগ করিয়া হাপোর প্রস্তুত করিতে হয়। শেষে ঐ হাপোরে বীজ বপন করিতে হয়। বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে পর যখন ৪।৫ ইঞ্চি বড় হইবে, তখন প্রথম হাপোর হইতে তুলিয়া দ্বিতীয় হাপোরে ৫।৬ ইঞ্চি ব্যবধানে রোপণ করিয়া যাইতে হইবে।

পেয়ারার জন্য একটু উঁচু জমি আবশ্যক। জমির মৃত্তিকা দোআঁশ প্রকৃতির হইলেই ভাল হয়। প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট জমিকে ভালরূপে কোদলাইয়া বা লাঙ্গল দিয়া, মাটি হালকা করিয়া আগাছা ইত্যাদি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। শেষে উহার সঙ্গে পুকুরের পাঁকমাটী বা নূতন মাটী মিশ্রিত করিয়া জমিটীকে পাট করিয়া লইতে হয়। এদিকে চারাগুলি প্রস্তুত হইলে পর, আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যে, উক্ত জমিতে ৭।৮ হাত অন্তর বসাইয়া যাইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত চারা-

গুলির শিকড় মৃত্তিকার সঙ্গে ভালরূপে আঁটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত তীব্র রৌদ্রের সময় ছায়াদানের ব্যবস্থা করিবেন। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় হইলে, প্রয়োজন মত জল সেচন করিবেন। জল সেচন করিবার সময় সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন, যেন গোড়ায় অতিরিক্ত জল বসিয়া গাছটী মারা না পড়ে।

বীজের চারার ফল অপেক্ষা কলমের ফল বড়, শীঘ্র ফলে ও সুস্বাদু। বর্ষাকালে ইহার গুল কলম বাঁধিতে হয়। একমাস কাল মধ্যেই কলম প্রস্তুত হয়। তখন কলমটী কাটিয়া আনিয়া হাপোরে কিছু দিন প্রতিপালন করতঃ, জমিতে স্থায়িভাবে বসাইতে হয়। ক্ষেত্রে বসাইবার পর, প্রায় দুই বৎসরের মধ্যেই কলম ফলিতে আরম্ভ করে। তবে প্রথমবারে ফল হইতে না দেওয়াই ভাল। কেন না তখন পর্য্যন্ত গাছের ফলোৎপাদিকা শক্তি পরিণত হয় না। এই অপরিণত অবস্থায় ফল ধারণ করিলে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রথম বৎসরে, ফুল ধরিলেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফুল ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, গাছের অন্তর্নিহিত শক্তি অব্যাহত থাকে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে অধিক ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়।

ফাল্গুন মাস হইতেই পেয়ারা গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে। আষাঢ় শ্রাবণ মাস হইতে ইহা ব্যবহার করা চলে। বিদেশে চালান দিতে হইলে ফলগুলিকে বেশী দিন গৃহে রাখিয়া সুপক্ব হইতে দেওয়া উচিত নহে। পাকিতে আরম্ভ করিলেই, একটু শক্ত থাকিতে থাকিতে, গাছ হইতে পাড়িয়া

আনিয়া ঝুড়িতে ভরিয়া চালান দিতে হয়। ঝুড়িতে থাকিতে থাকিতেই ইহারা সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সুপক্ক হইলে, চালানী ফল অনেক সময় পচিয়া যাইতে পারে।

গাছে মুকুল আসিবার মাস দুই পূর্ব্ব হইতে পাট আরম্ভ করা উচিত। তখন গাছের গোড়া আলগা করিয়া, রৌদ্র বাতাস খাওয়াইয়া, নূতন সার মাটী দ্বারা ঢাকিয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী জল সেচন আবশ্যক।

পেয়ারা গাছে একরূপ বাঁজা ফল জন্মে। ঐগুলি পুষ্টি-লাভ করিতে না করিতেই আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে। নিয়মিত সার প্রয়োগ ও জল সেচনে, গাছের এই দোষ দূর হইতে পারে।

পাকা পেয়ারার অনেক শত্রু আছে। ফল পাকিতে আরম্ভ করিলেই বাদুড়, কাঠবিড়াল, এবং আরও নানারূপ পক্ষী ঐগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। অনেক সময় কাঁচা ফলও ইহাদের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য ফল-গুলি একটু বড় হইলেই, ছেঁড়া চট্ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে যে শুধু শত্রুর আক্রমণই ব্যর্থ হয় তাহা নহে, ঐরূপে বদ্ধ থাকার দরুণ ফলের স্বাদ ও সৌরভ বৃদ্ধি পায়।

পেয়ারা গাছের আর এক মহাশত্রু লাল পিঁপড়া। উহারা গাছের পাতাগুলি একত্রে বাঁধিয়া চমৎকার বাসা নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ বাসা দেখিলেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছে যাহাতে আর পিঁপড়া না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে।

ঐ বাসায় উহারা প্রচুর ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিমসহ বাসা-গুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। ইহারা গাছের ঘোর অনিষ্ট-সাধন করিয়া থাকে। কাজেই পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হওয়া দরকার।

ফলকর ব্যতীত, সৌখীন মহলে প্রচলিত আর এক প্রকার পেয়ারা গাছ আছে; ইহাকে 'পাতাবাহারী পেয়ারা' বলে। ইহার পাতাগুলি নানা বর্ণে চিত্রিত থাকায় প্রকৃতই খুব বাহার খুলিয়া থাকে। ফলের কোন বৈশিষ্ট্য নাই এবং ফলও বিশেষ উৎকৃষ্ট নহে।

পেয়ারার শাঁস লাল ও সাদা দুই রকমই হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সাদা শাঁসযুক্ত পেয়ারাই উৎকৃষ্ট। কাফ্‌রী নামক একরূপ পেয়ারা আছে; উহার আকৃতি কিছু লম্বা ধরণের, গাত্র মসৃণ নহে, স্বাদ বেশ ভাল।

অনুকুল আবহাওয়া ও মৃত্তিকা হইলে, উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারার চাষ বেশ লাভজনক সন্দেহ নাই।

পেয়ারার ভিতরে ভেষজগুণ যথেষ্ট আছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা শোথ বিনাশক ও বলকারক। জ্বর, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, বায়ু, ক্রিমি প্রভৃতি রোগে উপকারী। ইহার বীজ গুরুপাক, এই জন্য বীজ ফেলিয়া শুধু শাঁস খাওয়া উচিত।

'বীজশূন্য' নামক অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় এক প্রকার পেয়ারা আছে। ইহার ফল খুব বড় হয় এবং ইহা স্বাদে, গন্ধে অতুল-নীয়। ইহার ভিতরে মাত্র ৪।৫টী বীজ থাকে।

পেঁপে (Papaya)

মানবের স্বাস্থ্যবিধানে উপকারী ফল হিসাবে পেঁপের স্থান অতি উচ্চে। রসনার তৃপ্তিসাধনে, দেহের পরিপোষণে এবং নানাবিধ রোগ প্রশমনে, পেঁপের ক্ষমতা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কাঁচা, পাকা উভয় অবস্থাতেই পেঁপে পরম হিত-কর। ভারতবর্ষ ইহার আদি জন্মস্থান না হইলেও, ভারতের মৃত্তিকা ও জলবায়ু ইহার পক্ষে এত অনুকুল যে, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই নিতান্ত অযত্নের ভিতরেও জন্মিয়া থাকে এবং ফলেও প্রচুর। অবশ্য সর্ব্বত্র ইহার আকার, ফলন ও স্বাদ সমান হয় না। স্থানভেদে জলবায়ু ও মৃত্তিকায় যে তারতম্য আছে, তদনুযায়ী ইহারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গা-পুর, সিংহল প্রভৃতি দেশে যেরূপ ফল হয়, ভারতে সেরূপ হয় না। এই সব স্থানের এক একটী ফল নারিকেলের মত বৃহৎ হয়। জলবায়ু ও মৃত্তিকার বিশেষ আনুকুল্যই ইহার প্রধান কারণ। ভারতে রাঁচী ও বোম্বাই অঞ্চলের পেঁপে মন্দ নহে। এগুলির বিশেষ ভাবে তদ্বিরাদি করিলে যে সিংহল, সিঙ্গাপুরের অপেক্ষা বেশী নিকৃষ্ট থাকে, তাহা মনে হয় না। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ বিস্তৃত ভাবে পেঁপের চাষ নাই বলিলেও চলে। গৃহস্থের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বীজ হইতে দৈবাৎ যে দুই চারিটী গাছ জন্মে, তাহার ফলেই সকলে সন্তুষ্ট

থাকেন। ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা বা যত্ন যে আবশ্যক, তাহা প্রায় কেহই মনে করেন না। প্রকৃতির দানকে সর্ব্বতোভাবে আপন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য উন্নত প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতে হইলে, বিশেষ চেষ্টা, যত্ন ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দানের মর্য্যাদা না বুঝিলে, দাতাও দানে কার্পণ্য করিয়া থাকেন। এই জন্য দেশবিশেষে, ব্যক্তিবিশেষে একই দানের ভিতর তারতম্য লক্ষিত হয়।

দোআঁশ মৃত্তিকা বিশিষ্ট উচ্চ জমি, পেঁপে ক্ষেত্রের উপযোগী। জমি ভিজা স্যাঁতসেঁতে হইলে প্রায়ই গাছ বাঁচে না এবং বাঁচিলেও অনেক সময় ফলন হয় না। গোড়ায় জল দাঁড়াইলে, এই গাছ অতি সত্বর মরিয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ঢালু প্রকৃতির উচ্চ জমিতেই পেঁপের চাষ করা ভাল। বর্ষার জল যাহাতে অতি সত্বর জমি হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, সে জন্য জল নিকাশের উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকা দরকার। নির্ব্বাচিত জমি বেশ ভালরূপে চাষ দিয়া, আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। কাঠের ছাই, পুকুরের পাঁকমাটী, পচা পুরাতন গোবর সার ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া, জমিটীকে পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত রাখা আবশ্যক।

পেঁপে গাছ, বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়। মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ পুঁতিবার সময়। হাপোরে বীজ পাত দিয়া চারা তৈরী করিয়া, কিছু দিন পালন করিয়া শেষে জমি প্রস্তুত থাকিলে, স্থায়িভাবে রোপণ করিয়া দিতে হয়। বর্ষার

যত বেশী দিন আগে চারা তৈরী হইবে ততই ভাল। কারণ যতই অগ্রে চারা প্রস্তুত হইবে, ইহারা পূর্ব্ব হইতে ততই ঝাড়াল হইয়া উঠিবে এবং শিকড়গুলি মৃত্তিকার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রস গ্রহণে সক্ষম হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত চারার পক্ষে, বর্ষার রসধারা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগে কোন বাধা জন্মে না। কিন্তু বিলম্বে জাত চারাগুলি প্রয়োজন মত মূলবৃদ্ধি করিতে না করিতে বর্ষা আসিয়া পড়ে, তখন বর্ষার জল তাহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়। বর্ষা অতীত হইতে না হইতে শীত দেখা দেয়। শীতের প্রকোপে চারার বৃদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই জন্যই বিবেচনা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই চারা জমিতে বসাইয়া দেওয়া উচিত।

অনেকে হাপোরে বীজ পাত না দিয়া, জমিতে মাদা প্রস্তুত করিয়া বীজ পুঁতিয়া দিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে ৪।৫ হাত ব্যবধানে এক একটী মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক মাদায় ৩।৪টী করিয়া বীজ পুঁতিয়া দিতে হয়। তারপর আবশ্যক মত উহাতে জল সেচন করা কর্ত্তব্য। যদি বর্ষার জল পায়, তবে আর জল সেচন করিতে হয় না। তারপর বীজ অঙ্কুরিত হইলে, প্রত্যেক মাদায় সর্ব্বাপেক্ষা সবল চারাটী রাখিয়া অবশিষ্টগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। জায়গা থাকিলে উহা অন্যত্র বসান যাইতে পারে। নতুবা ফেলিয়াই দিতে হয়। পেঁপের মাদায় পাঁকমাটী ও পোড়া মাটী উত্তম ফলদায়ক।

আমার মতে, প্রথমতঃ হাপোরে চারা তৈরী করিয়া, শেষে স্থায়িভাবে জমিতে স্থানান্তরিত করিলেই ভাল হয়। এই স্থানান্তর জনিত নাড়ার ফলে, চারাগুলি অপেক্ষাকৃত সবল ও অধিক ফলবান হয়। চারাগুলির তদ্বিরও ভাল হয়।

বর্ষাকালে পেঁপে বীজ ফুটান একটু শক্ত। কারণ উহার শাঁস খুবই সামান্য এবং অতি কোমল। অতিরিক্ত জলে উহা সহজেই পচিয়া যায়। এই জন্য বর্ষাকালে বীজ ফুটাইতে হইলে, ছাই গাদায় বীজের পাত দেওয়া ভাল। তবে সমস্ত বীজ একবারেই পাত না দিয়া ২।৩ বারে দিলে ভাল হয়। কারণ এ সময়ে অতি সামান্য কারণেই বীজ নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে। অনেক সময় একই বীজ ২।৩ বারে ব্যর্থ হইয়া, ৪র্থ বারে অঙ্কুরিত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলেও প্রায় বারমাসই এই চারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

টবে, গামলায়, হাপোরে অথবা মাদায় যেখানেই চারা প্রস্তুত হউক না কেন, যত্ন সর্ব্বত্রই সমান করিতে হইবে। প্রয়োজন মত জল সেচন, অতিরিক্ত রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে আচ্ছাদন দানের বন্দোবস্ত ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। চারা রৌদ্রে ঝিমাইয়া গেলে, গাছের জীবনীশক্তির বিশেষ অনিষ্ট হয়। তাহাতে গাছের ফলনেও বিলম্ব ঘটিতে পারে। মাদা ব্যতীত অন্যত্র চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, উহাদিগকে ২।১ বার হাপোরান্তরে স্থানান্তরিত

করিয়া, পরে স্থায়িভাবে রোপণ করিবেন। হাপোরে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে প্রত্যেকবারই চারাগুলির ব্যবধান কিছু কিছু বাড়াইয়া দিবেন।

এইরূপে চারা প্রস্তুত হইলে, একদিন পরিষ্কার অপরাহ্নে চারাগুলিকে হাপোর হইতে তুলিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ভালরূপে শীতল জল ছিটাইয়া দিয়া, শেষে ৪।৫ হাত ব্যবধানে জমিতে স্থায়িভাবে রোপণ করিবেন। এই সময়, গাছের নিম্নাংশের কতকগুলি ডালের পাতা একেবারে কাটিয়া বাদ দিবেন। কিন্তু গাছের কাণ্ড ঘেঁসিয়া একখানা ডালও কাটিবেন না। উহাতে কাণ্ডে ক্ষত হইতে পারে। পাতাগুলি কাটিয়া লইলেই ডালগুলি ক্রমে নিজ হইতে ঝরিয়া পড়িবে। অথচ তাহাতে কাণ্ড আহত হইবে না।

পেঁপে গাছ হইতে ফল পাওয়া অনিশ্চিত। গাছে প্রথমবার ফুল না আসা পর্য্যন্ত, এ সম্বন্ধে মানবের সমস্ত জ্ঞান প্রকৃতির এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে আবৃত থাকে। ফুল আসিলে বুঝিতে পারা যায়, কোন গাছে ফল হইবে এবং কোন গাছে হইবে না। যে গাছে ফুলের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ কাঁদি নামিয়া আসে, সেগুলি পুরুষ জাতীয় বৃক্ষ। এই বৃক্ষে ফল জন্মে না। কোন কোন গাছে স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প উভয়ই থাকে। এই প্রকৃতির গাছে ফল ধারণে কোন বাধা জন্মে না। কোন গাছে শুধু স্ত্রী পুষ্পই থাকে। এই গাছের ফুল, ফলে পরিণত হইয়াই ঝরিয়া পড়ে। এই জন্য গাছে

ফুল আসিলেই, কোনগুলি পুংজাতীয় গাছ তাহা নির্ণয় করতঃ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিঘায় ৪।৫টী মাত্র উক্ত গাছ রাখিবেন, অবশিষ্ট পুরুষ গাছগুলি কাটিয়া ফেলিবেন। পুংজাতীয় গাছে ফল না হইলেও, স্ত্রী জাতীয় গাছে ফল ধরাইবার জন্য মাঝে মাঝে ১টী করিয়া পুংজাতীয় গাছ রাখা আবশ্যক। যে গুলিতে উভয় জাতীয় পুষ্প থাকে সেগুলির কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া, প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পেঁপে গাছ খুব বৃদ্ধিশীল। ইহা খুব দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছগুলিতে সার প্রদান করা আবশ্যক। এই সার প্রদানে গাছের ফল বেশ পরিপুষ্ট হয়। ইহার কাণ্ডে ফল জন্মে। এক একটী গাছে প্রায় শতাধিক ফল ধরিয়া থাকে। বড় ফল পাইতে হইলে, মাত্র অল্প কয়েকটী ফল গাছে রাখিয়া বাকীগুলি প্রথমাবস্থায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই গাছের বিশেষ পরিচর্য্যার প্রয়োজন। ফল ধরিবার পূর্ব্বে গাছে সার প্রয়োগ প্রধান কর্ত্তব্য। এ ক্ষেত্রে পুরাতন গোময় সারই উৎকৃষ্ট। পুকুরের পাঁকমাটীও পেঁপের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। প্রত্যেক বৎসর মাটি দিয়া গাছের গোড়া উঁচু করিয়া দেওয়া উচিত। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ইহার চাষ করিতে হইলে, বর্ষান্তে গাছে জল না দিলে পাতা ঝরিয়া যায়। তবে জল সেচন করা না করা জমির ভাবের

উপর নির্ভর করে। যদি জমি স্বভাবতঃই সরস প্রকৃতির এবং জলবায়ু সর্দ্দিময় হয় তবে অবশ্য জল না দেওয়াই ভাল; কিন্তু তাহা না হইলে জল দেওয়া আবশ্যক। আবার অতি-রিক্ত জল দেওয়া হইলে গাছের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইবে। এ জন্য এই সব ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। গাছটীকে অধিক ফলবান ও ঝাড়াল করিতে হইলে গাছটী ৪।৫ ফিট উচ্চ হইলে মাথাটী ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

কাঁচা অবস্থায় পেঁপে দিয়া অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। উহা উপকারী এবং মুখরোচক। পেঁপের ভিতরে ঘন দুগ্ধবৎ যে আঠা আছে উহা খুব পাচক। ঐ রস পাকা কলার সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্মরোগে বিশেষ উপ-কার দর্শায়। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ক্রিমি ও গ্রহণী রোগেরও মহৌষধ। পাকা পেঁপে বলকারক, শোণিত শোধক, ক্লান্তি-হারক, স্নিগ্ধ-শীতল খাদ্য। পেঁপের আঠা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে, অম্লরোগে উপকার হয়।

সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চাষ করিলে পেঁপে চাষে বেশ লাভবান হওয়া যায় সন্দেহ নাই। সহর অঞ্চলে পাকা পেঁপে খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। বাজারে কাঁচা পেঁপের চাহিদাও যথেষ্ট। এক বিঘা জমিতে প্রায় ২০০ শত গাছ লাগান যায়। বিঘা প্রতি সমস্ত খরচ বাদে প্রায় ১৫০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

বাদাম (Almond)

(দেশী)

দেশী বাদামের বিস্তৃত চাষ বড় একটা দেখা যায় না। বাজারেও ইহা বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা নাই। এই গাছ ৩০।৩৫ হাত উচ্চ ও দীর্ঘ শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা বঙ্গ-দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই জন্মে।

পাকা বাদাম ফল পুঁতিয়া দিলেই এই গাছ উৎপন্ন হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাস ইহার চারা প্রস্তুতের সময়। ইহার জন্য বিশেষ কোন পাট প্রয়োজনে আসে না।

এই গাছ বৎসরে দুইবার ফল প্রসব করে। একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে, আর একবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে। ইহার উপরকার আবরণ খুব শক্ত। কাঁচা বাদামের খোলার বর্ণ ঘন সবুজ কিন্তু পাকিলে রং লালচে হইয়া যায়। ইহার ভিতরে সাদা শাঁস থাকে। এই শাঁস বেশ মুখরোচক। ফল নিঃশেষ হইয়া গেলে, এই গাছের পাতা প্রত্যেক বার ঝরিয়া যায়।

(কাশ্মীরী)

কাশ্মীরী বাদাম খুব উৎকৃষ্ট খাদ্য। বাঙ্গালা দেশে ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে। পঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্থান,

পেশোয়ার, প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা সহজেই উৎপন্ন হয়। পার্ব্বত্য ভূমিতেই ইহার ফলন অধিক হইয়া থাকে।

বীজ ও কলম উভয় প্রকারেই ইহার চারা প্রস্তুত হইতে পারে। দেশী বাদামের মত এই গাছ তত বড় হয় না, মাত্র ১৫।১৬ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। জমিতে ১৪।১৫ হাত ব্যবধানে এক একটী গর্ত্ত করিয়া, গোবর সার, গোশালার আবর্জ্জনা পচা সার ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া, শেষে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অথবা অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে প্রতি গর্ত্তে, এক একটী চারা রোপণ করিয়া যাইতে হয়।

শীতকালে এই গাছ মুকুলিত হয় এবং গ্রীষ্মের শেষে ফলগুলি পাকিয়া থাকে। এই ফলের আবরণ খুব কঠিন। ইহার ভিতরে কোমল শাঁস থাকে। এই বাদাম খুব পুষ্টিকর খাদ্য এবং ইহা বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে।

বিলম্বী (Bilimbi)

ইহা ভারতীয় ফল নহে। মালাক্কাস দ্বীপপুঞ্জ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান।

এই গাছের কলম হয় না। বীজ হইতেই চারা প্রস্তুত হয়। খুব হালকা মাটি দিয়া হাপোর তৈয়ারী করিয়া, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এই বীজ পাত দিতে হয়। ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যেই

বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি ২।৩ ইঞ্চি বড় হইলে, অন্য ছাপোরে তুলিয়া বসাইতে হয়। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর কাল পালন করিয়া, শেষে জমিতে স্থায়িভাবে বসাইতে হইবে। এই গাছ শৈশবে ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য, ছোট ছোট চারাগুলিকে বর্ষা ও শীত ঋতুতে, ঠাণ্ডার হস্ত হইতে রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু এই বন্দোবস্তের ফলে, মুক্ত আলো ও বাতাস হইতে যেন চারাগুলি বঞ্চিত না হয়।

মাঘ মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে। কাঁচা অবস্থায় এই ফল অত্যন্ত টক্। পাকিলে অম্লমধুর রস বিশিষ্ট হয়। কাঁচা বিলম্বী দিয়া টক্, চাটনী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। এই ফলগুলির আকার লম্বা।

এই গাছ ২০।২৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ১২ হাত হইতে ১৫ হাত ব্যবধানে ইহা বসাইতে হয়।

বিলাতী গাব (Belatee gab)

ইহার নাম বিলাতী গাব হইলেও ইহার জন্মস্থান বিলাত নহে। জাপান ও চীনদেশ ইহার আদি ও স্বাভাবিক জন্মভূমি। যে দেশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র ও শীতল, সেই

দেশেই ইহা ভালরূপে জন্মে। বঙ্গদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইহার অনুকুল বলিয়া, এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার চাষ চলিতে পারে।

বীজে এবং কলমে, উভয় প্রকারেই ইহার চারা প্রস্তুত করা যায়। দাবা, গুটী ও জোড় কলমে ইহার চারা প্রস্তুত হয়। এই গাছগুলির আকার অনেকটা আপেল গাছের মত। এগুলি উচ্চে ১৫।২০ হাত হইয়া থাকে। ইহার জমি সমতল হইলেই ভাল হয়। ১২ হাত ব্যবধানে ২ হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া, গোবরসার অথবা গোশালার আবর্জ্জনা পচা সার মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ভরাট করিয়া দিবেন। তারপর প্রতি গর্ত্তে এক একটী চারা রোপণ করিয়া যাইবেন। বর্ষা-কালই এই চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অবশ্য শীত-কালেও রোপণ করা চলে। চারাগুলি বসাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচন করা দরকার। বর্ষাকালে জল সেচন করা প্রায়শঃই আবশ্যক হয় না। কিন্তু শীতকালে চারা রোপণ করিলে, নিয়মিত জল সেচন আবশ্যক। নতুবা চারা-গুলি শুকাইয়া মরিয়া যাইতে পারে।

ফাল্গুন মাস হইতেই এই গাছে মুকুল আসিতে থাকে। মুকুল আসিবার প্রায় একমাস কাল পূর্ব্বেই, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড়গুলিকে মুক্ত আলো ও বাতাস খাওয়ান দর-কার। সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত গোড়া উন্মুক্ত রাখিয়া, শেষে সার-যুক্ত মাটি দ্বারা গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয় এবং মুকুলিত না

হওয়া পর্য্যন্ত জল সেচন করিতে হয়। ফুল আসিলে জল দান বন্ধ রাখিয়া, আবার ফল দেখা দিলেই জল দিতে হয়। এই-রূপ পরিচর্য্যার অভাব হইলে, গাছ মুকুলিত হইতে বাধা পায় বা মুকুল প্রসব করিলেও সুফল দানে সক্ষম হয় না।

আশ্বিন মাস হইতে এই ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করিয়া, পৌষ মাঘ মাস পর্য্যন্ত গাছে থাকে। পাকা বিলাতী গাব খাইতে অতি চমৎকার। ইহার স্বাদ মিষ্ট এবং ইহাতে স্বাভাবিক একটা সদগন্ধ আছে। বাজারে এই ফলের যথেষ্ট চাহিদা আছে। সুতরাং ব্যবসায় হিসাবে ইহার চাষ করিলে লাভবান হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

বেল। (Marmelos)

বেলের অপর নাম শ্রীফল। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের চাষে কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা সহজেই জন্মিয়া থাকে।

বেল গাছের শাখা প্রশাখা তীক্ষ্ণ কাঁটায় আচ্ছন্ন থাকে। ইহার পাতাগুলি ত্রিপত্র অর্থাৎ একটী বোঁটায় ৩টী পাতা সাজান থাকে। এই গাছ খুব বড় হইয়া থাকে। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৬।১৭ হাত হইয়া থাকে। বেল গাছের কলম হয় না। ইহার বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

হাপোরে বীজ পাত দিয়া চারা তৈয়ারী করা কর্ত্তব্য। তবে বেল গাছের শিকড় হইতে অনেক সময় স্বভাবতঃই চারা উঠিয়া থাকে। এগুলি ফলে খুব শীঘ্র এবং ফল বেশ বড় হয়। যাহা হউক, চারাগুলিকে এক হাপোর হইতে অন্য হাপোরে স্থানান্তরিত করিতে হয়। যখন এগুলি এক ফুট কিম্বা দেড় ফুট বড় হইবে, তখন জমিতে স্থায়িভাবে রোপণ করিতে হইবে। এই বীজ হাপোরে পাত দিবার সময়, মাটীর সঙ্গে কিছু পাতা পচা সার মিশ্রিত করিলে ভাল হয়।

বেলের পক্ষে দোআঁশ জমিই উপযুক্ত। জমিটীকে বেশ ভালরূপে কয়েকবার লাঙ্গল দিয়া, উহার আভ্যন্তরীণ দোষগুলি সংশোধন করিয়া, পচা গোবর সার প্রয়োগ করিতে হয়। তারপর ১২ হাত ব্যবধানে এক একটী গর্ত্ত করিয়া চারা বসাইয়া যাওয়া উচিত।

গাছগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে যদি দেখা যায় যে, কাণ্ডে ছোট ছোট ফেঁকড়ী জন্মিয়াছে, তবে সেগুলিকে কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। গোড়ায় কোনরূপ আগাছা না জন্মে সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। ঐ ফেঁকড়ী বা আগাছা গাছের রস শোষণ করিয়া গাছের স্বাভাবিক শক্তিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে। এইরূপ গাছের ফল ভাল হয় না।

বেল গ্রীষ্মের ফল। চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। এই সময় বেলের সরবৎ অতি তৃপ্তিকর উপকারী পানীয়। ফলের উপরে কঠিন আবরণ

থাকায়, পক্ষী এই ফলের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। বেল কাঁচা অবস্থায় সবুজ বর্ণের থাকে। পাকিলে হলুদে রং ধরে। ইহার ভিতরে যে বীচি থাকে, তাহা এক প্রকার আঠায় জড়িত থাকে। অনেকে ঐ আঠার জন্য বেলের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ঐ আঠা মানব শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। বেল পানা করিয়া খাইলে, ঐ আঠা সমেত শাঁস জলে গুলিয়া লইয়া, একটু লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া লইলে ঐ আঠার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, এমন কি গন্ধ পর্য্যন্ত থাকিবে না। শেষে উহা ছাঁকিয়া ফেলিলে বীচিগুলি মাত্র বাদ যাইবে। ইহাতে বেলের প্রত্যেকটী উপকারী উপাদান কাজে লাগিতে পারিবে।

বেল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই উপকারী। বেল-শুঁঠ, বেলের মোরব্বা অতি উপাদেয় এবং হিতকর। উৎকৃষ্ট জাতীয় বেলের একটা স্বাভাবিক মনোহর ঘ্রাণ আছে। বেলপাতার রস রোগ বিশেষের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বেলপাতা হিন্দুদের দেবতা বিশেষের সেবার অপরিহার্য্য উপকরণ। বেলগাছকে হিন্দুগণ অতি পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন।

বাংলা দেশের মধ্যে রংপুরের বেল খুব প্রসিদ্ধ। উহার আকার যেমন বৃহৎ, স্বাদ ও গন্ধ তেমনি চমৎকার।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বেল কাঁচা অবস্থায় ধারক এবং পক্ক অবস্থায় সারক। ডিসপেপ্সিয়া, অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি

রোগে, ইহা হইতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অর্শ রোগীর পক্ষে ইহা নিয়মিত সেবন অতিশয় হিতকর। পাকা বেল কোষ্ঠবদ্ধতার মহৌষধ।

হিন্দুশাস্ত্রে গ্রহ ও রোগ বিশেষের শান্তির জন্য বেলের মূল ধারণ করিবার বিধান আছে।

ব্রেডফ্রুট (Bread fruit)

ইহা ভারতীয় ফল নহে। ইহার প্রচলনও এ দেশে খুব কম। অনেকে হয় ত ইহার নামই জানেন না। এই গাছের পাতা খুব লম্বা এবং চওড়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সাধারণের ভিতরে ইহা রুটীফল বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে, এই ফলের সঙ্গে রুটীর কোনই সাদৃশ্য নাই। ইংরেজী 'ব্রেডফ্রুট' শব্দ হইতেই বোধ হয় তর্জ্জমা করা বাঙ্গালা নাম হইয়াছে 'রুটীফল'।

এই ফলগুলি দেখিতে অনেকটা ছোট কাঁঠালের মত। কাঁঠালের মত উহার উপরিভাগে কাঁটা আছে। ইহার ভি তরটা কাঁঠালের মত নহে। আগুণে পোড়াইয়া এই ফলের শাঁস ভক্ষণ করিতে হয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ কদর নাই।

পূর্ব্বউপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা স্বভাবতঃই জন্মে। এ দেশে এগুলি বিশেষ ভাল হয় না। গাছ হইলেও ফল খুব বিরল। এই গাছ ৩০।৩৫ হাত উচ্চ হয়।

বীজ হইতেই ইহার চারা জন্মে। ইহার কলম হয় না। বাগান সাজাইবার জন্য রকমারী ফল হিসাবে, ইহা আজকাল অনেকের বাগানে ক্রমেই স্থান পাইতেছে।

লকেট (Loquet)

লকেট গ্রীষ্মের ফল। ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান না হই-লেও, ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ইহা জন্মে এবং সর্ব্বত্রই ইহার প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জলবায়ু ও মৃত্তিকার বিভিন্নতার জন্য দেশ ভেদে ইহার স্বাদ ও আকা-রের তারতম্য লক্ষিত হয়। ইহা একটী উপাদেয় রসাল ফল বলিয়া সকলের নিকটেই বিশেষভাবে আদৃত।

ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান যায়। কলম হইতেও চারা প্রস্তুত হয়। গুল কলমে ইহার চারা তৈয়ারী করিতে হয়। বীজের চারা করিতে হইলে নূতন বীজই প্রশস্ত। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসই চারা প্রস্তুতের সময়।

লকেটের জন্য একটু উচ্চ জমি প্রয়োজন। ভিজা নিম্ন ভূমিতে ইহা ভাল জন্মে না। ভূমি যত নিম্ন হইবে ইহা ততই নিকৃষ্ট হইতে থাকিবে। আষাঢ় মাসে এই গাছ রোপণ করিতে হয়। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরেই এই গাছ ফলিতে আরম্ভ করে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ২।৩ সপ্তাহ অনাবৃত রাখিবেন। তারপর নূতন মাটির

সঙ্গে গোময় সার, পাতা সার ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিবেন।

এই গাছ সাধারণতঃ পৌষ মাস হইতেই মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে। লকেট ফলের গন্ধ বড় চমৎকার। গাছে ফুল আসিলেই, গাছের গোড়ায় বেশ ভালরূপে জল দিবেন। তারপর জল শোষিত হইলে মাটির যখন 'যো' হইবে, তখন গোড়ার মাটি উস্‌কাইয়া দিবেন। পরের দিন ঐ মাটি হালকা ভাবে একটু চাপিয়া, উপরে পুরু করিয়া পাতা সার বা গোয়া-লের আবর্জ্জনা পচা সার বিছাইয়া দিবেন। ইহাতে গাছ স্নিগ্ধ-শীতল থাকিবে এবং উত্তম ফল দিবে। তারপর ফল ধরিতে থাকিলে, মাটির 'যো' বুঝিয়া মাসে ২।১ বার জল দিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহাতে ফলের আকার বড় হইবে এবং ফলও সুস্বাদু হয়।

চৈত্র মাস হইতেই এই ফল পাকিতে থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এই ফল পাওয়া যায়।

লকেট গাছ ১৫।১৬ হাত উচ্চ হয়। ইহার পাতার উপ-রের বর্ণ ঘন সবুজ এবং নিম্নাংশ একটু শ্বেতাভ।

বাঙ্গালা দেশের লকেট অপেক্ষা, পশ্চিমাঞ্চলের লকেট অধিক বড় ও সুস্বাদু হয়। সাহারাণপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ, আঁম্বালা, নাভা প্রভৃতি স্থানের লকেট অত্যন্ত রসাল ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। দেশ ও জলবায়ু ভেদে ফলের আকার, স্বাদ ও সৌরভের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জাপান ও চীন দেশ

লকেটের আদি জন্মস্থান। জাপানী লকেট অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

লকেটের চাষ করিয়া ব্যবসায় করিলে লাভবান হওয়া যায়।

লিচু। (Lichee)

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালীন বিশিষ্ট ফলগুলির মধ্যে লিচু অন্যতম। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তাপিত হইয়া ইহার ২।৪টী ফল ভক্ষণ করিলে, শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। ইহা অতি রসাল, সুমিষ্ট উপাদেয় ফল।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ইহার বহুল প্রচলন হইলেও, ইহার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ নহে। চীন দেশেই ইহা প্রথমে জন্মে। তারপর ক্রমে অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

বীজ হইতে লিচুর চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু এই গাছে অনেক বিলম্বে ফল ধরে এবং ইহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন যে কোন পথে যাইবে তাহা ঠিক বলা যায় না। বীজোৎপন্ন গাছের ফল, প্রায়ই মূল গাছের ফলের মত হয় না। এই জন্যই, লোকে কলমের চারার পক্ষপাতী। তবে বীজের চারা প্রস্তুত করিতে গেলে, অনেক সময় নূতন জাতির সৃষ্টি হইতে পারে।

আষাঢ় মাসই কলম বা চারা প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। লিচু গাছে গুটী কলম ও দাবা কলম করিতে হয়। কলম-তত্ত্বে এগুলি প্রস্তুতের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। তদনু-যায়ী কলম প্রস্তুত করিয়া, কিছু দিন হাপোরে প্রতিপালন করিবেন। হাপোরে বসাইয়া পালন করিবার সময়, বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যেন হাপোরে কোন সময়ে জলাভাব না ঘটে। এই ভাবে কিছু দিন পালন করিলে পর, কলমগুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠিবে। শরতের শিশিরপাত আরম্ভ হইলে উহাদিগকে তুলিয়া, বাগানে ২০।২৫ হাত ব্যবধানে রোপণ করিয়া যাইবেন। বর্ষাকালেও কলম রোপণ করিলে ভাল হয়। এই সময় বর্ষার জলে গাছগুলি খুব শীঘ্রই স্থানান্তর-জনিত ক্লান্তি দূর করিয়া ফেলিতে পারে এবং শিকড়গুলিও অল্পদিন মধ্যে মাটির সঙ্গে বেশ লাগিয়া যায়। নবরোপিত চারায় প্রথম প্রথম ২।১ বৎসর নিয়মিত ভাবে জল দিতে হয়। তবে বর্ষাকালে বৃষ্টির অভাব না ঘটিলে জল দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পৌষ মাঘ মাস হইতেই লিচু গাছ মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং কার্ত্তিক মাস হইতেই ফলোন্মুখী গাছের পরিচর্য্যা আরম্ভ করা উচিত। এই সময় গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয়। লিচুর পক্ষে হাড়ের গুঁড়া উত্তম সার। পুরাতন গোবর সার এবং গোয়ালের আবর্জ্জনা পচা সারও বিশেষ উপযোগী। এই সময় গাছে জল সেচন

নিষিদ্ধ। তারপর গাছে যখন মুকুল ধরিতে আরম্ভ করিবে, তখন আবার জল সেচন করিতে হইবে। জমির অবস্থা বিবেচনায়, মাসে ৩।৪ বার জল দিলেই চলিতে পারে। এই সময়ে জলের অভাব হইলে অর্থাৎ গাছ যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস সঞ্চয়ে অপারগ হয়, তবে মুকুল নষ্ট হইতে পারে এবং ফলও কদর্য্য হইতে পারে।

বৈশাখ মাস হইতেই লিচু পাকিতে আরম্ভ করে। লিচু পাকিতে আরম্ভ করিলেই কাক, বাদুড় প্রভৃতি নানা জাতিয় পক্ষী আসিয়া অনেক ফল নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাদের আক্রমণ হইতে ফল রক্ষা করিতে হইলে, লিচুগুলি বড় হইলে কাঁচা অবস্থাতেই গাছটী জাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। কাঁচা অবস্থায় লিচুর বর্ণ সবুজ, পাকিলে লাল হইয়া থাকে।

বাগানের শোভা বর্দ্ধনের পক্ষে লিচু গাছ বিশেষ উপযোগী। ইহার ডালপালা ও পাতাগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট। পাতাগুলি ঘোর সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। এই গাঢ় সবুজ আবরণের ভিতরে, পাকা পাকা লাল বর্ণের লিচুর থোপাগুলি বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। ফলের জন্য এবং শোভার জন্য, সৌখীন ব্যক্তি মাত্রেই বাগানে লিচু গাছ রোপণ করিয়া থাকেন।

'আরাকনিডা আকারিণা' নামক এক প্রকার পতঙ্গ ইহার পত্রে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। ঐ ডিম হইতে সহস্র সহস্র কীট উৎপন্ন হইয়া লিচু গাছের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। ঐ

কীটগুলি এত সূক্ষ্ম যে অনেকগুলি একস্থানে একত্র না থাকিলে বুঝিবার উপায় নাই। লিচু পাতার নীচে অনেক সময় লাল গুঁড়া দেখা যায়। ঐ গুঁড়াগুলিই ঐ জাতীয় হাজার হাজার কীটের একত্র সমাবেশ। উহাদের আক্রমণে পাতাগুলি ক্রমেই শুকাইয়া যায় এবং পাতার কার্য্যকারী শক্তি ক্রমশঃই লোপ পায়। গাছে ঐরূপ কোন পাতা দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ সাবধানে ভাঙ্গিয়া আনিয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। এরূপ সাবধানে পাতাটী ভাঙ্গিবেন যেন অন্য কোন পাতায় ঐ গুঁড়া না পড়িতে পারে। যে পাতায় ঐগুলি পড়িবে, সেই পাতাই আবার আক্রান্ত হইবে। এই ভাবে প্রথম হইতে সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে, উহাদের ব্যাপক সংক্রমণে বাগানের সমস্ত গাছই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

ধনী, নির্ধন সকলের নিকটেই লিচু সমান আদরের এবং ইহার মূল্যও খুব বেশী নয় বলিয়া সকলেই অল্প বিস্তর ক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলনও প্রচুর হইয়া থাকে। কাজেই প্রকৃষ্ট উপায়ে উৎকৃষ্ট জাতীয় লিচুর চাষ করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশের লিচু অপেক্ষা মোজাফঃরপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের লিচু অনেক ভাল। ঐরূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় লিচুর কলম আমদানী করিয়া রোপণ করা উচিত।

রেড়ী বা সরিষার মত লিচুর বীচি হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করা যায়। তৈল নিষ্কাষিত করিয়া লইলে যে খৈল

থাকে, তাহা গোমহিষাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কেহ মনোযোগী হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। লিচু বীজ হইতে তৈল ও খৈল প্রস্তুত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে, দেশের পক্ষে নূতন একটী আয়কর পন্থা সৃষ্ট হইতে পারে সন্দেহ নাই।

লেবু (Lemon)

লেবু মহা উপকারী নিত্য প্রয়োজনীয় ফল। আকারে, স্বাদে এবং গুণে বিভিন্ন জাতীয় লেবু আছে। পাতি, কাগজী, বাতাবী, গোঁড়া, কমলা, সরবতী প্রভৃতি প্রত্যেক জাতিরই এক একটা পৃথক্ বৈশিষ্ট্য আছে। লেবুর চাহিদা সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের নিকটেই খুব বেশী। ইহাদের মধ্যে আবার পাতি, কাগজী ও কমলার প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক জাতীয় লেবুর বিবরণ পৃথক পৃথক দেওয়া হইল।

পাতি ও কাগজী লেবু।

বীজ হইতে পাতি ও কাগজী লেবুর চারা প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু কলমই উৎকৃষ্ট। দাবা কলম, গুটী বা গুল কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। কলম প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট সময় বর্ষাকাল। গাছের ফেঁকড়ী হইতেও

উৎকৃষ্ট চারা প্রস্তুত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুষ্ট ফেঁকড়ীটি, কাণ্ডের ঈষৎ ছাল সমেত তুলিয়া, হাপোরে যথানিয়মে পালন করিলেই চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই লেবুর পক্ষে দোআঁশ ও দুধে এঁটেল প্রকৃতির মাটি হইলেই ভাল হয়। বেলে মাটিতে ইহা একরূপ হয় না বলিলেই চলে। বেলে মাটি সাধারণতঃ নীরস হয়, জল দিলেও অতিরিক্ত শোষকতা গুণে শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। কাজেই এরূপ নীরস জমিতে লেবু ভাল হইতে পারে না। নির্ব্বাচিত জমিটী ভালরূপে চাষ দিয়া বা কোদাল দিয়া কুপাইয়া আগাছা ইত্যাদি বাছিয়া ফেলিবেন। তারপর পুরাতন গোবর সার দিয়া জমিটাকে বেশ পাট করিয়া লইবেন। শেষে বর্ষার প্রারম্ভে বা বর্ষা একটু ধরিয়া গেলে, স্থায়িভাবে বসাইয়া যাইবেন। উভয় গাছের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ৭।৮ হাত রাখিলেই চলিবে। লেবু গাছ স্থায়িভাবে রোপণের সময় ঈষৎ হেলাইয়া বসাইবেন, তাহাতে গাছ বিস্তৃত হয় এবং প্রচুর ফল ধারণ করিতে সক্ষম হয়।

গাছ বসাইবার সময় প্রথম প্রথম উহাদিগকে একটু ছায়া দিতে হইবে, নতুবা রৌদ্রের তেজে মরিয়া যাইতে পারে। শিকড় ধরিয়া গেলে আর ছায়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। বর্ষাকাল ব্যতীত, মাটির রসভাব বুঝিয়া নিয়মিত জল দিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া, শিকড়গুলিকে মুক্ত আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে আনিতে হইবে। উহাতে

শকড়ে কোন রোগ জন্মিতে পারে না, বরং মুক্ত আলো ও বাতাসে শিকড়ের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিকতর রস সরবরাহ করিয়া, গাছের পরিপোষণে সহায়তা করে। গাছের গোড়া ৫।৭ দিন ঐরূপ অনাবৃত রাখিয়া, শেষে রাবিশ, পুরাতন গোবর সার, পলিমাটি ইত্যাদি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

মাঘ মাস হইতেই, লেবু গাছ মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে। এই জন্য, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই উপরোক্ত প্রথায় গাছের পাট করিতে হয়। এই সময়ে মাটিতে যেন কোন মতে রসাভাব না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সপ্তাহে একবার নিয়মিত জল দানের ব্যবস্থা করিবেন। এই সময়ে গাছ যদি প্রয়োজনানুরূপ রসে বঞ্চিত হয়, তবে মুকুলকে পুষ্ট করিয়া, ফলে পরিণত করিবার শক্তি পরিচালিত করিতে পারে না। তাহাতে অনেক সময় মুকুল এবং কচি ফল, গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে।

ফাল্গুন মাস হইতেই লেবু ব্যবহারযোগ্য হয়। পাতি-লেবুর রস খুব উপকারী। ইহার রস হইতে একরূপ আরক প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়। এই লেবুর চাষ বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। এক একটী গাছে ফলে প্রচুর এবং বাজারে ইহার চাহিদাও খুব। কাজেই, উপযুক্ত স্থানে ইহার আবাদ করিয়া চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই লাভবান হওয়া যাইবে। লেবু গাছ কাঁটাযুক্ত হইয়া থাকে। কাজেই এই গাছ দিয়া বেড়া দিলে, বেড়ার জন্য পৃথক খরচের

আবশ্যক হয় না, উপরন্তু বেড়া হইতেও একটী স্থায়ী আয়ের উপায় হইয়া থাকে।

পাতি ও কাগজীলেবু উভয়কেই আমরা একই প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু উপকারীতা পাতিলেবুরই অধিক। কাগজীলেবুর ঘ্রাণ পরম তৃপ্তিকর, পাতিলেবুর ঐরূপ সুঘ্রাণ নাই। পাতিলেবুর আকার গোল কিন্তু কাগজীর আকার ঈষৎ লম্বা। পাতিলেবুর আচার অত্যন্ত রুচিকর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পাতি এবং কাগজী উভয় লেবুই, ক্রিমি ও অম্লনাশক এবং উদরশূল নিবারক। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগে ইহা পরম হিতকর। সকলেরই নিয়মিত ভাবে লেবুর রস পান করা কর্ত্তব্য।

বাতাবী লেবু। (**Pumelo**)

দেশ ভেদে ইহার নামের তারতম্য আছে। এক বাঙ্গালা দেশেই উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, ইহা পৃথক পৃথক নামে অভিহিত। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাকে জম্বুরা, উত্তরবঙ্গে বাদামী এবং পশ্চিম বঙ্গে বাতাবী বলে। হিন্দীতে ইহার নাম চকোত্রা।

বাতাবী লেবু ভারতের নিজস্ব ফল কিনা সে সম্বন্ধে মতা-নৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, ব্যাটেভিয়াতে ইহা প্রথমে জন্মে। তথা হইতে ক্রমে এ দেশে প্রচলিত হয়। সে যাহাই হউক, আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র ইহা যথেষ্ট জন্মিয়া

থাকে। বেশ যত্ন পূর্ব্বক চাষ করিলে, ইহা দ্বারাও লাভবান হওয়া যায়।

বীজ হইতে ইহার চারা হয়। পল্লী-গৃহস্থের আবাসে যে সব গাছ দেখা যায়, তাহা প্রায়ই বীজ হইতে উৎপন্ন। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইহার চাষ করিতে হইলে কলম হইতে চারা প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত। কলম করিবার প্রশস্ত সময় বর্ষাকাল। গুটী ও জোড় কলমে ইহার চারা তৈয়ারী করা যায়। এক বর্ষায় কলম প্রস্তুত করিয়া, বৎসরকাল হাপোরে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, পরবর্ত্তী বর্ষায় জমিতে স্থায়িভাবে লাগাইতে হয়।

বাতাবী লেবুর জমি সরস হওয়া দরকার। এই জন্য বেলে মাটিতে ইহা ভাল জন্মে না। সরস, দোআঁশ বা দুধে এঁটেল মৃত্তিকা ইহার পক্ষে প্রয়োজন। এই গাছ ১৫।১৬ হাত উচ্চ হয় এবং তদনুযায়ী ইহার শাখা-প্রশাখাগুলিও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ১২ হইতে ১৬ হাত ব্যবধানে প্রত্যেকটী চারা রোপণ করিতে হয়। তবে এই গাছগুলি খুব দীর্ঘজীবী এবং অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল, এ জন্য ইহাদের ব্যবধান আরও বাড়াইলে ভাল হয়।

প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতরেই, ইহার গোড়া খুঁড়িয়া, বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাস খাওয়াইতে হয়। শেষে কিঞ্চিৎ চূণ, ছাই, পাঁকমাটী-সার ও নূতন মাটী মিশ্রিত করিয়া গোড়া ঢাকিয়া দিতে

হয়। এই চূণ প্রয়োগে ফলের অম্লভাব দূর হয় এবং ফলগুলি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়া থাকে। বাতাবী ফুলের গন্ধ অতি মনোহর। সাদা সাদা ফুলগুলি গাছে ফুটিয়া থাকিয়া, চতুর্দ্দিক সৌরভে আমোদিত করে। মাঘ মাস হইতেই এই ফুল ফুটিতে থাকে। কোন কোন গাছে ফাল্গুন চৈত্র মাসেও ফুল ফুটিয়া থাকে। শ্রাবণ মাস হইতেই এই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। বাতাবী কাঁচা খাওয়া যায় না। ফল না পাকা পর্য্যন্ত ইহা অন্য কোন কাজে আসে না। এই ফলের একটা বিশেষত্ব এই যে, এগুলি পাকিয়া গেলেও, না পাড়িলে গাছ হইতে খসিয়া পড়ে না, দীর্ঘকাল গাছের সঙ্গেই ঝুলিতে থাকে। এইরূপে সুপক্ক হইয়া অধিক দিন গাছে থাকিলে, ফল অপেক্ষাকৃত নীরস হইয়া যায়। এই জন্য, ফলগুলি পাকিয়াছে বুঝিলেই, গাছে উঠিয়া—ঝুড়ি বা থলের ভিতরে পুরিয়া নামাইতে হয়। মাটিতে আছাড় খাইলে ইহার স্বাদ বিকৃত হইয়া থাকে।

এই ফলগুলির আকার গোল এবং বড় হইয়া থাকে। পাকিলে ফলের রং হলদে হইয়া যায়। কোন কোন ফল আবার পাকিলেও সবুজ বর্ণ ই থাকে। পাকা ফলের ভিতরে ৮।১০ কোয়া লেবু থাকে। প্রত্যেক কোয়া আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য কোয়ায় ভর্ত্তি থাকে। এই কোয়াগুলি রসে পরিপূর্ণ থাকে। স্থান, জলবায়ু ও জাতিগত উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা অনুযায়ী ইহার স্বাদ অম্ল, অম্লমধুর ও মধুর হইয়া

থাকে। কাঁচা অবস্থায় ইহার বাহির সবুজ ও ভিতর সাদা থাকে। পাকিলে ভিতর লাল বর্ণ হয়। ইহার কোয়ার ভিতরে বীচি থাকে। এই বীচি হইতেই গাছ জন্মিয়া থাকে।

অম্লরসযুক্ত বাতাবী লেবু সুপক্ক অবস্থায় গাছ হইতে পাড়িয়া, কিছু দিন ঘরে রাখিয়া ব্যবহার করিলে, অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হয়।

বাতাবী লেবুর রস বেশ মুখরোচক। কিন্তু অম্লরসযুক্ত লেবু অধিক খাওয়া উচিত নহে। উহাতে শরীর অসুস্থ হইতে পারে। যাঁহাদের যকৃতের দোষ আছে, তাঁহাদের পক্ষে বাতাবী লেবু বিশেষ উপকারী।

গোঁড়া লেবু।

গোঁড়া লেবু অত্যন্ত টক রসযুক্ত বলিয়া ইহার সাধারণ ব্যবহার খুব বিরল। তাহা হইলেও প্লীহা, যকৃত, ঘুসঘুসে জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহা পরম উপকারী। এই লেবুর রস জ্বাল দিলে গুড়ের মত ঘন হয়। ঐ ঘনীভূত রসও উপরোক্ত রোগ সমূহে উপকারী এবং ইহা শিশি বোতলে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিলে, বহু দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে।

এই গাছের কলম করিতে হয়, বীজেও চারা হয়। ইহার কলম পদ্ধতি ও চাষ প্রণালী পাতি ও কাগজীর মতই। ইহা দ্বারা উত্তম দৃঢ় বেড়া প্রস্তুত হয়। বাজারে সাধারণের ভিতরে ইহার চাহিদা একটু কম। তবে ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যক্তি বিশেষের নিকট ইহার চাহিদা আছে।

কমলা লেবু। (Orange)

কমলা লেবু অতি উচ্চস্তরের ফল। শ্রেষ্ঠতা হিসাবে যে ফলগুলিকে আমরা দেবভোগ্য বলিয়া মনে করি, কমলা লেবু তন্মধ্যে অন্যতম। ইহার ভিতর বাহির উভয়ই চিত্তাকর্ষক।

ভারতের স্থান বিশেষে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাঙ্গালা দেশেও ইহার গাছ জন্মে সত্য, কিন্তু ফল সেরূপ উপভোগ্য হয় না। বাঙ্গালার মৃত্তিকাই যে শুধু এ জন্য দায়ী, তাহা নহে, স্থানীয় জলবায়ুও কমলা চাষের প্রতিকূল। তবে উপযুক্ত সার প্রয়োগে এবং বিশেষ যত্নে, এ দেশেও উৎকৃষ্ট ফল জন্মিতে পারে। কিন্তু আসাম অঞ্চলের ফল যেমন রসাল ও সুমিষ্ট হয়, এগুলি তেমন হয় না। দার্জ্জিলিং, নাগপুর, সাহারাণপুর ও মহীশূরেও উৎকৃষ্ট কমলা জন্মে বটে, কিন্তু তুলনায় শ্রীহট্টের লেবুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বীজ হইতেও কমলার চারা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাহা ফলিতে বিলম্ব হয় বলিয়া কলমেই চারা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। গুল কলমে ইহার চারা তৈয়ারী হয়। বর্ষাকাল এই কলম প্রস্তুতের উত্তম সময়। কলম প্রস্তুত হইলে, কিছু দিন হাপোরে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হয়। শেষে আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে স্থায়িভাবে জমিতে রোপণ করিতে হয়।

যে স্থানে বৎসরে শতাধিক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সেই স্থানের আবহাওয়া সাধারণতঃ আর্দ্র প্রকৃতির হইয়া থাকে। ইহাকে সাধারণ কথায় আমরা সর্দ্দিময় আবহাওয়া বলি। এইরূপ সর্দ্দিময় জলবায়ুতে কমলা ভাল জন্মে। কমলা লেবুর জমি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। নিম্ন ভূমিতে ইহা ভাল জন্মে না। যে জমির মৃত্তিকায় পটাস্, চূণ এবং কঙ্কর আছে, সেই জমিই কমলা চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দার্জ্জিলিং জেলায় জমির প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয় বারিপাতের ফলে অনুকূল আবহাওয়ায় কমলা বেশ জন্মে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত শীতের জন্য ফলের স্বাদ তত উৎকৃষ্ট হয় না। নাগপুর অঞ্চলের জমি উহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও, বারিপাতের ন্যূনতা হেতু ফল ততটা রসাল ও মধুর হয় না। কিন্তু আসাম অঞ্চলের জলবায়ু, মৃত্তিকা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমস্তই কমলার পক্ষে বিশেষ অনুকূল থাকায়, ঐ স্থানের লেবু তুলনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এ দেশে শত চেষ্টা ও যত্নে যে ফল লাভ হয় না, আসামে বিনা যত্নেই তদপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। এ দেশে যে সব লেবু সহজে জন্মে যেমন পাতি, কাগজী, সরবতী ইত্যাদি, ইহাদের সঙ্গে উৎকৃষ্ট কমলা লেবুর জোড় বাঁধিয়া কলম প্রস্তুত করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের জলবায়ুতে পাতি, কাগজী, সরবতী, বাতাবী প্রভৃতি বেশ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং উহাদের প্রকৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণে কমলার প্রকৃতির

পরিবর্ত্তন ঘটিয়া, এ দেশীয় জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপযোগী হইতে পারে।

যাহা হউক, জমি নির্ব্বাচিত হইলে জমিটীকে বেশ গভীর ভাবে চাষ দিয়া অস্থিচূর্ণ ও গোবর সার ও চূণ বা চূণের পাথর মিশ্রিত করিয়া দিবেন। তারপর ৭।৮ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিবেন। প্রত্যেকটী গর্ত্ত যেন এক হাত গভীর হয়। ঐ গর্ত্তে একটী করিয়া চারা বসাইয়া যাইবেন। বঙ্গদেশে ৩ হাত গভীর গর্ত্ত করিতে হয়। ঐ গর্ত্তের নিম্নদিক হইতে ⅓ চূণের পাথর, ⅓ মাটি এবং অবশিষ্ট অংশ সমপরিমাণে গোবর সার ও মাটি মিশ্রিত করিয়া ভরিয়া দিতে হইবে। তারপর উপরিভাগে সামান্য কিছু চুণের পাথর বা গুঁড়া চুণ ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে ফলগুলি সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ না করিলে ফলের কোয়াগুলি সাদা হয়।

আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ হইতেই গাছের পাট আরম্ভ করা উচিত। এই সময় গাছের গোড়া খুঁড়িয়া, শিকড়গুলিকে অন্ততঃ দুই সপ্তাহকাল মুক্ত আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে রাখিয়া দিবেন। তারপর ভেড়ীর নাদি সার, অস্থিচূর্ণ সার, মানবের মলমূত্র, পচা গোবর সার এবং চূণ বা চূণের পাথর প্রভৃতি সহ নূতন মাটি মিশ্রিত করিয়া গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। শ্রীহট্ট ও আসাম অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই কমলা পাকিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে প্রচুর কমলা বঙ্গদেশে চালান আসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রথম অবস্থার এই লেবুগুলি

তাদৃশ সুপক্ক হইতে না হইতেই চালান হইয়া আসে বলিয়া, বিশেষ মিষ্ট ও রসাল হয় না। ক্রমেই উৎকৃষ্টতর লেবু আসাম হইতে বাঙ্গালায় আসে। মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই লেবু প্রচুর পরিমাণে আসিতে থাকে। এই লেবুর খোসা পাতলা, কোয়াগুলি বেশ মিষ্ট ও রসাল। ইহার স্বাভাবিক ঘ্রাণও অতি চমৎকার। ইহা বছরে ২ বার ফলে।

পৌষ মাস হইতে দার্জ্জিলিংএর লেবু আমদানী হয়। নাগপুরী লেবুর আমদানীকাল চৈত্র মাস। দার্জ্জিলিং বা নাগপুরী লেবু আকারে বেশ বড় হয় বটে কিন্তু উহাদের খোসা পুরু এবং তুলনায় ফলগুলি একটু নীরস ও মিষ্টত্ব হীন।

ইহা ছাড়া মহীশূর, সাহারাণপুর প্রভৃতি স্থানেও বিস্তর কমলা লেবু জন্মিয়া থাকে। শ্রাবণ মাস হইতে মহীশূরের লেবু এবং ফাল্গুন মাস হইতে সাহারাণপুরের লেবু পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের লেবু অপেক্ষা সাহারাণপুরের লেবু আকারে বড় এবং স্বাদ ভাল। মহীশূরে অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত "নেভাল অরেঞ্জ" নামক কমলার চাষ হইতেছে। এই লেবু অতি উৎকৃষ্ট। স্বাদে এবং আকারে অতি চমৎকার।

নাগপুরে 'সান্তারা' নামক এক প্রকার লেবুর চাষ হয়, এগুলি বৎসরে দুই বার ফলে। সাহারাণপুরের লেবুও 'সান্তারা' নামে পরিচিত।

ব্যবসায় হিসাবে কমলা লেবুর চাষ খুবই লাভজনক সন্দেহ নাই। তবে যে স্থানে ইহা স্বভাবতঃ জন্মে না, সেই

স্থানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া বিশেষ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। এই জন্য ইহার অনুকুল স্থান নির্ব্বাচন করিয়া চাষ করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কমলা লেবু খাঁটী দুগ্ধের মতই বলকারক। ইহা একাধারে রোগীর পথ্য এবং ভোগীর ভোজ্য।

কামকোয়াট লেবু।

ইহা কমলা লেবু জাতীয় ফল। চীন দেশ ইহার জন্ম-স্থান। তথা হইতে ক্রমে এ দেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। ফলগুলি খুব ছোট হয়। একটী বড় রকমের সুপারী অপেক্ষা ইহা আকারে বড় হয় না। এগুলির স্বাদ অত্যন্ত টক্, কাজেই এ লেবুর সাধারণ ব্যবহার বিশেষ নাই। এগুলি পাকিলে অতি সুন্দর দেখায়। গাছগুলি তখন লাল হলদে বর্ণের বিচিত্র সমাবেশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। এই গাছ টবেও অপর্য্যাপ্ত ফল দেয়। টবের গাছগুলি ২।৩ ফিটের বেশী উচ্চ হয় না কিন্তু মাটিতে বসাইলে ৭।৮ ফিট উচ্চ হয়। টবে গাছগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখা যায়।

ইহার চাষ প্রণালী পাতি লেবুর মত। কমলা লেবুর সঙ্গে ইহার জোড় বা গুল কলম বাঁধিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

এই ফলের সাধারণ ব্যবহার না থাকিলেও, ইহা দ্বারা জারক্ লেবু, চাটনী, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

গোঁড়া লেবু (চীনের)—এই গুলি গোঁড়া লেবু জাতীয়

ফল বিশেষ। তবে ফলের আকার গোঁড়া লেবু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। গোঁড়া লেবুর মত ইহার ছাল অত পুরু নহে, অপেক্ষাকৃত পাতলা। চাষ প্রণালী গোঁড়া লেবুর মত।

টাবা—ইহার চাষ প্রণালী পাতি লেবুর মত। ফলগুলি খুব বড় হইয়া থাকে। পাতি লেবুর মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্যান্য লেবুর উপরকার আবরণ যেমন গাঢ় সবুজ ইহার আবরণ তেমনি কৃষ্ণ-বর্ণাভ হয়।

এলাচী—এই ফলগুলির ঘ্রাণ এলাচির মত। এই ফল দুই রকমের হইয়া থাকে। ১ নং এলাচী লেবুর ফল পাতি লেবুর মত বড় হয়। কিন্তু ২ নং এলাচীর ফল ছোট এলাচীর মত; তবে ঘ্রাণ উভয়েরই এলাচীর মত।

সরবতী—ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু। ইহার রস সরবতের মত স্নিগ্ধ-শীতল। ফলগুলির আকার ছোট কমলা লেবুর মত। পাকিলে রং হলদে হয়। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই ইহা ব্যবহার করা চলে।

কলম্বো—এই লেবুর, এমন কি পাতারও ঘ্রাণ অতি চমৎকার ও পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহার ফল এক একটী ⁄।০ পোয়া ⁄।৶০ পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহার কাগজী লেবুর মত।

সপেটা। (Sapota)

অতিরিক্ত মিষ্টতা ছাড়া এই ফলের আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা এত মিষ্ট যে, অধিক খাওয়া যায় না। কোন-রূপ সুঘ্রাণ এ ফলে নাই।

ইহা ভারতীয় ফল নহে। আমেরিকা ইহার উৎপত্তি স্থান। বর্ত্তমানে জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে ইহা এখনও বহুল প্রচার লাভ করে নাই। সহর অঞ্চলে, সৌখীনের বাগানে এই গাছ ২।৪টী দেখা যায়। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে ইহার বিস্তৃত চাষ, এ দেশে এখনও হয় নাই বলিলেই চলে। ইউরোপীয় এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত সাধারণের ভিতরে ইহার যথেষ্ট আদর আছে। কাজেই উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ইহার চাষ করিলেও লাভবান হওয়া যায়। বাজারে প্রচুর চালান দিতে পারিলে, ধনী দরিদ্র সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। ইহার প্রচলন কম আছে বলিয়াই, শুধু ধনী সম্প্রদায়ের ভিতরে ইহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

সপেটার গাছ খুব বড় হয়। এই জন্য এগুলিকে ২০ হাত হইতে ২৫ হাত অন্তর বসাইতে হয়। ইহার পাতাগুলি বেশ সুন্দর।

বীজ ও কলম উভয় প্রকারেই ইহার চারা প্রস্তুত হইতে

পারে। ক্ষীরণী বা মহুয়ার চারার সহিত এই গাছের জোড় কলম বাঁধিলে উত্তম হয়। বর্ষাকালই এই গাছের চারা প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট সময়। এই গাছ সকল রকম মাটিতে জন্মি-লেও দোআঁশ মাটিই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

আকারে সপেটা ফল এক একটী বড় গোল আলুর মত হইয়া থাকে। কাঁচা অবস্থায় ইহার উপরকার আবরণটী মসৃণ থাকে কিন্তু পাকিলে একটু খস্‌খসে হয়। ইহা বেশ সুপক্ক না হইলে খাইবার উপযুক্ত হয় না। সপেটার সাধারণ আকৃতি গোল আলুর মত হইলেও, বারমেসে ফলগুলি হংস-ডিম্বের মত আকার বিশিষ্ট হয়।

স্যাও বা আপেল (Apple)

অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলই এই ফলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাংলার মৃত্তিকা ও জলবায়ু, আপেল চাষের আদৌ উপমুক্ত নহে। ভারতের হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গা-লোর, খসিয়া পাহাড়, নীলগিরির পার্ব্বত্য অঞ্চল, কাশ্মীর, সিমলা, মূসৌরী প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্মে। এই সব স্থানের সর্ব্বত্র উত্তম ফল উৎপন্ন না হইলেও, স্থান বিশেষে অতি উৎকৃষ্ট আপেল জন্মিয়া থাকে এবং ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতিয় ফল স্বাদে, গন্ধে বিলাতী আপেলের সমকক্ষ হইয়া থাকে।

বীজ হইতে এবং কলমে উভয় প্রকারেই ইহার চারা প্রস্তুত করা যায়। তবে কলমের ফল সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বলিয়া, কলম হইতেই ইহার চারা প্রস্তুত করা উচিত। গুল ও দাবা কলমে ইহার চারা তৈয়ারী হয়।

উচ্চ দোআঁশ জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত। জমিতে কোন স্থানে যেন জল দাঁড়াইতে না পারে, কোন স্থানে যেন আগাছা ইত্যাদি না জন্মে তাহা লক্ষ্য রাখিবেন। এই গাছ প্রায় ১৫।১৬ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। জমিতে ১২ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া, প্রতি গর্ত্তে ভেড়ীর নাদি সার ও নূতন মাটি প্রয়োগ করিয়া রাখিবেন। আষাঢ় মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে ঐ গর্ত্তে চারা বসাইবেন। চারা স্থায়িভাবে বসাইবার ১ মাস কাল পূর্ব্ব হইতে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবেন।

সাধারণতঃ ৪।৫ বৎসরে ইহা ফলিতে আরম্ভ করে। ফলন্ত আপেল গাছ দেখিতে অতি চমৎকার। শীতের প্রথম হইতেই এই গাছ মুকুলিত হইতে থাকে। গাছে ফুল আসিবার একমাস পূর্ব্ব হইতে, গাছের পাট পরিচর্য্যা শেষ করিয়া রাখিতে হয় এবং ফলন শেষ হইলে ছাঁটাই কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

উপযুক্ত স্থানে জমি নির্ব্বাচন করিয়া, বিশেষ ধীরতার সহিত চাষ করিতে পারিলে, ইহা দ্বারা বেশ লাভবান হওয়া যায়।

সুপারী। (Betel-nut)

সুপারী বাংলার একটী বিশেষ আয়কর চাষ। বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি দেশে ইহার প্রচুর চাষ হয়। লবণাক্ত জলীয় আবহাওয়া ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই জন্য নিম্নবঙ্গে, নারিকেলের মত, সুপারীও প্রভূত পরিমাণে জন্মে।

ইহার কলম হয় না। সুপক্ক ফলই বীজ এবং এই বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিয়া, বীজ পাত দিয়া রাখিতে হয়। ইতিমধ্যে নির্ব্বাচিত জমিটি বেশ উত্তমরূপে চাষ দিয়া, সার প্রয়োগ করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবেন। পাঁকমাটি ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। কাঁটা মাদারের পাতা পচাইয়া, সারে পরিণত করতঃ, এই জমিতে প্রয়োগ করিলে, গাছগুলি খুব তেজাল হয়, ফলন শীঘ্র হয় এবং ফলগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাতা-সার সুপারী গাছের পক্ষে একটী বিশিষ্ট সার।

এই গাছ খুব দীর্ঘ, সরু ও সরল হইয়া থাকে। এই জন্য ঝড়ে এগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কাজেই গাছগুলিকে একটু ঘন করিয়া বসান দরকার। ২।৩ হাত ব্যবধানে বসাইলেই চলিতে পারে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছগুলি প্রবল ঝড়ের বেগ হইতে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

এই গাছ সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসরেই ফল প্রসব করে।

কার্ত্তিক মাস হইতেই এই ফল পাকিতে থাকে। ফলগুলি উত্তমরূপে পাকিলে পর সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ব ফল সংগ্রহ করিলে, সেগুলি বিশেষ কোন কাজে লাগে না। কোন কোন ব্যবসায়ী ঐ ফলগুলি উত্তমরূপে মাড়াইয়া, কস্ নিংড়াইয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চালান দিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপ করা সম্ভব নয়। তারপর, এই সুপারী খাইতেও প্রীতিকর নহে।

গাছের ফল নিঃশেষ হইয়া গেলে, গাছগুলির মাথা ভাল-রূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। পুরাতন মোচা, ছড়া, শাখা ইত্যাদি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া না দিলে, ফলন কমিতে থাকিবে। গাছের গোড়ায় কোন আগাছা জন্মিতে দিবেন না। লক্ষ্য রাখিবেন, মাটিতে যেন উই পোকা বাসা করিতে না পারে, গাছের কাণ্ডে কাঠঠোকরা পাখী ছিদ্র করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিতে না পারে। এই গাছ সহজে জন্মে সত্য, কিন্তু উত্তম ফল পাইতে হইলে, প্রতি বৎসর নিয়মিত পাট পরিচর্য্যা করা দরকার। অন্যথায়, ফলন ক্রমেই হ্রাস পাইবে।

সুপারী গাছের কাণ্ড হইতে গৃহ প্রস্তুতের নানারূপ উপা-দান পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার কাণ্ড দ্বারা উৎকৃষ্ট ডোঙ্গা-নৌকা প্রস্তুত হয়। শুক্‌না সুপারীর খোলা দ্বারা নারিকেলের দড়ির মত একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সুপারীর চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

বিবিধ তত্ত্ব

পাইট ও যো।

প্রথমে কোন অনাবাদী নূতন জমি, উদ্যানের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া, নূতন উদ্যানকগণ বিব্রত হইয়া পড়েন। তাঁহারা সহজ জ্ঞান হইতে যেটুকু বুঝিতে পারেন, তদনুযায়ী জমিখানিকে লাঙ্গল দিয়া বা কোদাল দিয়া কোপাইয়া, আগাছা ইত্যাদি মোটামুটী রকমে বাছিয়া ফেলিয়া, গাছ বসাইতে আরম্ভ করেন। নূতন জমিতে কি ভাবে 'পাইট' দিলে উত্তম হইবে, তাহা তাঁহারা ঠিক জানেন না বলিয়া এই অধ্যায়ে তাহা মোটামুটী বর্ণিত হইল।

কৃষিকার্য্যের সাফল্য প্রথমতঃ নির্ভর করে জমির 'পাইটে'র উপর। জমির 'যো' লক্ষ্য করিয়া প্রয়োজনীয় পাটের বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, কৃষি বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়া উঠে না।

মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আলোক ও উত্তাপ এই পাঁচটী জিনিষের উপর উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। ঐ পাঁচটী জিনিষে অম্লজান্, অঙ্গারাম্ল, যবক্ষারজান, এমোনিয়া, উদ্জান্, পোটাসিয়াম, ফস্ফরাস্, অম্ল ও চুণ ইত্যাদি উদ্ভিদ-দেহ পোষণোপযোগী পদার্থ নিহিত থাকে। মৃত্তিকা, জল, বায়ু,

আলোক ও উত্তাপের সহায়তায়, উক্ত পদার্থগুলি উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করিয়া, উদ্ভিদ-জীবনকে কার্য্যকর করিয়া তোলে। কিন্তু উক্ত পদার্থগুলি সব সময়ে উদ্ভিদের দেহ পোষণোপ-যোগী অবস্থায় থাকে না। উহাদিগকে পোষণোপযোগী ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে বিশেষ প্রক্রিয়ার আবশ্যক। এই প্রক্রিয়াকে 'পাইট' বলে।

'যো' কাহাকে বলে তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। যে সময় জমি সরস থাকে কিন্তু চাষ দিলে লাঙ্গলফলকে অথবা খননকালে কোদালে মৃত্তিকা জড়াইয়া না যায়—মৃত্তিকার এইরূপ অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে জমির 'যো' হইয়াছে। 'যো'এর সঙ্গে পাইটের এবং পাইটের সঙ্গে উদ্ভিদ-জীবনের সফলতার নিকট সম্পর্ক। কাজেই 'যো' বুঝিয়া জমির 'পাইট' করিতে পারিলে চাষে সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের দেশে পর্য্যায়ক্রমে ষড় ঋতুর আবির্ভাব হইলেও শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপই বেশী। ফাল্গুণের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষা এবং আশ্বিন হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত শীত। ইহার মধ্যে বর্ষা ও শীতের সন্ধি সময়ে এ দেশের জমিতে যো হয়। ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টির জলে জমি অত্যন্ত সরস থাকে,—তারপর শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, জমির রসভাগ ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে কার্ত্তিক মাসে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে,

তাহাই জমি পাইট করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই জন্য কার্ত্তিক মাসে অর্থাৎ হেমন্ত কালেই জমি পাইট করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে অতিরিক্ত বর্ষাপাতের ফলে, জমির উপরিস্থিত অনেক আগাছা পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মৃত্তিকাভ্যন্তরে সারবান উদ্ভিদ খাদ্যের উপাদান সৃষ্টি করিয়া রাখে। কিন্তু বাহিরের মুক্ত আলো, বাতাস ও রৌদ্রের সংস্পর্শ না পাইলে, তাহা উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে। এই জন্য, এই সময় জমিটী গভীররূপে চাষ দিয়া মৃত্তিকা ওলট পালট করিয়া দিলে, অন্তরস্থিত রুদ্ধ খাদ্যপ্রাণগুলি সতেজ হইয়া ওঠে এবং ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া তোলে। এইরূপ ভাবে দুই চার বার চাষ দিয়া, সমস্ত শীত-কাল জমিটিকে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। শীতের শিশিরে মৃত্তিকায় নূতন শক্তি সঞ্চার হইবে। শীত অন্তে দু এক পশলা বৃষ্টি হইবার পর, জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া, গাছ বসাইবার উপযোগী ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ইতিমধ্যে চারা বা কলম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবেন। যে গাছ বসাইবার যে নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া আছে, তদনুযায়ী জমিতে চারা বসাইয়া যাইবেন।

এইরূপ 'যো' বুঝিয়া 'পাইটে'র ফলে পঞ্চভূতাশ্রিত পদার্থ-গুলি, উদ্ভিদ-দেহের পরিপোষণোপযোগী হইয়া থাকে।

জল সেচন প্রণালী।

জল জীবজগতের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদ্ভিদের পক্ষে জল যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা জানি গাছের গোড়ায় জল দিলে মাটি সরস থাকে, উদ্ভিদের পক্ষে রস আহরণে সুবিধা হয়; জল না দিলে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু এই জল সেচনেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। শুধু মামুলী জ্ঞান লইয়া জল সেচন করার ফলে, অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। আমাদের পিপাসা পাইলে আমরা জল খাই,—জল আমাদের শোণিতপ্রবাহ অব্যাহত রাখে, কিন্তু এই জলই যদি অনাবশ্যক ভাবে অধিক পরিমাণে খাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জল জীর্ণ হইতে না পারিয়া পেটের পীড়া সৃষ্টি করে—দেহে নানারূপ ব্যাধি আনয়ন করে। গাছের পক্ষেও সেইরূপ। গাছের পক্ষেও এই জল গ্রহণের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা দুইই আছে এবং সেচন-রীতিরও বৈশিষ্ট্য আছে। জল সেচন করিতে গিয়া প্রথমেই দেখিতে হইবে মাটির অবস্থা কিরূপ। মৃত্তিকাগর্ভে যে সমস্ত খাদ্যপ্রাণ থাকে, জল সেগুলিকে দ্রব করিয়া, মূলের পক্ষে আহরণের সুবিধা করিয়া দেয়। এই জলীয় ভাগের ন্যূনতা ঘটিলে মাটি নীরস কঠিন হইয়া পড়ে। আবার আবশ্যকের

অতিরিক্ত জল গোড়ায় সঞ্চিত হইলে, মূল অতিরিক্ত রসস্থ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় পচিয়া যায়। এই জন্যই জমির রসভাব লক্ষ্য করিয়া জল সেচন করিতে হইবে।

উদ্ভিদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড়গুলিই মূল শিকড়ে খাদ্য যোগাইয়া দেয়। ঐ সূক্ষ্ম শিকড়গুলি গাছের গোড়ায় থাকে না। উহারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই জন্য গাছের চতুর্দ্দিকে জল সেচন করিতে হয়। অবশ্য গোড়াতেও যে জল দিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া জল সেচনের ফলে, দূরস্থ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অধিক খাদ্য আহরিত হইয়া, উদ্ভিদকে অধিক পুষ্ট করিতে পারে।

স্থানান্তরিত শিশু উদ্ভিদের জল অধিক প্রয়োজন। তাহার কারণ, তাহারা আপনাদের নূতন কোমল মূল দ্বারা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ কোন খাদ্যকেই নিজ শরীর পোষণযোগ্য করিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। মানব শিশু যেমন প্রথম অবস্থায় একমাত্র দুগ্ধের উপরই নির্ভর করে, উদ্ভিদ শিশুও তদ্রূপ প্রথম অবস্থায় শুধু জলের উপর নির্ভর করে, ক্রমে অপেক্ষাকৃত সবল হইয়া সে স্বাধীনভাবে মাটির রস টানিয়া লইতে সক্ষম হয়। শিশু উদ্ভিদের প্রয়োজনও খুবই কম—কাজেই তদনুযায়ী বিবেচনা করিয়া নিয়মিতভাবে জল দান করিতে হইবে।

শীত ও গ্রীষ্মকালে জমির অবস্থানুযায়ী জল দানের বিশেষ

বন্দোবস্ত রাখা দরকার। শীতকালে আবহাওয়ার স্বাভাবিক আকর্ষণে সর্ব্বত্রই একটা সঙ্কোচন ভাব লক্ষিত হয়। এই সঙ্কোচন ভাবকে আয়ত্তাধীনে রাখিয়া, উদ্ভিদকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, নিয়মিত জলদান আবশ্যক। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে সমস্তই শুষ্ক হইয়া যাইতে চায়। জলীয় পদার্থ মাত্রেই —উত্তাপে বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতে থাকে। এই জন্য এ সময়ে নিয়মিত জলদান আবশ্যক। যে পরিমাণ জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়—ক্ষয়পূরণের নিমিত্ত তদনুযায়ী জল তাহার দেহে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম হইলে, গাছ অনেক সময় শুকাইয়া মরিয়া যায়।

আমাদের দেহে যেরূপ অসংখ্য লোমকূপ আছে, গাছের পাতার ত্বকে সেইরূপ অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র পথে সূর্য্যকিরণ ও বাতাস পরিচালিত হইয়া, উদ্ভিদ দেহের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। এই জন্য শুধু গাছের গোড়ায় জল না দিয়া, গাছের সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পাতায় জল ছিটাইয়া দেওয়া উচিত। ধূলা বালিতে ঐ ছিদ্রপথগুলি অনেক সময় বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে উদ্ভিদের জীবনীশক্তির ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য গাছগুলিকে মাঝে মাঝে স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে ছিদ্র পথগুলি ধুলি-মুক্ত হইতে পারে। পিচকারীর সাহায্যে স্নান করানই উত্তম। এই স্নানের ফলে উদ্ভিদ বেশ স্নিগ্ধ হয়—এবং আমাদের মত তাহারাও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জীবন-

গতির সহজ স্বচ্ছন্দভাব স্বাস্থ্যের পরিপোষক। ইহাতে গাছ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়।

জল দিতে হইবে বলিয়া,—যখন তখন দেওয়া উচিত নয়। প্রাতঃকাল এবং অপরাহ্নকাল, জল সেচনের উপযুক্ত সময়। ইহার মধ্যে আবার অপরাহ্নকালই প্রশস্ত। জল দিবার পূর্ব্বে,—গোড়ার মাটি একটু উস্‌কাইয়া দিলে ভাল হয়।

কর্ষণ বা খননের প্রয়োজনীয়তা।

বৃক্ষ রোপণকালে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু মাত্র বুঝি যে, নবরোপিত চারাটী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র মৃত্তিকা গর্ভে শিকড় বিস্তার করিয়া দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে এবং সহজে ভূমি হইতে খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম হয়, তজ্জন্য ভূমি কর্ষণ বা খননের প্রয়োজন। কোন উদ্ভিদকেই, মৃত্তিকা খনন না করিয়া বসান যায় না। এই কর্ষণ বা খননের মূলে প্রকৃতির যে গূঢ় মঙ্গলময় রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্যানকমাত্রেরই অল্প বিস্তর জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ভূমির অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তিকে পূর্ণ জাগরিত করিয়া, আপন প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকুলে আনয়ন করাই ভূকর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। আকাশে বিদ্যুতের যে অসীম শক্তিপ্রবাহ নিয়ত সঞ্চরমান রহিয়াছে, সেই শক্তিকেই—বিজ্ঞান বলে আয়ত্ত করিয়া মানব আজ কতই না দুরূহ কার্য্য সম্পাদন

করাইয়া লইতেছে। এই বিদ্যুৎ প্রবাহকে করায়ত্ব করিবার জন্য, কত নূতন আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সাধারণ লোকে সেই বিদ্যুৎ সরবরাহকারী অভিনব যন্ত্রাদি দেখিয়া শুধু মনে করিবে যে, ইহারই সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে মাত্র, কিন্তু কেন এবং কি ভাবে যে এরূপ হইতেছে তাহা একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যতীত অপর কেহ বুঝিতে পারে না। ভূকর্ষণের মূলেও ঐ একই প্রশ্ন রহিয়াছে। ভূকর্ষণের সঙ্গে উদ্ভিদের কি সম্পর্ক,—কর্ষণের তারতম্যে উদ্ভিদ বিশেষের জাতীয় জীবনে কি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কেন ঘটে তাহার সন্ধান সাধারণে রাখে না, কিন্তু উদ্যানক বা কৃষকের অন্ততঃ মোটামুটীভাবে তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমার বুদ্ধিবৃত্তির নির্দ্দেশে যে কার্য্য পরিচালিত হইবে, সেই কার্য্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটী ব্যাপারে যদি আমি নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারি, তবে সহজে তাহা হইতে যতটা ফল পাইবার আশা করিতে পারিব, অন্ধের মত অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গেলে, অতি আয়াসেও ততদূর সুফল লাভের আশা করা যাইবে না। বিশেষতঃ নিজের পরিস্ফুট মার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায়, অনেক ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু নূতনের আবিষ্কার ঘটিয়া থাকে, যদ্দারা শুধু নিজেই নয়, অপর দশজনেও উপকৃত হইতে পারে। এই জন্য যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, সেই কার্য্যের প্রত্যেকটী বিষয়ে নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জল, বায়ু, উত্তাপ, আলোক ও মৃত্তিকার সঙ্গে উদ্ভিদজীবন ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, কিন্তু এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে মৃত্তিকাই শ্রেষ্ঠ। মৃত্তিকাই বীজাধার,—মৃত্তিকা উদ্ভিদ জীবনের অপরিহার্য্য অবলম্বন। অপরাপর পদার্থের প্রয়োজনীয়তা প্রধানতঃ এই মৃত্তিকার ভিতর দিয়াই উদ্ভিদজীবনে কার্য্যকর হইয়া উঠে। কিন্তু এই পদার্থগুলিকে কার্য্যকর করিবার জন্য, মৃত্তিকা পর্য্যাপ্ত শক্তি পায় কর্ষণ ও খনন হইতে।

মৃত্তিকা-গর্ভ বিভিন্ন পরমাণুতে, বিভিন্ন স্তরের সমাবেশে গঠিত। এই পরমাণুরাজির ভিতরেই মৃত্তিকার শক্তি লুক্কায়িত থাকে। বাহিরের আলো, বাতাস, জল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ঐ শক্তি জাগ্রত হয়। সেই জাগ্রত শক্তিরই কর্ম্মফল—উদ্ভিদ-প্রাণ।

বিভিন্ন স্তরের এই পরমাণুগুলিকে বাহিরের আলো বাতাস ও উত্তাপের সংস্পর্শে আনিবার জন্যই ভূমি কর্ষণের আবশ্যক। ভূমি কর্ষিত হইলে, কঠিন স্তরগুলি চূর্ণ হইবে, পরস্পর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইবে—নিম্নস্তর উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে—তখন ঐ চুর্ণিকৃত সচ্ছিদ্র স্তরগুলি মুক্ত আলো ও বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকিবে। বায়ু মধ্যস্থ অম্লজান, উদ্‌জান, এমোনিয়া, যবক্ষারজান প্রভৃতি উদ্ভিদ পোষণোপযোগী পদার্থগুলি ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকা দ্বারা আকর্ষিত হইবে। মৃত্তিকার এই স্বাভাবিক আকর্ষণে মুক্ত আলোক হইতেও বিবিধ পদার্থ

ভূগর্ভে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এই সংমিশ্রণের ফলে মৃত্তিকা-গর্ভে যে মহাশক্তির সৃষ্টি হয়, সেই শক্তিই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি। এই শক্তির অভাবেই ভূমি ঊষরমরুতে পরিণত হয়। এই জন্যই মাটি বার বার ওলট পালট করিয়া আলো বাতাসের সংস্পর্শে আনা কর্ত্তব্য। গাছের গোড়া মাঝে মাঝে কোপাইয়া বা নিড়াইয়া দিবার যে প্রথা আছে, তাহার মূলেও ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। মাটি শুষ্ক হইলে বাহির হইতে বায়বীয় পদার্থ সমূহ আকৃষ্ট হয়। মাটি চূর্ণ ও শিথিল হইলে ভূগর্ভের নিম্নস্তরস্থ রস সমূহ কৈশিক আকর্ষণ প্রবাহে ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইয়া, সূক্ষ্ম মূলের অগ্রভাগের মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়া দেয়।

বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া, উদ্ভিদের ক্রম-বর্দ্ধমান প্রকৃতি তাপের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। মৃত্তিকা চূর্ণিকৃত না হইলে মৃত্তিকা-গর্ভে পর্য্যাপ্ত তাপ সঞ্চয় হইতে পারে না। বায়ুই ঐ চূর্ণিকৃত মৃত্তিকার ভিতরে তাপকে সঞ্চালিত করিয়া দেয় এবং মৃত্তিকা ঐ তাপ নিজ গর্ভে সযত্নে রক্ষা করিয়া বীজের অঙ্কুরোৎপাদন করায় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিপোষণে সাহায্য করে। এই জন্য স্যাঁতসেঁতে (damp) জমিতে বীজ ফোটে না—উদ্ভিদ বাঁচে না। এই জমিতে তাপ সঞ্চিত হইতে পারে না। মৃত্তিকাগর্ভে একটা স্বাভাবিক তাপ আছে বটে কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কোন কৃষিকর্ম্ম করিবার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। বনজ ফল ফুল

এবং উদ্যানজ ফল ফুলের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার মূলেও ভূমি কর্ষণের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। মৃত্তিকা-গর্ভে নানাবিধ কীট বাস করে। উহাদিগকে দূরীভূত করিতে না পারিলে উহাদের আক্রমণে উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বার বার গভীররূপে কর্ষণ ও খননের ফলে উহাদের আবাস ধ্বংস হয় এবং কীটগুলি বাধ্য হইয়া উপরে উঠিয়া আসে। তখন রৌদ্রে কতক মারা যায়, কতকগুলি বা পক্ষিকুলের উদরসাৎ হয়। *

এই সমস্ত নানা কারণে বার বার ভূমি কর্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

উদ্যানের শত্রু।

উদ্যানের শত্রু অনেক প্রকার। বিভিন্ন শত্রুর আক্রমণ প্রণালী যেরূপ বিভিন্ন, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের উপায়ও সেইরূপ বিবিধ। উদ্যানক যদি প্রথম হইতে এই সব বিষয়ে অবহিত না হন, তবে পরিণামে উদ্যানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। সেই জন্য এ বিষয়ে মোটামুটী বিশদ বিবরণ দেওয়া গেল।

* মৎপ্রণীত 'সজীব কথার' পরিশিষ্ট অধ্যায় দেখুন

কীট পতঙ্গ।

এই জাতীয় শত্রুর আক্রমণ প্রায়শঃই জলবায়ু ও ভূমির উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া ফসল বিশেষেও কীট পতঙ্গ বিশেষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে জমি হইলে বা জমিতে আবর্জ্জনাদি পচিলে নানারূপ কীট পতঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিদ-খাদ্য না থাকিলে, গাছ স্বভাবতঃই রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং দূষিত খাদ্য আহরণে বৃক্ষ দেহে আপনা হইতেই নানারূপ কীট জন্মিয়া থাকে। জমির উৎকর্ষতা সাধনই এইরূপ কীট নিবারণের উপায়। জমির উৎকর্ষতা সাধন নির্ভর করে ভূমিকর্ষণ এবং সার প্রয়োগের উপর। তবে বাহির হইতে যে সমস্ত কীট পতঙ্গ আসিয়া উৎপাতের সৃষ্টি করে, তাহা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

১। উই পোকা, পিঁপড়া প্রভৃতিও গাছের প্রবল শত্রু। ইহাদের গর্ত্তে ফিনাইল ঢালিয়া দিলে ইহারা নিবারিত হয়। গাছের উপরে যদি পিঁপড়া বাসা নির্ম্মাণ করে তবে, বাসাগুলি ভাঙ্গিয়া আগুণে পোড়াইতে হয়। কোন মিষ্টি দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া গাছের উপরে এবং নীচে ছড়াইয়া রাখিলে, উহা খাইয়া পিঁপড়া মরিয়া যায়।

২। /।০ পোয়া পরিমাণ ক্রুড অয়েল ইমালসন বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া, ২০।২৫ সের জলের সঙ্গে মিশ্রিত

করিয়া, পিচকারীযোগে গাছের পাতায় এবং গায়ে ছিটাইয়া দিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি বিনষ্ট হয়। এই ইমালসন জলের সঙ্গে এরূপভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে যেন জলের বর্ণ সম্পূর্ণ সাদা হইয়া যায়।

৩। একটী পাত্রে /৸০ পোয়া পরিমাণ তুঁতে, ২০ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিবেন। এ দিকে ১০ সের পরিমাণে কাপড় কাচা সোডা ২০ সের জলের সহিত ভালরূপে ফুটাইয়া লইবেন। তারপর উভয় মিশ্রণ একত্র করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইবেন। শেষে পিচকারীযোগে গাছের গায়ে ছিটাইয়া দিবেন। ইহাতে নানারূপ কীট পতঙ্গ বিনষ্ট হইবে।

৪। ১/ মণ জলে /৪ সের তামাক পাতা দুই তিন দিন ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ভালরূপে অগ্নিজ্বালে সিদ্ধ করিয়া /১ সের সাবান মিশাইবেন। ঐ সাবান কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিবেন। তারপর ঐ জল আবার বেশ করিয়া ফুটাইয়া লইবেন। শেষে জল ঠাণ্ডা হইলে, প্রতি সেরের সঙ্গে ৫।৬ সের ঠাণ্ডা সাধারণ জল মিশাইয়া, গাছে পিচকারী দিয়া ছিটাইয়া দিবেন। এই জল কীট বিনাশক।

৫। উইচিংড়ী, ফড়িং প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে কেরোসিন ইমালসন বিশেষ ফলপ্রদ। তাই বলিয়া শুধু কেরোসিন কখনও প্রয়োগ করিবেন না। তাহাতে গাছের পাতা ঝলসিয়া যাইবে—গাছ মারা যাইবে। /৫ সের জলে /।০ পোয়া পরিমাণ সাবান আগুণে ফুটাইয়া লইতে হইবে। শেষে উহা

নামাইয়া, অল্পে অল্পে ১০ সের পরিমাণ কেরোসিন তৈল নাড়িয়া, ভালরূপে মিশাইতে হইবে। উহা মিশ্রিত হইলে প্রতি সেরের সঙ্গে ১০ সের সাধারণ জল মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে।

৬। গন্ধক খুব উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গুঁড়া চূণের সঙ্গে মিশাইয়া, গাছের পাতায় ছড়াইয়া দিলেও উপকার পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পাতাগুলিকে প্রথমে ভিজাইয়া লওয়া উচিত। তাহাতে গুঁড়াগুলি পাতার গায়ে লাগিয়া থাকে। নতুবা বহুল পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে।

৭। ঘুঁটের ছাইএর সঙ্গে খুব অল্প মাত্রায় কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া, উপরোক্ত ভাবে পাতায় ছড়াইয়া দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

আগাছা ও পরগাছা।

আগাছা এবং পরগাছা উভয়েই উদ্যানের মহাশত্রু। উহারা যাহাতে বাগানে জন্মিতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আগাছা, উদ্যানের ফলকর গাছগুলির খাদ্যে ভাগ বসায় এবং পরগাছা ফলকর গাছেরই কাঁধে ভর করিয়া তাহার রস শোষণ করে। অবশ্য সর্ব্বপ্রকার পরগাছাই যে আশ্রয় বৃক্ষের রস শোষণ করে তাহা নহে, কিন্তু গাছের উপর বোঝা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং গাছের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা বিনষ্ট করে। এই জন্য আগাছা বা পরগাছা মাত্রেই বাগানের শত্রু এবং উহাদের সমূলে বিনাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আগাছার ভিতরে উলুখড় সর্ব্বনেশে শত্রু। একটী বীজ কোনমতে বাগানে স্থান পাইলে, অল্পদিনের ভিতরেই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া ফেলে এবং ইহারা ভূমি হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে খাদ্য আহরণ করায়, ভূমি শীঘ্রই নীরস হইয়া পড়ে। এই জন্য উলুখড়যুক্ত কোন জমিকে বাগানে পরিণত করিতে হইলে, প্রথমে ঐগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। তারপর বাব বার ভূমি কর্ষণ করিয়া জমিটিকে পুনরায় অগ্নি দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। শেষে আবার চাষ দিয়া উহাতে প্রথমতঃ অড়হড়, মটর, ধঞ্চে ইত্যাদির ইত্যাদির আবাদ করিয়া, ঐগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া চাষ দিতে হইবে। ইহাতে ক্ষেত্রে সবুজ সারের সৃষ্টি হইবে। তারপর আবার ভালরূপে চাষ দিয়া—সার প্রয়োগ করতঃ বাগানে পরিণত করিতে হইবে।

উলুখড় ব্যতীতও নানারূপ আগাছা বাগানে জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ আগাছা দৃষ্টি মাত্রেই শিকড় সমেত উৎপাটিত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইবে। আগাছা যে শুধু মাটির রসই আহরণ করে তাহা নহে, উহারা নানাবিধ কীট পতঙ্গকে আশ্রয় দিয়া থাকে। উহাদের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া, কীট পতঙ্গগুলি ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করিবারও সুযোগ পায়।

পরগাছা নানা রকমের আছে। এগুলিতে নানাবিধ ফুল ও ফল হয় এবং ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত বৃদ্ধি-

শীল। অর্কিডও একরূপ পরগাছা। ইহারা আশ্রয়-বৃক্ষের রস শোষণ করে না বটে কিন্তু গাছের উপর গলগ্রহ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য, যে কোন রকম পরগাছাই হউক না কেন, কোন ফলকর বৃক্ষে উহাদের প্রশ্রয় দিতে নাই। দৃষ্টি মাত্রেই উহাদের ধ্বংস করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

আলগুসি নামক এক প্রকার অদ্ভুত লতা আছে। এ গুলিকে অমর বলা যাইতে পারে। ইহাদের মূল নাই—শাখা নাই—পাতা নাই—আছে শুধু তারের মত সরু একটী লতা। ইহারা যে বাগান আক্রমণ করে, সে বাগানকে রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বৃক্ষকে বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া, বায়ু রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইহারাও গাছের রস শোষণ করে না। বায়ু এবং সূর্য্যালোক হইতেই ইহারা আহার পায়। এই লতার অতি ক্ষুদ্র এক টুকরা কোন গাছে থাকিলেও, অতি অল্প দিনের ভিতরেই ঐ লতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গাছটীকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এই লতা দেখিতে পাইলেই আগুণে পোড়াইয়া ফেলিবেন। এক-মাত্র অগ্নি দগ্ধ না হইলে ইহার বিনাশ নাই।

ইহা ছাড়াও নানাজাতীয় লতা স্বভাবতঃ বৃক্ষ-দেহ আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে। এই সব লতাকেও প্রশ্রয় দিতে নাই। এগুলিকেও দেখা মাত্রেই নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

জীবন যাত্রায় অনাবিল স্বচ্ছন্দতা মানবের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধির পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন, গাছের পক্ষেও তদ্রূপ। আগাছা বা

পরগাছা মাত্রেই, গাছের স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি বিপন্ন করে এবং ফল ফুল প্রসবে বাধা জন্মায়। এই জন্য প্রথমাবধিই ইহাদের নিরাকরণে যত্নবান হওয়া সমুচিত।

রোগ

বৃক্ষমাত্রেই নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এই সমস্ত রোগের উৎপত্তির মুলে রহিয়াছে জলবায়ু, জমির নিকৃষ্টতা, নানারূপ কীট পতঙ্গ ও আগাছা পরগাছা ইত্যাদির উদ্ভব। সুতরাং এই সব বিষয়ে অবহিত হইলে, সাধারণতঃ রোগাক্রমণ হইতে পারে না। রোগ উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতীকারে যত্নবান হওয়া অপেক্ষা, আদৌ যাহাতে রোগ জন্মিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

ছাত্রাধরা, অর্ব্বুদ, আঠা নির্গমণ প্রভৃতি নানারূপ রোগ প্রায়শঃই গাছে দেখা যায়।

অনেক সময় গাছের গায়ে, পাতায় অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার গুঁড়া দেখা যায়। ঐ গুঁড়াগুলি প্রকৃত পক্ষে রোগ-জীবাণু। উহারা পাতার শিরাগুলি এবং ত্বকের ছিদ্রপথগুলি নষ্ট করিয়া, দিন দিন গাছকে রুগ্ন করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে গাছের কোন স্থান বিশেষে বা পত্র বিশেষে ঐরূপ গুঁড়া দেখিলেই, সেই স্থানটী চাঁচিয়া এবং পাতাটী সাবধানে ছিঁড়িয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। তুঁতের আরক এই রোগের উত্তম ঔষধ। একটী মাটীর পাত্রে ১০ তোলা তুঁতে /৬ সের

জলের সঙ্গে গুলিবেন। আবার আর একটী পাত্রে ১০ তোলা পোড়া চুণ /৬ সের জলের সঙ্গে মিশাইয়া ফুটাইয়া লইবেন। এই জল ঠাণ্ডা হইলে পর, প্রথমোক্ত তুঁতে জল ইহার সঙ্গে ভালরূপে মিশাইবেন। ইহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে, একখানা ভাল ইস্পাতের ছুরী ঐ জলে ডুবাইবেন। যদি দেখা যায় যে ছুরীর বর্ণের কোন বৈষম্য ঘটে নাই, তবে বুঝিবেন আরক ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যদি ছুরীর ফলকে তামাটে রং ধরে, তবে বুঝিতে হইবে আরক ঠিক হয় নাই। তখন আরও কিছু চূণের জল ঐ সঙ্গে মিশাইতে হইবে। তারপর আবার ঐরূপে ছুরী ডুবাইয়া পরীক্ষা করিবেন। শেষে ঐ জল, বহু-ছিদ্রযুক্ত পিচকারী দিয়া গাছের গায়ে ছিটাইয়া দিবেন। ইহাতে ছাতাধরা রোগ নিবারিত হয়। গাছের এমন কোন স্থানে যদি ঐ রোগ দৃষ্ট হয় যে, উক্ত অংশটুকু বৃক্ষদেহ হইতে বাদ দিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ঐ রোগাক্রান্ত অংশটুকু কাটিয়া আগুণে পোড়াইয়া ফেলিবেন এবং শেষে ঐরূপ তুঁতের আরক প্রস্তুত করিয়া সমস্ত গাছে ছিটাইয়া দিবেন। উহাতে এই রোগের ভবিষ্যৎ সংক্রমণ বন্ধ হইতে পারে।

এক প্রকার কীট গাছের ত্বক, কাণ্ড, প্রভৃতি ভেদ করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাছটীকে কুরিয়া খাইতে থাকে। উহাদের প্রবেশের ফলে যে ছিদ্র হয়, সেই ছিদ্র হইতেই আঠা নির্গত হইতে থাকে। ঐ আঠা নির্গমনই বৃক্ষদেহে

কীট প্রবেশের সংবাদ প্রকাশ করে। তখন কাল বিলম্ব না করিয়া, ঐ স্থান ধারাল ছুরী দিয়া চাঁচিয়া, খুঁড়িয়া দেখিতে হইবে। যতদূর পর্য্যন্ত ঐ গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, ততদূর কাটিয়া দেখিতে হইবে। তবে যদি এরূপ হয় যে ঐ ভাবে কাটিতে গেলে গাছের ক্ষতি হইতে পারে, তবে না কাটিয়া ঐ ছিদ্রপথে ফিনাইল বা কেরোসিন ইমালসন প্রবেশ করাইয়া, গোবর মাটি দ্বারা ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দিবেন। আর যদি স্থানটী খুঁড়িয়া দিলে কোন ক্ষতির কারণ না থাকে, তবে শেষে ঐ ক্ষতস্থানে ফিনাইল ছিটাইয়া দিয়া, আলকাতরা মাখাইয়া গোবর ও মাটী দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিবেন।

গাছের কাণ্ডে, শাখায়, প্রশাখায় যে ছোট বড় গাঁট দৃষ্ট হয় উহাদিগকেই অর্ব্বুদ বলে। এই রোগ খুব সংক্রামক, এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু ঐ রোগের বাহন। উহারা এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত উহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কোন গাছে ঐরূপ গাঁট দেখিলেই কাটিয়া ফেলিবেন। যতদূর পর্য্যন্ত লালবর্ণের ক্ষত দেখা যাইবে, ততদূর ভালরূপে চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। শেষে ঐ স্থান ফিনাইল জল দ্বারা ধুইয়া, পুরুভাবে আলকাতরার প্রলেপ দিয়া রাখিবেন। ঐ কর্ত্তিত গাঁট এবং অংশগুলি আগুণে পোড়াইয়া ফেলিবেন। ঐগুলি বাগানে ফেলিয়া রাখিলে, অন্য গাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে।

এই সব রোগ ব্যতীত পাতায় কাল, লাল বা সাদা ছিট্

ছিট্ এক রকম দাগ পড়িতে দেখা যায়। ঐগুলি নানারূপ রোগ-জীবাণুর ক্রিয়া। এরূপ পত্র দেখা মাত্রেই ছিঁড়িয়া আগুনে পোড়াইবেন।

জীব জন্তু।

শত্রু হিসাবে কাক, বাদুড়, বানর, শৃগাল প্রভৃতিও কম অনিষ্টকারী নহে। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য গাছে ফল পাকিবার সময় জালের বেষ্টনী দেওয়া এবং বাগান প্রস্তুতের সময় চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় বেড়ার এবং কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহাদের উপদ্রব নিবারণের জন্য আর কোন সহজ উপায় নাই। বেড়া দিলে শৃগাল ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে এবং ফলবান গাছগুলিকে দৃঢ় জাল দ্বারা ঢাকিয়া দিলে কাক, বাদুড় প্রভৃতির হাত হইতে ফল রক্ষা করা যাইতে পারে কিন্তু যে স্থানে বানরের উৎপাত খুব বেশী, সে স্থানে ইহার কোন পন্থাই বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া উঠে না। এ ক্ষেত্রে কড়া পাহারা ও বানরকুলকে ভয় দেখাইবার জন্য বিকট শব্দের ব্যবস্থা করিলে, অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

মোট কথা, উদ্যানকে আয়ের আধাররূপে গণ্য করিলে বা উদ্যানশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে ইহাকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। এ জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানের অগ্রে ও পশ্চাতে বহু বাধা

বিপত্তি রহিয়াছে। ধীর চিত্তে এই সব বিঘ্ন বিদূরিত করিবার প্রয়াস না পাইলে, কোন কর্ম্মে কখনও সফলতা অর্জ্জন করিয়া উন্নত হওয়া যায় না।

সার *

সার উদ্ভিদের খাদ্য। মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিদের যে স্বাভাবিক খাদ্য নিহিত থাকে, তাহার সর্ব্বত্র সমানভাবে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অবস্থিতির অভাব পূরণের জন্যই সারের আবশ্যক। ক্রমাগত উদ্ভিদ কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া, ক্ষেত্র স্বভাবতঃই খাদ্য-হীন হইয়া পড়ে। তখন সার প্রয়োগে নূতন খাদ্য সৃষ্ট না হইলে, অল্পাহারে অথবা খাদ্য বিশেষের অভাবের দরুণ উদ্ভিদের পরিপোষণে বাধা জন্মে এবং প্রয়োজনীয় ফল ফুল দানে অক্ষম হয়, কোন কোন স্থলে মরিয়াও যায়। এই জন্য প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে সার প্রয়োগ করিলে, উদ্ভিদগণ নূতন খাদ্য পাইয়া অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করে এবং আশানুরূপ ফুল ফল দান করিয়া ক্ষেত্রস্বামীর প্রয়াসকে সফল করিয়া তোলে।

আমাদের দেহের মত, উদ্ভিদ-দেহও কতকগুলি উপাদানের সমষ্টিমাত্র। এই স্বাভাবিক সমষ্টিভূত জড় পদার্থে, চৈতন্যরূপী

* মৎপ্রণীত 'সজীব কথা'র পরিশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য।

প্রাণশক্তির ক্রিয়া যতদিন অব্যাহত থাকে, ততদিনই দেহের প্রয়োজন এবং এই বিবিধ উপাদানে প্রস্তুত দেহের প্রয়োজন ও পরিপোষণের জন্যই বিবিধ খাদ্যের আবশ্যক। উদ্ভিদ যে শুধু মৃত্তিকা হইতেই খাদ্য আহরণ করিয়া লয় তাহা নহে। ইহা বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড, নাইট্রোজেন, অম্লজান, উদ্‌জান এবং মৃত্তিকা হইতে ক্যালসিয়ম (চূণ), পটাস্, ফস্ফরাস, জিপসস্, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই গুলির মধ্যে আবার নাইট্রোজেন, পটাস ও ফস্ফরাসই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য।

উদ্ভিদের এই সব বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন সারের আবশ্যক। এই সব বিভিন্ন সার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে, প্রকৃতির সহায়তায় উহা বিভিন্ন খাদ্যে পরিণত হইয়া, উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই জন্য সারগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—উদ্ভিজ্জ সার, প্রাণীজ সার, খনিজ সার, মৃত্তিকা সার ও মিশ্রিত সার। ইহা ছাড়া রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত আরও কয়েক রকম সার আছে। এই সার সর্ব্বত্র সহজ প্রাপ্য নয় বলিয়া, ইহার প্রচলন এ দেশে খুব বেশী নাই। তবে আজকাল ক্রমেই ইহার আদর যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহা শীঘ্রই সহজ প্রাপ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যাহা হউক, নিম্নে বিভিন্ন সারের মোটামুটী বিবরণ দেওয়া গেল।

উদ্ভিজ্জ সার।

উদ্ভিদ দেহ হইতে যে সব সার প্রস্তুত হয় তাহাকে উদ্ভিজ্জ সার কহে। ইহা আবার প্রস্তুত প্রণালী বিশেষে ৪ ভাগে বিভক্ত—

(১) পাতা পচা সার, (২) খৈল সার, (৩) ভস্ম সার, (৪) সবুজ সার।

(১) পাতা পচা সার,—কোমল শাখা-প্রশাখা, লতা, পাতা ইত্যাদি পচাইয়া এই সার প্রস্তুত হয়। আগাছা ইত্যাদি তুলিয়া, ফেলিয়া না দিয়া, এইভাবে পচাইলে খুব ভাল হয়। অব্যবহার্য্য গাছ মাত্রেরই সহজে পচনীয় অংশগুলিকে অযথা অন্যরূপে নষ্ট না করিয়া, এইভাবে সারে পরিণত করিলে লাভবান হওয়া যায়। একটা গর্ত্তে কিছু জল দিয়া, তাহার ভিতরে এইগুলি নিক্ষেপ করিয়া কিছু চূণ ছড়াইয়া দিতে হয়। শেষে উপরে মাটি চাপা দিয়া রাখিলেই ১ বৎসরের মধ্যে পচিয়া উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হইবে। তখন বর্ষাশেষে অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঐগুলি তুলিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিতে হইবে। তারপর ইহা গুঁড়া করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে, উদ্ভিদের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। এই সার প্রয়োগে মাটি হাল্‌কা হয় এবং আলোক ও বায়ু হইতে আবশ্যকীয় পদার্থ সহজে আকর্ষণ করিয়া নিজ গর্ভে সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।

(২) খৈল সার,—তৈলপ্রদ বীজমাত্র হইতেই—খৈল

প্রস্তুত হইয়া থাকে। খৈল প্রথমতঃ একমাস কাল পচাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ গুঁড়া করিতে হয়। এই খৈল চূর্ণের সহিত ঘুঁটে চূর্ণ অথবা শুষ্ক গোবর মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইতে হয়। তারপর মাটি চাষ দিয়া ওলট পালট করিয়া দিবেন এবং জমিতে জল সেচন করিবেন। এই জল দানের ফলে, এই সার সহজে উদ্ভিদ খাদ্যে পরিণত হইয়া থাকে। খৈল পচাইয়া তরল সার প্রস্তুত করতঃ জমিতে ছিটাইয়া দিলেও বেশ সুফল পাওয়া যায়। এই সার প্রয়োগে মৃত্তি-কার উৎপাদিকা শক্তি উত্তেজিত হয়। খইল সারে নাইট্রো-জেন, ফস্‌ফরাস ও পটাস নিহিত থাকায়, উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে।

(৩) ভস্ম সার—(ছাই), কাঠের ছাই ও ঘুঁটের ছাই উভয়ই বিশেষ উপকারী, তবে তুলনায় কাঠের ছাই অধিক সারবান। ছাই সংগ্রহ করিয়া এমন স্থানে জড় করিয়া রাখিতে হয়, যেখানে ইহা জলে ভিজিতে না পারে। কারণ, ভিজিলে ছাইএর তেজ অনেকাংশে হ্রাস পায়। এই জন্য শুক্‌না ছাই ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ছাইতে পটাস থাকে। ছাই প্রয়োগে গাছের পোকা নষ্ট হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়।

(৪) সবুজ সার—জমিতে ধঞ্চে, অড়হড়, মটর, শোন ইত্যাদির চাষ করিয়া, ফলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ঐগুলি সমেত লাঙ্গল দিয়া চষিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়ার নাম সবুজ সার প্রয়োগ। জমি প্রস্তুত কালীন প্রথম অবস্থায়

এই সার প্রয়োগ করিতে হয়। সবুজ সারে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

প্রাণীজ সার।

প্রাণীর অস্থি, মজ্জা, চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, শৃঙ্গ ও মলমূত্র প্রভৃতি পচাইয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহাকে প্রাণীজ সার বলে। এই সার, ফলকর গাছের পক্ষে বিশেষ হিতকর। মৃত প্রাণীর দেহ একটী গভীর গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া, উপরে ভালরূপে চূণ ছড়াইয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ৩।৪ মাস পরে গর্ত্তটী খুঁড়িয়া পুনরায় চূণ মিশাইয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়। এই চূণ মিশ্রিত করার ফলে গলিত দেহ হইতে কোনরূপ দুর্গন্ধ আসিতে পারে না। যাহা হউক, প্রাণীজ সার বস্তু বিশেষে ৭ ভাগে বিভক্ত—যথা, (১) অস্থি চূর্ণ, (২) অস্থি ভস্ম, (৩) শোণিত, (৪) শৃঙ্গ চূর্ণ, (৫) পচা মাছ, (৬) মলজ সাব ও (৭) মূত্রজ সার।

(১) অস্থি চূর্ণ—ক্ষেত্র বিশেষে উৎকৃষ্ট সার হইলেও ইহার ফলাফল অনিশ্চিত। যে মৃত্তিকায় অঙ্গারক পদার্থের অল্পতা আছে, সে ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগে কোন ফল পাইবার আশা নাই। কারণ অঙ্গারক পদার্থের অভাবের দরুণ ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট গলিত না হইয়া জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায় উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়।

অস্থি উত্তমরূপে চূর্ণ না হইলে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। তবে ফলকর বৃক্ষে প্রয়োগ করিতে

হইলে, একেবারে গুঁড়া না করিয়া, ছোট ছোট খণ্ড করিয়া দিলে ভাল হয়। অস্থিচূর্ণের ভিতরে ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেন থাকে, চুণের ভাগও কিঞ্চিৎ ইহার ভিতরে আছে।

হাড়ের গুঁড়ার সঙ্গে সলফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া 'সুপার ফসফেট অব লাইম' নামক এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়। প্রতি /৭ সের অস্থিচূর্ণের সহিত /৩ সের পরিমাণ সলফিউরিক এসিড মিশাইলে এই সার তৈয়ারী হয়। ইহা জলের সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে, অতি শীঘ্র উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

(২) অস্থি ভস্ম—ইহা বিশেষ উৎকৃষ্ট সার নয়। যে জমিতে অঙ্গারক পদার্থের অভাব আছে সেই জমিতে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

(৩) শোণিত সার—ফলকর গাছের পক্ষে রক্ত অতি উত্তম সার। কোন পাত্রে টাটকা রক্ত ধরিয়া পাঁচ গুণ বেশী চূণ উত্তমরূপে মিশাইতে হয়। তারপর আবার উপরিভাগে চূণ ছড়াইয়া ঢাকিয়া দিয়া পাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে, কিছু দিনের মধ্যেই উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে। তারপর আবশ্যক মত জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। কাঁচা রক্তের সঙ্গে দশ গুণ পরিমাণ জল মিশাইয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(৪) শৃঙ্গ চূর্ণ—শৃঙ্গগুলিকে প্রথমতঃ একটী গর্ত্তের ভিতরে রাখিয়া পচাইতে হইবে। এ গুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে

বিভক্ত করিয়া দিলে পচিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। তারপর উহা তুলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। অস্থিচূর্ণ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা আলগা এবং উত্তপ্ত, সেই প্রকৃতির মৃত্তিকায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

(৫) পচা মাছ—ফলকর গাছের পক্ষে পচা মাছ অতি উৎকৃষ্ট সার। মাছ উত্তমরূপে পচাইয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

(৬) মলজ সার—প্রাণী বিশেষের বিষ্ঠা হইতে এই সার প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে গোবর, ঘোড়ার বিষ্ঠা, ভেড়ার নাদি ইত্যাদিই প্রচলিত। গোবর প্রায় ৬ মাসকাল এবং ঘোড়া ও ভেড়ার বিষ্ঠা প্রায় ১ বৎসর কাল পচাইতে হয়। শেষে রৌদ্র শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। এইগুলি ব্যতীত মনুষ্য ও অন্যান্য পশু পক্ষীর বিষ্ঠাও পচাইয়া সাররূপে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই সারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তুঁতে মিশ্রিত করিয়া লইলে ভাল হয়। নতুবা অনেক সময় এই সার হইতে নানাবিধ পোকার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৭) মূত্রজ সার—মূত্র খুব তেজস্কর সার। টাটকা খাঁটী মূত্র কোন গাছে প্রয়োগ করিলে গাছ মরিয়া যাইতে পারে। এই জন্য টাটকা মূত্রের সঙ্গে ১০।১২ গুণ জল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা পচাইতে নাই।

পচাইলে ইহার গুণ অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ তুঁতে মিশাইয়া লইলে কীট উৎপন্ন হইতে পারে না।

খনিজ সার।

খনি হইতে প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যে যেগুলি সাররূপে ব্যবহার করা চলে, সেগুলিকে খনিজ সার বলে। সাধারণতঃ খনিজ ৩টী পদার্থ সাররূপে ব্যবহৃত হয় যথা—(১) সোরা, (২) লবণ ও (৩) চূণ।

(১) সোরা—ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট সার। এই সারের কার্য্যকারীতা খুব ক্ষিপ্র। অতি অল্প কালের ভিতরেই ইহার সুফল দেখা যায়। কিন্তু একাদিক্রমে প্রতি বৎসর এই সার প্রয়োগ অসমীচীন। তাহাতে জমি নষ্ট হইয়া যায়। এই সারকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে যথেষ্ঠ জলের আবশ্যক। এই সার প্রয়োগ করিয়াই—জল সেচন করিতে হয়। ছাইএর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সোরা প্রয়োগে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। ইহা পরিমাণে অধিক প্রযুক্ত হইলে, জমি নষ্ট হইতে পারে। প্রতি বিঘায় ২॥০ মণ হইতে ৩ মণ পর্য্যন্ত সোরা ব্যবহৃত হইতে পারে।

(২) লবণ—যে সমস্ত স্থান সমুদ্র বা লবণাক্ত জলবিশিষ্ট নদীকুলে অবস্থিত, সেই সব জায়গায় লবণ প্রয়োগ করিতে হয় না। যে দেশের মাটী স্বভাবতঃই লবণাক্ত, সে

স্থানে মাটির উপরেও অনেক সময় লবণ ফুটিয়া ওঠে। লবণ অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে, জমির প্রকৃতি বিকৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য জমির প্রকৃতি বুঝিয়া প্রয়োজন মত লবণ ব্যবহার করিতে হয়।

(৩) চুণ—চূণের প্রধান গুণ এই যে ইহা জমির মৃত্তিকা সরস রাখে ও আভ্যন্তরীণ দোষ নষ্ট করিয়া দেয়। চূণকে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করিয়া ব্যবহার করিলে, ক্ষেত্র বিশেষে সুফল পাওয়া যায়। প্রতি পোয়া পরিমাণ চূণে ⁄॥০ সের গোবর, দুই আনা ওজনের লবণ ও দুই আনা ওজনের ছাই একত্রে মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর ঐ মিশ্রিত সার রৌদ্রে শুকাইয়া, গুঁড়া করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। শুধু চূণ প্রয়োগে যে কুফল আসিতে পারে, এই ভাবে প্রয়োগে সেরূপ কোন কুফলের আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। এই সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি খুব বৃদ্ধি পায়।

মৃত্তিকা সার।

স্থান বিশেষের মৃত্তিকা বেশ উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পুকুরের পাঁক মাটি ইহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পলি মাটি, পোড়া মাটি, ভিটে মাটি ইত্যাদিও সাররূপে বেশ ফলদায়ক সন্দেহ নাই।

পুকুর হইতে সদ্য সদ্য তুলিয়া পাঁক মাটি ব্যবহার করিতে নাই। প্রথমতঃ, ইহাতে গাছ অত্যন্ত রসস্থ হইয়া পড়িতে

পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ভিতরে এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা রূপান্তরীত না হইলে উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য পাঁক মাটি তুলিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া শেষে গুঁড়া করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ফলকর গাছের পক্ষে ইহা খুব উপকারী। পুরাতন পুকুরের পাঁক মাটিই খুব উৎকৃষ্ট।

মিশ্রিত সার।

সর্ব্বপ্রকার সারের মধ্যে মিশ্রিত সারই শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশে এই সার প্রস্তুত হয় বলিয়া, মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদ দেহের উপযোগী যাবতীয় উপাদান ইহার ভিতরে নিহিত থাকে। ব্যয় ও পরিশ্রমের দিক হইতে দেখিলে, ইহার মত বিনা ব্যয়ে অনায়াসলব্ধ সার আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ীর যাবতীয় অব্যবহার্য্য পরিত্যক্ত জিনিষ, একটী গর্ত্তে রাখিয়া পচাইলেই এই সার প্রস্তুত হইতে পারে। গৃহের বা বাড়ীর ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা, নিত্য ব্যবহার্য্য তরিতরকারীর পরিত্যক্ত অংশ, মাছের আঁশ, মাংসের ছাঁট, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিষ্ঠা প্রভৃতি এক কথায় যাহা কিছু ফেলিয়া দিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তৎসমুদয়, বাটীর বাহিরে একটী গর্ত্তে রাখিয়া পচাইতে হইবে। ঐ গর্ত্তে মাঝে মাঝে একটু একটু জল দিতে হয়। শেষে গর্ত্তটী ভরাট হইয়া গেলে, উপরে মাটী চাপা দিয়া রাখিতে হয়। এই ভাবে কয়েক মাস রাখার

পর দেখা যাইবে যে, সমস্ত জিনিষই মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। তখন ঐ মৃত্তিকা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। সহর অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি হইতে সহরের আবর্জ্জনা কুড়াইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ আবর্জ্জনাকে সারে পরিণত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রামে সে ব্যবস্থা না থাকায়, আবর্জ্জনাগুলি অযথা নষ্ট হয়। যে গ্রামে উদ্যান থাকিবে, উদ্যানকের কর্ত্তব্য সাধ্যানুসারে সেই গ্রামের সমস্ত আবর্জ্জনা সঞ্চয় করা। ইহাতে তাহাকে সারের জন্য কখনও ভাবিতে হইবে না। ঐ মিশ্রিত সারই তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবে।

অন্যান্য সার।

উপরোক্ত বিবিধ সার ব্যতীত রাসায়নিক কতকগুলি সার আছে। এগুলি গ্রামে সচরাচর পাওয়া যায় না। বড় বড় সহরে এগুলি বিক্রয় করিবার দোকান আছে। বড় বড় নর্শারীতেও এই সব সার বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। নিম্নে কতকগুলি সারের নাম দেওয়া গেল,—

সালফেট অব পটাস, সালফেট অব এমোনিয়া, নাইট্রেট অব সোডা, নাইট্রেট অব পটাস, সুপার ফস্ফেট ইত্যাদি।

সমাপ্ত।